তিন নায়িকা

সুবোধ ঘোষ

ক্যালকাটা পাবলিকেশনস
১০, শ্যামাচরণ দেস্ট্রীট. কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭০

প্রকাশক :
শ্রীমলয়েন্দ্র কুমার সেন
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশীথ কুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শুন বরনারী

ছোট এক টুকরো কাঠের উপর বাংলা হরফে লেখা একটা নাম—ডাক্তার হিমাদ্রিশেখর দত্ত (হোমিও)। গিরিডির লোহাপুলের পূবদিকের সরু রাস্তাটার ধারে কোন বাড়ির দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ঐ নামটা আজও আঁটা আছে কিনা জানি না। থাকলেও, এতদিনে নামটা নিশ্চয় পচা কাঠের ছাতা লেগে পচে গিয়েছে, কিংবা পুরানো কাঠের ঘুণের কামড়ে ঝিরঝিরে হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, আজ থেকে দশ বছর আগে ঐ নামের ফলক স্মরণ করিয়ে দিত যে, ঐ নামের আড়ালে একটা মানুষ আছে। কে না চেনে তাকে ?

নামটা শব্দের ভারে বেশ ভারিক্কি বটে, কিন্তু মানুষটা একেবারে হাল্‌কা। লোকেও এত বড় একটা নাম উচ্চারণ করবার কষ্ট স্বীকার করে না। লোকের মুখে নামটাও কাটছাঁট হয়ে বেশ হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। লোকে বলে, হিমু দত্ত হোমিও। কেউ কেউ আরও সংক্ষেপে সেরে দেয়, হোমিও হিমু। প্রবীণেরা অবশ্য শুধু হিমু বলেই ডাকেন। কারণ, হোমিও হিমুর বয়সটাও হাল্‌কা। প্রবীণদের কলেজে-পড়া ছেলেদের চেয়ে বয়সে বড় জোর পাঁচ বছর বেশি হতে পারে হিমু। তার বেশি কখনই নয়। কম বয়সের ছেলেরা আর মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আলাপের সময় হোমিও হিমু বললেও হিমাদ্রিশেখর দত্তকে কোন কথা বলবার সময় হিমুদা বলেই ডাক দেয়।

সব শহরের মত এই গিরিডিতেও লোকের ঘরে বিশেষ এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অমুকের অমুক জায়গা যাবার দরকার হয়েছে। তাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, কারণ তার পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পৌঁছে দেবে কে ? সঙ্গে যাবে কে ?

এ ধরনের সমস্যার সমাধানে সহায় হতে হিমু দত্তের মনে কোন আপত্তি নেই। আপত্তি দূরে থাকুক, বরং অদ্ভুত একটা আগ্রহের বাড়াবাড়ি আছে বলতে হবে। যে কোন পরিবারের এ ধরনের কাজের দরকারে হিমুকে একবার ডাক দিলেই হয়, আর অনুরোধটা একবার করে ফেললেই হয়। তখনি রাজি হয়ে যায় হিমু দত্ত।

গত বছরে পৌষ-সংক্রান্তির সময় সমস্যায় পড়েছিলেন পরেশবাবু। পিসিমা গঙ্গাসাগর যাবার জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছেন। থুড়থুড়ে বুড়ো মানুষ,

এই পিসিমাকে নিরাপদে গঙ্গাসাগর নিয়ে যাওয়া আর নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কি সহজ কাজ? যে-সে মানুষের পক্ষে একাজ সাধ্যই নয়। চারটিখানি দায়িত্বের কথাও নয়। পরেশবাবুর নিজেরই সাহস হয় না, এমন কি অমন হট্টাকট্টা ভাগ্নে বাবাজী বড়-খোকনের উপরেও এমন কাজে নির্ভর করবার সাহস হয় না। খায় দায় ও কসরৎ করে, আর যখন তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়; এরকম আয়েসী কুঁড়ে আর ঘুমকাতুরে ছেলে বড়-খোকন কি পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার ঝুঁকি নিতে পারে, না ওকে ঝুঁকি নিতে দেওয়া যায়?

তবে পিসিমাকে নিয়ে যাবে কে? এ-পাড়া আর ও-পাড়ার অনেক ছেলের কথাই মনে পড়ে, যাদের জীবনে কোন কাজের তাড়াই নেই। তাস খেলে, থিয়েটার করে আর খবরের কাগজের খেলার রিপোর্ট পড়ে সকাল-সন্ধ্যা তর্ক করে। এহেন কোন ছেলের হাতে পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার দায় সঁপে দিতে সাহস হয় না। প্রথম কারণ, ওদের কেউ রাজিই হবে না। দ্বিতীয় কারণ, ওদের বুদ্ধিসুদ্ধিকে ভরসা করাও যায় না। কে জানে, হয়তো পিসিমাকে কলকাতার কোন হোটেলে ফেলে রেখে দিয়ে ময়দানের দিকে কিংবা সিনেমা হাউসের দিকে দৌড় দেবে। অভয়, ভুলু, নীহার বা রমেশ, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। অগত্যা হিমু দত্তকেই ডাকতে হয়েছিল। এবং হিমু দত্তও পিসিমাকে নিরাপদে গঙ্গাসাগরে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে ধরে স্নান করিয়ে, এমনকি পিসিমাকে দিয়ে কপিলমুনির পূজো পর্যন্ত করিয়ে, গিরিডিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। পিসিমার থুড়থুড়ে শরীরটা একটুও হাঁপায়নি, একটুও ক্লান্ত হয়নি। পিসিমা নিজেই একগাল হেসে বলে ফেললেন, আহা! হিমুর মত এমন ভাল ছেলে আমি জীবনে দেখিনি পরেশ। আমাকে কোলে ক'রে গাড়িতে তুলেছে, গাড়ি থেকে নামিয়েছে। আমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি পরেশ।

শুধু তাই নয়। গঙ্গাসাগর যাওয়া আর আসার খরচের যে হিসাব দিল হিমু দত্ত, সে হিসাব দেখে পরেশবাবুও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ছি—ছি, তুমি একি কাণ্ড করেছ হিমু? তোমাকে এতটা কষ্ট সহ্য করতে আমি বলিনি।

অনুযোগ করলেন পরেশবাবু। কারণ পাই-পয়সা পর্যন্ত মিল ক'রে পথের খরচের যে হিসাব দিল হিমু দত্ত, তাতে দেখা গেল যে, সাতদিনের মধ্যে হিমু দত্তের নিজের খাওয়া বাবদ মাত্র তিন টাকা খরচ হয়েছে।

হিমু দত্ত নিজেও এক গাল হেসে বলতে থাকে।—আমি হেলথ্ সম্পর্কে

খুব সাবধান থাকি বড়দা। কলকাতা থেকে দু'সের চিনি আর তিন সের চিঁড়ে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাস, তাতেই আমার খোরাক হয়ে গিয়েছে! আমি মেলার কোন খাবারই ছুঁইনি। পিসিমা বরং দই-টই খেয়েছেন। আমার বেশ ভয়ই হয়েছিল বড়দা, দই-এর লোভে পিসিমা শেষে একটা কাণ্ড না করে বসেন। ভাগ্যি ভাল, দইটা ভাল ছিল, পিসিমার শরীরে সয়ে গিয়েছিল।

পরেশবাবুর পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার পর হিমু দত্তকে যেন নতুন ক'রে চিনতে পারলেন পরেশবাবু। শুধু পরেশবাবু কেন, অনেকেই; তারপর প্রায় সবাই।

একবারে মাটির মানুষ, অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির ছেলে হিমু দত্ত। পরেশবাবু একদিন ক্লাবে বসে ননীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে বলেই ফেললেন—হিমুর মত গুড-নেচার্ড ছেলের হাতে যে-কোন দায়িত্ব অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারা যায়। ওর হাতে ক্যাশবাক্সের চাবিও ছেড়ে দেওয়া যায়। পাই-পয়সার এদিক-ওদিক হবে না।

ননীবাবু বলেন—তাহ'লে হিমুকেই ডেকে কাজের ভারটা চাপিয়ে দিই, কি বলেন, না?

—নিশ্চয় নিশ্চয়। মাথা নেড়ে প্রস্তাবটা সমর্থন করেন পরেশবাবু।

এবং আর দুদিন পরেই দেখা গেল, ননীবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্য জিনিস কিনতে কলকাতায় চলে গেল হিমু দত্ত। বাসনপত্র, অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় আর শয্যাদ্রব্য, সবশুদ্ধ প্রায় তিন হাজার টাকার বাজার করবার দায়িত্ব অনায়াসে হিমু দত্তের উপর ছেড়ে দিলেন ননীবাবু। সব সামগ্রী নিয়ে দুদিন পরে যখন ফিরে এল হিমু দত্ত, তখন সবচেয়ে আগে খুশী হয়ে আর আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ননীবাবুর স্ত্রী—হিমুর পছন্দ আছে বলতে হবে! কী সুন্দর ডিজাইনের গয়না! তোমার চোখ আছে, রুচি আছে হিমু! আমি নিজে কলকাতা গেলেও এরকম পছন্দ করে সুন্দর জিনিস কিনতে পারতাম না।

পাই পয়সা মিলিয়ে হিসাবও দিয়ে দিল হিমু। ননীবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন—একি হিমু, তোমার খাওয়া দাওয়ার কোন খরচ নেই কেন?

হিমু হাসে—খরচ হয়নি। আমার ছেলেবেলার বন্ধু কানাই-এর সঙ্গে ট্রেনে দেখা হয়ে গেল। কলকাতাতে কানাইদের বাড়িতেই ছিলাম। কাজেই···

ননীবাবু বলেন—যাই হোক, তোমার হাতখরচ বাবদ যদি দশটা টাকা তুমি রাখতে, তাহলে ভালই হতো হিমু।

হিমু আরও লজ্জিত হয়ে হাসে—কি যে বলেন মেশোমশাই!

ননীবাবুর স্ত্রী এবার ননীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—ছি, ছি। তুমি হিমুকে কি পেয়েছ; কি বলছ তুমি?

ননীবাবু—কেন? অন্যায় কিছু বলছি কি?

ননীবাবুর স্ত্রী বলেন—হিমু কি তোমার মত ইন্‌সপেক্টর যে টুরে বের হয়ে ব্রাঞ্চ অফিসের বাবুদের বাড়িতেই দুবেলা চর্ব্য-চোষ্য গিলবে, আর কোম্পানির কাছে খোরাকী বাবদ বিশটাকা বিল দাখিল করবে?

ননীবাবু ভ্রূকুটি করেন—তুমি আবার হঠাৎ এসব আবোল তাবোল কথা তুলে···

হিমু দত্তই এইবার ননীবাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে অনুযোগ করে—ছিঃ, আপনি এসব কি বলছেন মাসিমা!

শহর থেকে দূরে যাবার কাজ পড়লেই, একদিন বা দুদিনের জন্ম বাইরে যাবার দরকার পড়লেই হিমু দত্তের কথা সবারই মনে পড়ে।

ননীবাবুর এই মেয়ের বিয়েতে জামালপুরে গিয়ে বরের বাড়িতে অধিবাসের তত্ত্ব পৌঁছে দেবার দায়িত্ব হিমু দত্তকেই বহন করতে হয়েছিল। অধিবাসের জিনিস দেখে বরের বাড়িতে মেয়েরা নাক কুঁচকেছিল, অনেক কটু কথাও শুনিয়েছিল। সব শুনেছিল হিমু দত্ত, কিন্তু এই সামান্ত কথাটাও বলতে পারেনি যে, আমাকে এসব কথা শুনিয়ে লাভ কি? আমি মেয়ের বাড়ির কেউ নই।

এই অপমান সহ্য করবার দায়িত্বটাও অনায়াসে পালন করতে পেরেছিল হিমু দত্ত। বরের বাড়ির মন্তব্যগুলিকে তুচ্ছ করতে পারেনি হিমু দত্ত। ননীবাবুর অপমানকে পরের অপমান বলেও মনে করতে পারেনি। অদ্ভুত এই হিমু দত্তের মন; বরং সেই অপমানকে যেন ভাল করে গায়ে মেখে, যেন ননীবাবুর মেয়ের দাদাটির মত ভীরু হয়ে কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে বরের মায়ের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়েছিল হিমু দত্ত—ত্রুটি হয়েছে স্বীকার করছি, নিজগুণে মার্জনা করুন।

ননীবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর, অনেকদিন পরে এই ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলেন ননীবাবু ও তাঁর স্ত্রী। হিমু দত্ত বলেনি। বরং বরের বাড়ির চাল-চলন আচার-ব্যবহারের অনেক প্রশংসা করে ছিল হিমু—চমৎকার ভদ্রলোক ওঁরা।

ননীবাবুর মেয়ে নিজেই যেদিন শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রথম বাপের বাড়ি এল, সেদিন মেয়ের মুখ থেকেই ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলেন ননীবাবু ও তাঁর স্ত্রী। খুব বেশী আশ্চর্য হয়েছিলেন দুজনেই, হিমু [illegible]র মনটা কি মানুষের মন? মানুষ এত ভালও হয়? পরের জন্য মানুষ এতটা সহ্যও করে!

হিমুকে ডেকে ননীবাবু হিমুর উপর বেশ রাগ করে বলেছিলেন—ওসব কথা সহ্য করা তোমার খুবই ভুল হয়েছে হিমু। ওদের মুখের উপর শক্ত করে দু'চারটে কথা তোমারও বলে দেওয়া উচিত ছিল। তাতে যদি বিয়ে ভেঙে যেত, তবে যেত। আমি কোন পরোয়া করতাম না।

চোখের ছানি অপারেশন করবার জন্য পাটনা যাবার কথা ভেবে যেদিন দুশ্চিন্তা করেছিলেন অনাথবাবু, সেদিন অনাথবাবুর ছেলে মণ্টুই অনাথবাবুকে মনে পড়িয়ে দিল—ভাবছো কেন বাবা?

অনাথবাবু—ভাবতে হচ্ছে রে মণ্টু। আসানসোলে হারুকে লিখেছিলাম; কিন্তু হারু জানিয়েছে, এখন ছুটি পাবে না। আসতেই পারবে না। হারুর এখন ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা।

মণ্টু বলে—হিমুদাকে একবার বললেই তো ··

—হ্যাঁ হ্যাঁ! মণ্টুর মা'ও খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।—হিমু থাকতে ভাবনা করছো কেন?

অনাথবাবুরও মনে পড়ে যায়, ঐ হিমুই যে গত মাসে নিত্যানন্দবাবুর ছেলেটার কার্বঙ্কল অপারেশন করাবার জন্য ছেলেটাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। নিত্যানন্দবাবু নিজে বাতের ব্যাথায় অনড় হয়ে ঘরে পড়ে আছেন। বাড়িতে দ্বিতীয় একটা মানুষ নেই যে ছেলেটাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারে। একটা কার্বঙ্কল রুগীকে ভালভাবে নিয়ে যাওয়াও তো যা-তা কাজ নয়। তা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে, যে-জন্য নিত্যানন্দ-বাবুর মেজ শ্যালক মশাই এত কাছে, ঐ জগদীশপুরে থাকতেও এই দায়িত্বটা নিতে রাজি হলেন না। নিজের শরীরের অসুখের ছুতো ক'রে কাজের দায় এড়িয়ে গেলেন। কে জানে, অপারেশনের পর কি হবে পরিণাম? ছেলেটা যদি মরে যায়? যদি নিয়ে যাবার পথেই ছেলেটার মরণ-টরণ হয়ে যায়,তবে? তবে ছেলের বাপ-মা'র সন্দেহ অভিশাপ আর খোঁটা যে সারা জীবন ধরে সহ্য করতে হবে। এ ধরনের ভয়ানক ঝঞ্চাটের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

নিত্যানন্দবাবুর কাছেই শুনেছিলেন অনাথবাবু—হিমু না থাকলে আমার ছেলেটা মরেই যেত অনাথবাবু। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, হিমু এই ভয়ানক দায়িত্ব নিতে রাজি হবে হবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য, একবার অনুরোধ করা মাত্র হিমু রাজি হয়ে গেল। আরও কি কাণ্ড করেছিল হিমু, জানেন ?

—কি কাণ্ড ?

—অদ্ভুত রেসপন্‌সিবিলিটি বোধ! হাসপাতালের ডাক্তারদের ধরাধরি করে স্পেশ্যাল পারমিশন নিয়ে দশটা দিন হাসপাতালেরই ওয়ার্ডের বারান্দায় কম্বল পেতে একটা ঠাঁই করে নিয়েছিল হিমু। ছেলেটার কাছ থেকে একঘণ্টার জন্যেও দূরে সরে থাকতে পারেনি।

অনাথবাবুর আহ্বান, একটা অন্ধ মানুষকে পাটনা পর্যন্ত নিয়ে যাবার আহ্বান! তার মানে সব সময় অনাথবাবুকে হাত ধরে ওঠাতে বসাতে আর চলাতে হবে। মণ্টুর মা কেঁদেই ফেলেছিলেন।—তুমি পারবে তো হিমু ?

হিমু বলে—পারি কিনা দেখতেই পাবেন।

মণ্টুর মা-ও সঙ্গে ছিলেন, এবং গিরিডি থেকে পাটনা পর্যন্ত সারাটা পথ যেতে যেতে স্বচক্ষেই দেখতে পেয়েছিলেন, হিমু নামে এই ছেলেটা পরের জন্য, অকারণ এবং কোন উপকার আশা না করে, একটা পয়সা না ছুঁয়েও কি করতে পারে।

ঘন ঘন সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে অনাথবাবুর। মণ্টুর মা নিজেই দেখলেন, যতবার সিগারেট খেলেন অনাথবাবু, ততবার হিমুই দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করলো। হিমুই অনাথবাবুকে সাবধান করে দেয়—খবরদার জেঠামশাই, নিজে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করবেন না। মুখে ছেঁকা লেগে যাবে। যখনই দরকার হবে, আমাকে বলবেন।

হিমু দত্তেরই-বা এত সময় হয় কি করে ? ওর জীবনটা কি একটা অফুরান অবসরের, কিংবা খাওয়া-পরার ভাবনা থেকে মুক্ত একটা নিরুদ্বিগ্ন কর্মহীন জীবন ? দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ছোট কাঠের ফলকে ওর একটা কাজের পরিচয়ও যে লেখা আছে। ডাক্তার, ডাক্তার হিমাদ্রিশেখর দত্ত। কিন্তু ডাক্তারী করে কখন ? কেউ কি আজ পর্যন্ত হিমু দত্তকে কোনদিন ডাক্তারী করতে দেখেছে ? হিমু দত্তের ঘরের ভিতর একটা

তক্তাপোষের উপর হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটা বাক্স অবশ্য আছে, চিকিৎসার একটা বইও আছে। এই দুই জিনিস অনেকেরই চোখে পড়েছে। কিন্তু রোগী দেখছে হিমু দত্ত কিংবা রোগীকে ওষুধ দিচ্ছে হিমু দত্ত, এমন দৃশ্য আজ পর্যন্ত কারও চোখে পড়েনি।

কে না জানে, চার বাড়িতে ছেলে পড়ায় হিমু দত্ত। সকাল বেলা দু'বাড়ি, সন্ধ্যাবেলা দু'বাড়ি। হিমু দত্তের বিদ্যের জোর কত আর কেমন, এ প্রশ্নও কেউ করেনি। হিমু দত্ত যাদের পড়ায়, তাদের বয়স চার-পাঁচ বছরের বেশি নয়, বিদ্যে নামে কোন বস্তুই যাদের মনে মাথায় বা চোখের চাহনিতে নেই। ছেলে-মেয়েদের বয়স যখন সাত-আট হয়, এবং ছেলে-মেয়েদের বিদ্যে শেখাবার জন্য বাপ-মায়েরা যখন সত্যিই সিরিয়াস হন, তখন শুধু হিমু দত্তকে ছাড়িয়ে দিয়ে একটু ভাল শিক্ষিত মাস্টার রাখবার কথা মনে পড়ে। হিমু দত্তকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেজন্য হিমু দত্তের মনে কোন দুঃখ নেই। কারণ, সেইদিনই অন্য এক বাড়িতে একেবারে বিদ্যাশূন্য এবং শুধু হাতে খড়িতে অভিজ্ঞ চার-পাঁচ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েকে পড়াবার নতুন একটা কাজ পেয়ে যায় হিমু দত্ত।

তাছাড়া, হিমু দত্ত সত্যিই পড়ায় কিনা, সেটুকু খোঁজ রাখার দরকার যেন কোন বাপ-মা অনুভব করেন না। ছেলে-মেয়ে কটা নতুন বানান শিখলো, এবং দু-এর ঘর নামতাটুকু আয়ত্ত করলো কিনা, মাস্টার হিমু দত্তের কাছে এই সামান্যতম দাবীর প্রশ্নও যে কারও নেই। ছেলে-মেয়েগুলো দুটো ঘণ্টা হিমু দত্ত নামে মাস্টারের কাছে চুপ করে বসে থাকে, তাই যথেষ্ট। পড়ার অভ্যাসটা গড়ে উঠছে, এখন এর চেয়ে বেশি আর দরকারই বা কি?

কাঠের ফলকে ডাক্তার কথাটা এত স্পষ্ট করে লেখা থাকলেও হিমুকে কোনদিন ডাক্তার বলে ভাবতেই পারেনি শহরের মানুষ, বিশেষ করে ভদ্রলোকেরা। বরং হিমু মাস্টার বললে সকলেই বুঝতে পারে, ঐ সেই ছেলেটি, দেখতে মন্দ নয়, স্বভাবটি বড় শান্ত, বড় কর্মঠ, আর কেমন একটু, অর্থাৎ ঠিক বোকা নয়, একটু বোকা-বোকা। অর্থাৎ খুব বেশি ভালমানুষ হলে যা হয়, তাই।

হিমু দত্তের ডাক্তারীটা কি সত্যিই একেবারে অস্তিত্বহীন একটা কথা মাত্র? ভদ্রলোকেরা জানেন না, কিন্তু বস্তির কেউ-কেউ মুচি পাড়ার অনেকেই এবং শহর থেকে বেশ দূরে কয়েকটা গাঁয়ের তুরী আর দোসাদদের মধ্যে কেউ কেউ জানে, একটা টাকা হাতে তুলে দিলে কোন আপত্তি না করে হিমাদারি-

বাবু ডাগদারি করে চলে যাবে। হেঁটেই চলে আসবে; টাঙ্গা ভাড়া চাইবে না। ওষুধ দিলে বড় জোর ছয় আনা দাম চাইবে, তার বেশি নয়।

কিন্তু হোমিও হিমু কোন রোগীকে সত্যিই ওষুধ খাওয়াবার সুযোগ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। যারা ডাগদারির নামে ভয় পায়, ডাগদারিকে ভয়ানক সন্দেহ করে, যাদের ডাগদারিতে কোন বিশ্বাস নেই, তারাই শুধু হোমিও হিমুকে ডাক দেয়। ভুগে ভুগে মরণদশার শেষ অধ্যায় পৌঁছে রোগী যখন থেমে থেমে শ্বাস টানে, তখন ডাক পড়ে হোমিও হিমুর। আর, হিমু দত্ত একেবারে তৈরি হয়েই রওনা হয়। পকেটে ওষুধের শিশি থাক বা না থাক, একটি লুঙ্গি আর একটি গামছা সঙ্গে নিয়ে যেতে কখনও ভুলে যায় না হিমু দত্ত। জানে হিমু দত্ত, রোগীর মরা মুখ দেখতে হবে, মৃতের শ্মশানযাত্রা এবং দাহকার্যে একটু আধটু সাহায্য করে এবং একেবারে স্নান সেরে আসতে হবে।

এক বছর আগেও এই গিরিডির কোন পাড়াতে হিমু দত্তকে ঘুরে বেড়াতে কেউ দেখেনি! কবে হিমু দত্ত এখানে এল, আর লোহার পুলের পূবদিকের ঐ সরু রাস্তার ধারে একটা করে ঠাঁই নিল, তাও কেউ মনে করতে পারে না। কোথা থেকে এসেছে হিমু দত্ত তাও কেউ জানে না।

হিমু দত্ত একটা হঠাৎ আবির্ভাব। দরজার পাশে ঐ প্রকাণ্ড নামের ফলক দেখে প্রথম প্রথম যারা আশ্চর্য হয়ে খোঁজ নিয়েছিল, তারাও আজকাল আর আশ্চর্য হয় না। মানুষটা নামেই প্রকাণ্ড, কিন্তু জীবনে একেবারে সামান্য। ডাক পিয়নও আশ্চর্য হয়ে যায়। পাড়ার সব মানুষের নামে মাসে অন্তত একটা না একটা চিঠি আসে, কিন্তু হোমিও হিমুর নামে একটাও না। আপনজন বলতে পৃথিবীতে ওর কি কেউ নেই?

আরও আশ্চর্যের কথা, এক বছরের মধ্যে শহরের এতগুলি মানুষের ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে এত পরিচিত হয়ে উঠলেও হিমু যেন একটা একঘরে প্রাণীর মত পড়ে আছে। কেউ একবার জানতেও চেষ্টা করেনি, একটা প্রশ্নও করেনি, তুমি এর আগে কোথায় ছিল হে হিমু? তোমার দেশ কোথায়? বাপ-মা কোথায় আছেন? সত্যিই আছেন কি? না, বিগত হয়েছেন? ছোট ভাই-বোন আছে কি? বিয়ে-টিয়ে করে ফেলেছ কি?

কেউ না; এই এক বছরের মধ্যে হিমু দত্ত কোন মানুষের কাছ থেকে এতটুকু কৌতূহলও আকর্ষণ করতে পারেনি। হিমু দত্ত শুধু হিমু দত্ত। ভাড়া ঘরে থাকে, আপন ঘর নেই। কিন্তু এপাড়া আর ওপাড়ার সব ঘরই যেন

ঘর। কেউ একবার ডেকে একটা কথা বললেই হিমুর মুখের ভাষায় সেই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে একটা না একটা আপনজন গোছের মানুষ হয়ে যায়। হয় কাকাবাবু, মেশোমশাই, জেঠামশাই আর পিসেমশাই, কিংবা মামাবাবু। নয় বড়দা মেজদা সেজদা ও ছোড়দা। ঠাকুমা ও দিদিমা পাতিয়ে ফেলতেও একটুও দেরি হয় না হিমু দত্তের।

ওভার্সিয়ার বাবুর মা হিমু দত্তকে চিনতেন না। পথে দেখা হতে তিনিই একদিন ভুল করে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—তুমি তো আমাদের টুনকির ভাসুরপো?

সেই মুহূর্তে উত্তর দিয়েছিল হিমু দত্ত—না দিদিমা, আমি হিমাদ্রি।

—তুমি বারগণ্ডায় থাক?

—না। আমি ওদিকের ঐ লোহার পুলের দিকে থাকি।

—বলি, তুমি কি গিরিডির ছেলে?

—হ্যাঁ, এখন তো তাই।

—কি আশ্চর্য, হিমাদ্রি টিমাদ্রি নাম তো কখনো শুনিনি।

হিমু দত্ত হাসে—আমি হিমু।

চোখ বড় ক'রে হেসে ওঠেন দিদিমা – তাই বল। তুমিই হিমু?

—হ্যাঁ দিদিমা।

—তা হলে আমার একটু কাজ করে দে না ভাই।

—বলুন।

আজ সন্ধ্যায় একবারটি এসে আমাকে মকতপুরে সান্যালদের বাড়িতে কীর্তন শুনিয়ে নিয়ে আসবে? রাত্রিবেলা আমি চোখে বড় ঝাপ্সা দেখি রে ভাই, একা পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারি না।

—বেশ, কিন্তু আপনি কোথায় থাকেন দিদিমা?

—ওরে আমি যে হাবুল ওভার্সিয়ারের মা।

—ঠিক আছে।

হ্যাঁ, ঠিক যেমন স্পষ্ট করে কথা দিয়েছিল হিমু, তেমন একেবারে ঠিক সময়ে এসে প্রতিশ্রুতি পালন করে চলে গিয়েছিল।

মকতপুরে সান্যালদের বাড়ি থেকে কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরবার পথে দিদিমা অনেক গল্প করলেন।—হাবুলের বাবা বেঁচে থাকলে আজ আর আমাকে হেঁটে চলতে হতো না ভাই। তিনি ছিলেন ঝুমরা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। কত টাকা রোজগার করলেন, আর দান ক'রে ক'রে

ফতুর হলেন। মোটর গাড়িটাকে পর্যন্ত বেচে দিয়ে বাংলাদেশের বন্যার চাঁদা পাঠিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, তবে, এমন কিছু দুঃখের মধ্যে রেখে যাননি। মেয়েদের বড় বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়েরা আমাকে সাহায্য করে। সুষমা আছে কলকাতায়, ধীরা কানপুরে আর অনিলা জামসেদপুরে। অনিলা এখন পোয়াতি ; এদিকে জামাই-এর বদলির অর্ডার হয়েছে। বল দেখি, কি বিপত্তি!

দিদিমা তাঁর ঘরোয়া জীবনের কাহিনী শেষ করলেন, যখন ঘরের দরজার কাছে পৌঁছালেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভুলেই গেলেন, হিমু নামে এই মানুষটার ঘরোয়া সুখ দুঃখের কোন সংবাদ, কোন পরিচয়। মনেই পড়ে না কারও, হিমু দত্তেরও কোন দুঃখ থাকতে পারে, কিংবা হিমু দত্তেরও জীবনের হয়তো একটা সুখের ইতিহাস আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, হিমু দত্তকে কি সত্যিই একেবারে সুখ-দুঃখের অতীত একটা স্বয়ম্ভু সত্তা বলে মনে করে সবাই ?

শহরের জীবনে সারা বছরের মধ্যে অনেক উৎসবও দেখা দেয়। পারিবারিক উৎসব। অমুকের মেয়ের বিয়ে। অমুকের ছেলের বৌ-ভাত কিংবা অমুকের বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভোজের নিমন্ত্রণ। কিন্তু হিমু দত্ত সবারই এত পরিচিত হয়েও কি সব উৎসবে নিমন্ত্রণ পায় ? না। ননীবাবুর মেয়ের বিয়েতে অবশ্যই নিমন্ত্রিত হয়েছিল হিমু দত্ত। এবং মণ্টুর পৈতের সময় অনাথবাবু নিজে হিমু দত্তের ঘরে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। যাদের কাজের দরকারে হিমু দত্ত খেটেছে, তাদের কোন উৎসবের দিনে তারা হিমু দত্তকে স্মরণ করতে ভুলে যায় না। কিন্তু তা ছাড়া আর কেউ না। এই তো গত ফাল্গুন মাসে মাইকা মার্চেণ্ট রামসদয়বাবু তাঁর মা-এর শ্রাদ্ধের ঘটা দেখাতে গিয়ে গর্ব করেই বলেছিলেন, গিরিডির একটি বাঙ্গালীও নিমন্ত্রণে বাদ পড়বে না। আর এক প্রকাণ্ড লিস্ট ক'রে রামসদয়বাবুর চার ছেলে গিরিডির সব পাড়া ঘুরে প্রত্যেক বাঙ্গালীকে, বাড়িশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিল। এমন কি ডাক বাংলোতে, ধর্মশালাতে আর হোটেলগুলিতেও খোঁজ নেওয়া হয়েছিল, কোন বাঙ্গালী সেখানে আছে কিনা। যারা ছিল, তারা সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছিল। পোস্টমাষ্টার নাগেশ্বরবাবু, যিনি বিহারী কায়স্থ, কিন্তু গৃহিণী হলেন বাঙ্গালী মহিলা, তিনিও নিমন্ত্রিত হলেন। অথচ লোহাপুলের পূর্বদিকে সরু সড়কের ধারে একটি ক্ষুদ্র ঘরের দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে কাঠের ফলকের উপর লেখা এত বড় একটা বাঙ্গালী নাম কারও চোখেই পড়লো না। বাদ পড়লো শুধু হোমিও হিমু।

রাগ করেনি হিমু দত্ত। এর জন্ত কোন ক্ষোভ আর কোন অভিমানে বিচলিত হয়নি হিমু দত্তর মন। সন্দেহ হতে পারে, হিমু দত্ত নিজেকে বাঙ্গালী বলে মনে করে কিনা।

যাই মনে করুক হিমু, কিন্তু হিমু দত্তের স্বভাব আর আচরণ যে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রভেদটুকুর ধার ধারে না, তার প্রমাণও একদিন পাওয়া গেল।

নবলকিশোরবাবু ওকালতি করেন। গোঁড়া সনাতনী মানুষ। অনেকদিন আগে সরদা আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করবেন বলে তৈরী হয়েছিলেন। এ হেন মানুষও এমন এক সমস্তায় পড়লেন, যে সমস্তার সমাধানে তিনি শেষ পর্যন্ত হিমু দত্তকেই স্মরণ করতে বাধ্য হলেন।

নবলকিশোরবাবুর মেয়ে কৃষ্ণা। কৃষ্ণাকে বার বছর বয়সেই বিয়ে দেবার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছিলেন নবলকিশোরবাবু, কিন্তু কৃষ্ণার মার কঠোর আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ হারিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণার লেখাপড়া শেখার চেষ্টাকেও বাধা দিতে পারেননি কৃষ্ণার মার জেদের জন্তই। কৃষ্ণার মার আর একটা শখ, মেয়েকে শান্তিনিকেতনে পড়াবেন। কৃষ্ণার মার এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শেষে শান্ত হয়ে গেলেন নবলকিশোরবাবু।

কৃষ্ণার বয়স সতর-আঠার, দেখতে বেশ বড়-সড়, এবং সেটা ভাল স্বাস্থ্যের জন্তই। এই মেয়েকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু দিয়ে আসবে কে?

নবলকিশোরবাবু নিজে যেতে পারবেন না। ট্রেনে চড়লেই তিনি বমি করে ফেলেন। শরীর ভয়ানক অসুস্থ হয়ে যায়। কৃষ্ণার কাকা বা দাদা কেউ গিরিডিতে নেই, নিকটেও নেই। দু'জনেই আর্মড ফোর্সের সার্ভিসে পুনাতে আছে। অতএব?

এক্ষেত্রে কৃষ্ণার মার উদারতাটাও ভয়ানক সাবধান। জুনিয়র উকিল আউধবিহারী নিজেই যেচে নবলকিশোরবাবুর কাছে প্রস্তাব করেছিল, যদি দরকার মনে হয়, তবে আমিই কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। কৃষ্ণার মা বললেন—না।

সম্পর্কে আত্মীয় হয়, ব্রিজমোহনবাবুর ছেলে দেবকীদুলালের কথাও মনে পড়েছিল। না, কৃষ্ণার মা বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আপত্তি করলেন। এবং কৃষ্ণার মা নিজেই একদিন মন্দির থেকে ফিরে এসে নবলকিশোবাবুর কাছে বললেন—মণ্টুকা মা কহতি হ্যায় কি...

—কি? কেয়া কহতি হ্যায়? প্রশ্ন করেন নবলকিশোরবাবু।

কৃষ্ণার মা বলেন—কহতি হায় কি হিমুকো বোলো। বস্, অউর কুছ সোচনে কা বাত নেহি।

কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসুক হিমু। হিমুকে ডাকা হোক। হিমু নামে ছেলেটির মতিগতি সম্বন্ধে কৃষ্ণার মার এই অদ্ভুত নির্ভয় নির্ভরতা আর বিশ্বাসের রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন নবলকিশোরবাবু। কিন্তু রাজি হলেন।

কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে হিমু যেদিন ফিরে এসে নবলকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করলো আর যাওয়া-আসার খরচের হিসাব দাখিল করলো, সেদিন একবারে অবাক হয়ে হিমুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নবলকিশোরবাবু। তারপর বললেন—এ বেটা, তু নে কেয়া কিয়া ?

হিমু বলে—কি করেছি চাচাজী ?

হিসাব দেখে আশ্চর্য হয়েছেন নবলকিশোরবাবু। কৃষ্ণা ট্রেনের ডাইনিং-কারে গিয়ে দু'বার খেয়েছে। খরচ পড়েছে ছ'টাকা দশ আনা। আর হিমু যেতে আসতে শুধু চারবার পুরি-তরকারী খেয়েছে, খরচ হয়েছে দেড় টাকা।

নবলকিশোরবাবু—তু বেটা এক পিয়ালি চা ভি নেহি পিয়া ?

—আমি চা খাই না চাচাজী।

শান্তিনিকেতন থেকে কৃষ্ণার প্রথম চিঠি পাওয়ার পর নবলকিশোরবাবুর সনাতনী চোখের শেষ সন্দেহের লেশটুকুও যেন প্রচণ্ড খুশির চমক লেগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কৃষ্ণার মা বললেন—অব্ বোলো, অ্যায়সা লেড়কা দেখা কভি ?

কৃষ্ণা লিখেছে, হিমু ভাইজীকে আমার বহুৎ বহুৎ নমস্কার জানাবে। পথে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। হিমু ভাইজী আমাকে একটুও কষ্ট পেতে দেয়নি। যতবার আমার জল তেষ্টা পেয়েছে, ততবার নিজে ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে গার্ডের কামরা থেকে ভাল জল নিয়ে এসেছে, আমাকে পানিপাঁড়ের হাতের ময়লা জল খেতে দেয়নি।

হিমু দত্ত নামে মানুষটার আত্মা আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বোধহয় একটা আত্মা মাত্র। না বাঙালা, না বিহারী, না অন্য কিছু। নবলকিশোরবাবু না, কৃষ্ণার মাও না, দু'জনের কেউ মনে করতেই পারেন না যে, হিমু দত্ত বিহারী নয়, বাঙালী।—হিমু তো বিলকুল হিমুহি হায়। নবলকিশোরবাবু আশ্চর্য হয়ে যে অর্থহীন কথাটা বলেন, সেটাই বোধহয় হিমুর সবচেয়ে সার্থক পরিচয়।

কৃষ্ণার মা'র কাছ থেকেই গল্পটা, অর্থাৎ কৃষ্ণার চিঠির কথাগুলি শুনতে পেলেন মণ্টুর মা। তারপর আরও অনেকে শুনলেন। হিমুর কাছে বিশ্বাস করে কিনা ছেড়ে দেওয়া যায়? নইলে নবলকিশোরবাবুর মত গোঁড়া মানুষ তাঁর মেয়েকে, কৃষ্ণার মত একটি সুন্দর আঠার বছর বয়সের মেয়েকে নিশ্চিন্ত মনের হিমু কাছে ছেড়ে দিতে পারতেন না।

হিমু দত্তের একটা নতুন সুখ্যাতি অনেকেরই মুখের কথায় গুন-গুন করে। বড় ভাল ছেলে। একেবারে নির্দোষ স্বভাব। এবং পূজোর ছুটির পরে হিমুর এই সুখ্যাতির গল্পটা অনেকেই স্মরণ করতে বাধ্য হয়। কারণ, সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক বাড়ির সমস্যা নয়, এপাড়া আর ওপাড়া নিয়ে পাঁচ বাড়ির সমস্যা। নিভার বাবা ভাবেন, প্রমীলার মা ভাবেন, সরযূর দাদা ভাবেন, কল্যাণীর মা ভাবেন, এবং অতসীর কাকিমা ভাবেন। মেয়েগুলিকে কলকাতায় পৌঁছে দেবার সেই সমস্যাটা আবার কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে।

কলেজের ছুটির আগে এবং পরে, এই সমস্যাটা দেখা দেয়। এবং উপায় চিন্তা করতে করতে হয়রান হতে হয়। কোন বাড়ির বাপ-মা বা অভিভাবক, কেউ পছন্দ করেন না যে, মেয়েটা একা-একা যাওয়া-আসা করুক। মেয়েরাও চায় না। ট্রেন যাত্রার হয়রানিকে ওরা ভয় করে এবং একা একা যাওয়া-আসা করতেও ভয় করে। কে পৌঁছে দিয়ে আসবে? কে নিয়ে আসবে? কার এত সময় আছে? প্রত্যেকবার এই অসুবিধার প্রকোপে পড়ে মেয়েগুলির যাওয়া-আসার তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়। ছুটি শেষ হয়, তবু নিভা কলকাতা রওনা হতে পারে না। কখনো বা ছুটি আরম্ভ হয়ে যায়, ছুটির চারটে দিন পার হয়ে যায়, কলকাতার ছাত্রী হোস্টেল থেকে প্রমীলার দুটো রাগস্ত চিঠি এসেও যায়, তবুও প্রমীলার মা মেয়েকে কলকাতা থেকে আনবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন না।

কিন্তু এবছর পূজার ছুটি ফুরিয়ে যাবার দিনটাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখেও চিন্তা করতে ভুলে গেলেন সবাই। কারণ, সবারই মনে পড়েছে, হিমু আছে। হিমু থাকতে চিন্তা করবার কি আছে?

সব মেয়ে এক কলেজে পড়ে না, এবং সবারই কলেজের ছুটি একই দিনে ফুরোয় না। কাউকে দুদিন আগে রওনা হতে হয়, কাউকে দুদিন পরে। সরযূ যায় সবার শেষে।

এটাও একটা সমস্যা। হিমু কি দফায় দফায় কলকাতা দৌড়বে আর আসবে? পাঁচটি ছাত্রীই কি একত্র হয়ে হিমুর সঙ্গে যেতে পারে না।

ব্যবস্থা হয়, সবাই একই দিনে একই সঙ্গে যাবে। নিভাকে আর প্রমীলাকে সোজা হোস্টেলে তুলে দিয়ে হিমু অতসীকে মির্জাপুর স্ট্রীটের মাসিমার বাড়িতে, কল্যাণীকে বালিগঞ্জে বড়দির বাড়িতে, আর সরযুকে আলিপুরে ছোটমামার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তা তো হলো। কিন্তু হিমু কি সেদিনই কলকাতা থেকে গিরিডি ফিরে আসবে?

না। কল্যাণীর মামা বলেন—না! অতসীর কাকিমা বলেন—না। সরযুর দাদা বলেন—না। তোমাকে আরও কয়েকটা দিন কলকাতায় থাকতে হবে হিমু। তুমি নিজে মেয়েটাকে একেবারে হোস্টেলে তুলে দিয়ে তারপর গিরিডি রওনা হবে।

মেয়ে পৌঁছবার এই বিচিত্র জটিল দায় এক কথায় স্বীকার করে নিতে একটু আপত্তি করে না হিমু।

হিমুদা! হিমুদা! হিমুদা! শহরের পাঁচ মেয়ে কলকাতা রওনা হবার দিন স্টেশনে বিচিত্র কলরবে মুখর, একটা দৃশ্যও দেখা দিল।—হিমুদা আমার ব্যাগটা কোথায়? হিমুদা আমার ছাতাটা কোথায়? এক প্যাকেট লজেন্স নিতে ভুলবেন না হিমুদা।

ডাকটা হিমুদা বটে, এবং একটা আপনত্বের ডাকও বটে; কিন্তু সত্যিই দাদা বলে কেউ কি হিমুকে সম্ভ্রম করছে? হিমুর গায়ে ঠেলা দিয়ে কথা বলতেও প্রমীলার হাতে একটুও বাধে না। পাঁচটি ছাত্রীর কলকাতা যাত্রার উল্লাসের মধ্যে একমনে অবাধ নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু ফাই-ফরমাস খাটতে থাকে হিমু। কেউ কারও জিনিস-পত্রের দিকে ভুলেও একটা পাহারার দৃষ্টি তুলে তাকায় না। এমন কি বাপ-মা কাকা যাঁরা স্টেশনে এসেছেন তাঁরাও না! তাঁরা মেয়ের কানের কাছে উপদেশ বর্ষণ করতেই ব্যস্ত।—পৌঁছেই চিঠি দিবি। সাবধান, শীতটা পড়লেই গরম জলে স্নান করতে যেন ভুল না হয়।

বাক্স গোনে হিমু। খাবারের ঝুড়িগুলিকে গুনে একদিকে সরিয়ে রাখে হিমু। সরযুর ওভারকোট আর কল্যাণীর মাফলার হিমু দত্তের হাতে ঝুলছে। অতসী তার হাতের ছোট ব্যাগটাকেও হিমু দত্তের হাতের দিকে এগিয়ে দেয়। ব্যাগ হাতে তুলে নেয় হিমু। অতসীও এইভাবে হাত খালি করে নিয়ে খোঁপাটাকে নাড়াচাড়া ক'রে একটু গুছিয়ে নেয়।

স্টেশনেই, এবং ট্রেন ছাড়বার আগেই পাঁচ মেয়ের দাবীর এই ব্যাপার। বাকি পথে তাহলে কি কাণ্ডই যে হবে অনুমান করতে পারেন বাপ মা আর কাকা মামারা। ভাবতে গিয়ে হেসেও ফেলেন। আলোচনাও করেন, সত্যিই এরা হিমুকে পেয়েছে কি? ভাল মানুষ বলে একেবারে ওকে দিয়ে পান পর্যন্ত সাজিয়ে নেবে?

হিমু দত্ত যে একটা পুরুষ মানুষ, হিমু দত্তের জীবনের এই সহজ ও সামান্য সত্যটুকুও কি ওরা মনে রাখতে পারে না? কোন হিমিদির প্রতি ওদের মনে যেটুকু সমীহ আর ভয় থাকে, তার দশভাগের এক ভাগও যদি হিমুদা নামে এই পুরুষ মানুষটার প্রতি থাকতো! কিন্তু হিমু দত্তের সম্পর্কে কারও চিন্তায় এরকম কোন প্রশ্নেরই বালাই যেন নেই!

হিমু দত্তের বয়সটাও যে পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়, এই সত্যও যে এতগুলি মেয়ের মধ্যে কোন মেয়ে মনে রাখতে পারে না। প্রমীলার ওভারকোটের পকেটের মধ্যে একটা রুমাল রয়েছে, সেন্ট মাখানো রুমাল। একটি মুহূর্তের মতও সাবধান হয়ে ভাবতে পারেনি প্রমীলা, ঐ রুমালের সৌরভ হিমু দত্তের নিশ্বাসের বাতাস স্পর্শ করতে পারে। সরযূ তার হাতের যে ছোট ব্যাগটা হিমু দত্তের হাতে তুলে দিয়েছে, সেই ব্যাগের গায়ে, উপরের খাঁজকাটা খাপের মধ্যে সরযূর মুখের ছোট একটা সুশ্রী ফটো বসানো আছে। ভুলেও এক বার ভেবে দেখতে পেরেছে কি সরযূ, হিমু দত্তের চোখের উপর ঐ ফটোর ছায়া হঠাৎ ঝিক করে ফুটে উঠতে পারে? কি মনে করে ওরা? হিমু দত্তও একটা মেয়ে? কিংবা হিমু দত্ত একটা ব্যক্তি মাত্র, এবং ঐ ব্যক্তিত্বের কোন পৌরুষেয়তা নেই?

গিরিডি থেকে কলকাতা পর্যন্ত যেতে ট্রেনের সারাটা পথ হিমুদাকে দিয়ে ওরা কি সব কাণ্ড করিয়েছিল, সে গল্প আর তিন মাস পরেই বাড়ির সকলে শুনতে পেল; বড়দিনের ছুটিতে হিমু আবার কলকাতায় গিয়ে ওদের যখন নিয়ে এল।

হিমুদা কমলালেবু ছুলে দিয়েছে, ওরা খেয়েছে। হিমুদা চীনাবাদামের খোসা ভেঙ্গে দিয়েছে, ওরা খেয়েছে। কাণ্ডগুলি করতে ওদের একটুও বাধেনি এবং হিমুরও একটুও আপত্তি হয়নি।

—হিমুদা বেচারা সত্যিই মাটির মানুষ। কি ভয়ানক উপদ্রবই না আমরা করলাম, কিন্তু হিমুদা শুধু হেসেই সারা হয়ে গেল!

বড়দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসে যে-ভাষায় যে-ভাবে হেসে হিমুদার

নামে গল্প করে প্রবীণা, প্রায় সেই ভাষাতেই সে-ভাবে হেসে নিজের নিজের বাড়িতে গল্প করে সরযূ, অতসী, নিভা আর কল্যাণী।

এ হেন হোমিও হিমুই একদিন চমকে উঠলো; যে নামে তাকে কেউ ডাকে না, সেই নামেই একজন তাকে ডেকে ফেলেছে। হিমাদ্রিবাবু! কি আশ্চর্য, হোমিও হিমু নিজেই যে নিজেকে হিমাদ্রিবাবু বলে মনে করতে ভুলে গিয়েছিল। কল্পনাও করতে পারেনি যে, এরকম একটা সম্ভ্রম মিশিয়ে তার নামটাকে ডাকা যায়, এবং কেউ ডাকতে পারে। তা ছাড়া, হিমাদ্রিবাবু বলে ডাকলো যে তার বয়সও যে হোমিও হিমুর বয়সটার তুলনায় খুব কম নয়। হোমিও হিমুর বয়স বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। হিমাদ্রিবাবু বলে ডাকলো যে, তার বয়স বড় জোর একুশ-বাইশ। হিমুদা নয়; এমন কি হিমবাবুও নয়, একেবারে হিমাদ্রিবাবু। একটু বেশি আশ্চর্য হবারই কথা। কারণ, গিরিডিতে এই এক বছরের জীবনে, সব মানুষের সঙ্গে এত মেলামেশা জানাজানি ও চেনাচিনির ইতিহাসে, নিজেকে যে-নামে কোনদিন শুনতে পায়নি হোমিও হিমু, সেই নাম ধরে ডেকে ফেললো যে, সে একটি মেয়ে। বেশ বড়লোকের মেয়ে; বেশ-সুন্দরী মেয়ে। বেশ শিক্ষিতা মেয়েও বলতে পারা যায়, কারণ সে এখন কলেজে সায়েন্স পড়ছে; সেকেণ্ড ইয়ারে পৌঁছেচে।

সেই মেয়ের বাবা একটা সমস্যায় পড়েছেন বলেই হোমিও হিমুর জীবনে এই নতুন নামে ডাক শোনবার ঘটনাটা দেখা দিয়েছে, নইলে এরকম একটা ডাক বোধহয় জীবনে না-শোনেই থেকে যেত।

উশ্রী নদীর কিনারায় একটা ফাঁকা শালবনের কাছাকাছি সুশ্রী একটি বাড়ি। চারু ঘোষের বাড়ি—উদাসীন।

বেশ টাকা-পয়সা আছে উকীল চারু ঘোষের, এবং বাড়িটার চেহারাও বেশ রং-চঙে। বাড়িতে যখন তখন গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজে, এবং বারান্দার উপর মক্কেলের ভিড়ও লেগে আছে। তাই একটু ভাবতে হয়, এমন বাড়ির নাম উদাসীন রাখা হলো কেন?

চারু ঘোষের জীবনটা মোটেই উদাসীন নয়। অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ও চিন্তারত জীবন। চারু ঘোষের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের চেহারাও উদাসীন নয়। সব সময়েই হাসছে আর খেলছে, বেশ দুরন্ত খুশির জীবন। তারপর, বড় মেয়ে যূথিকা ঘোষের জীবন। ঝকঝক করে চোখ, ঝিকঝিক করে

মুখের হাসি আর ঝলমল করে সাজ, যুথিকা ঘোষের জীবনটাকে একটা উজ্জ্বল আশার জীবন বলেই মনে করতে হয়। উদাসীনতার সামান্য ছায়াও নেই যুথিকা ঘোষের মুখের ভাষায় ও চোখের চাহনিতে।

পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে এক পয়সার উপকার নেব না, এবং কাউকে এক পয়সার উপকার দেবও না। এ রকম একটা আদর্শ বাস্তবতার সংসারে সত্যিই সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন আর যারই মনে যত গোলমাল বাধাক না কেন, চারু ঘোষের মনে কোন গোলমাল বাধাতে পারে না। এ বিষয়ে চারু ঘোষের মনটা একেবারে পরিষ্কার। বিশ্বাস করেন চারু ঘোষ, এই রকম জীবনই হলো আদর্শ জীবন। কারও উপকার নেব না, কারও উপকার করবো না। কারও অপকার করবো না, কারও কাছ থেকে অপকার নিতেও পারবো না। অর্থাৎ সরে থাকবো, যেন কেউ অপকার করবার সুযোগ না পায়। চারু ঘোষকে যারা ভালমত জানে, তারা বিশ্বাসও করে। হাঁ, বাস্তবিক, চারু ঘোষ সত্যিই মানুষের উপকার-অপকারের নাগাল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা দার্শনিক অস্তিত্ব সত্য করে তুলতে পেরেছেন।

চারু ঘোষের বাড়িতে কোন ক্রিয়া-কর্মে, কোন উৎসবে কারো নিমন্ত্রণ হয় না। চারু ঘোষও কোন বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান না। ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনে যে উৎসবটা হয়, সে উৎসব নিতান্ত একটা পারিবারিক উৎসব। চিঁড়ের পোলাও রান্না করা হয়, এবং বাড়িতেই দুধ ফাটিয়ে ছানা করে আম সন্দেশ তৈরি করেন যুথিকার মা। স্বয়ং চারু ঘোষ, দুই ছেলে বীরু নীরু, মেয়ে যুথিকা এবং যুথিকার মা ; এই পাঁচটি মানুষ ছাড়া বাড়ির আর কোন মানুষ চিঁড়ের পোলাও ও আম-সন্দেশের স্বাদ গ্রহণ করে না। নিয়মই নেই।

বাড়ির আর মানুষ বলতে শুধু ঠাকুর চাকর ঝি মালী আর ড্রাইভার। উদাসীনের উৎসবের দিনেও তারা তাই খায়, যা রোজই খেয়ে আসছে। ডাল ভাত আর একটা তরকারি। চিঁড়ের পোলাও আর আম-সন্দেশ একেবারে ষ্ট্রিক্টলি শুধু উদাসীনের বাপ-মা আর ছেলে-মেয়েদের খাবার টেবিলে পরিবেশন করা হয়।

হ্যাঁ, পরের দাবীর দিকটাও দেখতে ভুল করেন না চারু ঘোষ। সেদিকে তাঁর চোখ অন্ধ নয়, বরং খুবই সজাগ। ড্রাইভারকে যদি একবার ডাকঘরে পাঠাতে হয়, তবে চারু ঘোষ তাঁর পাল্টা কর্তব্যও স্মরণ করেন। একটা এক্সট্রা

কাজ করেছে ড্রাইভার, এটা ড্রাইভারের নিয়মিত কাজের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং সেই ড্রাইভারের এই সামান্য এক্সট্রা কাজের জন্য ড্রাইভারকে এক পেয়ালা চা ও একটা বিস্কুট খেতে দেন যুথিকার মা। চারু ঘোষ বলেন—পয়সা দিয়ে কাজ নেব; কারও উপকার চাই না। ঠকবো না, কাউকে ঠকাবোও না।

মালী মাসে একদিন বাড়ী যাবার ছুটি পায়! এদিকেও নজর আছে চারু ঘোষের, যেন সত্যিই ছুটিটা অস্বীকার না করে মালী। মাসে একটা দিন ছুটি দেওয়া হবে বলে যখন নিয়ম করা হয়েছে, তখন সে নিয়মের এক চুল এদিক-ওদিক করা চলবে না, ছুটির দিনে মালীকে বাড়ি যেতেই হবে। যদি না যায়, তবে কাজ করতে দেওয়া হবে না। এবং সারাটা দিন মালীটা উদাসীনের বাগানের এক কোণেই সেই ছোট টিনের ঘরটার মধ্যে পড়ে থাকলেই বা কি? সেদিন উদাসীনের ভাত ডাল তরকারি খাবার অধিকার থাকবে না মালীর। খায়ও না মালীটা। মালী নিজেই বাজার থেকে নিজের পয়সায় ছাতু কিনে এনে খায়।

যুথিকার মা পাটনা থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন, তাইতেই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। যুথিকার পাটনা যাওয়া চাই। আর একটি দিনও দেরি করা চলে না। কিন্তু কে নিয়ে যাবে?

পাটনা থেকে চিঠি দিয়েছেন যুথিকার মামী; জানিয়েছেন, নরেন এখন পাটনায় আছে। আর তিন-চার দিন মাত্র থাকবে। তারপরেই বোম্বাই চলে যাবে নরেন। সুতরাং...বুঝতেই পারছো, এই চিঠি পাওয়া মাত্র যুথিকা যেন পাটনা চলে আসে। তা ছাড়া, যুথিকার কলেজ খুলতেই বা আর কটা দিন বাকি আছে? বোধহয় আর পাঁচ-ছয় দিন হবে। পাটনা তো আসতেই হবে। না হয় পাঁচ-ছয় দিন আগেই এল।

যুথিকাও এরকম একটা সংবাদ শুনতে পাবে বলে তৈরি ছিল না। পাটনার কলেজ খুলতে আর সাতটা দিন বাকি আছে। যুথিকা জানে, আর ছ'দিন পরে ঠিক সময় মত মধুপুর থেকে বলাইবাবু চলে আসবেন, এবং যুথিকাকে পাটনা পৌঁছে দিয়ে আসবেন; প্রত্যেকবার কলেজ ছুটির সময় পাটনা থেকে যুথিকাকে নিয়ে আসেন, ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর পাটনাতে পৌঁছে দিয়ে আসেন বলাইবাবু। চারুবাবুর মধুপুরের যত বাড়ির ভাড়া আদায়ের সরকার মশাই, সেই বলাইবাবু, যিনি চারুবাবুর বাবার বয়সী, এবং আগে চারুবাবুর বাবার অফিসেই চাকরি করতেন।

এবারও বলাইবাবু সময়মত আসবেন এবং তাঁরই সঙ্গে পাটনা চলে যাবে যুথিকা, এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ওলট-পালট ঘটাবার দরকার হবে, এমন সম্ভাবনা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। চারুবাবু না, যুথিকার মা না, যুথিকাও না। কিন্তু পাটনার মামীর চিঠিটা হঠাৎ চলে আসতেই ফাঁপরে পড়লেন সবাই। সরকার মশাই, অর্থাৎ বলাইবাবু তো এখন মধুপুরে নেই। তিনি ধর্মকর্ম করতে পুরী গিয়েছেন, এবং পুরী থেকে ফিরবেন ঠিক সেই দিনের আগের দিনটিতে, যেদিন যুথিকার কলেজ খোলবার কথা। বলাই-বাবুর পুরীর ঠিকানাও জানা নেই যে, একটা টেলিগ্রাম করে বলাইবাবুকে অবিলম্বে চলে আসতে বলা যেতে পারে। কিন্তু জানা থাকলে আর টেলিগ্রাম করলেই বা কি? বলাইবাবুর আসতেও তো ছুটো দিন সময় লাগবে। তারপর যুথিকাকে নিয়ে পাটনায় পৌঁছতে আর একটা দিন লাগবে। ততদিন নরেন আর পাটনায় থাকবে না। তাহলে···নরেন যদি যুথিকাকে চোখে না দেখেই চলে যায়, তবে কেমন করে জানতে পারা যাবে যে, যুথিকাকে বিয়ে করবার জন্য এতদিনে সত্যিই তৈরি হয়েছে নরেন? যুথিকার মামী জানেন, যুথিকা আজও নরেনের কাছ থেকে স্পষ্ট করে ওকথাটা শুনতে পায়নি।

নরেনের সঙ্গে যুথিকার বিয়ে হবে বলেই আশা করেন চারুবাবু, যুথিকার মা এবং যুথিকার পাটনার মামী। কিন্তু বিয়ে নাও হতে পারে, এমন আশঙ্কাও আছে। তিন বছর ধরে প্রত্যেক ছুটিতে বোম্বাই থেকে যখন পাটনাতে আসে নরেন, গর্দানিবাগে যুথিকার মামার বাড়িতে নরেনের নিমন্ত্রণ হয়, এবং নরেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে যাকে দেখতে পাবে বলে আশা করে, সেই যুথিকাকে দেখতেও পায়। কোন সন্দেহ নেই, যুথিকাকে ভালবাসে নরেন কিন্তু ভালবেসেও আর কতকাল অপেক্ষা করতে চায় নরেন?

করুক না অপেক্ষা, চারুবাবুর কোন আপত্তি নেই। যুথিকার এই তো সেকেণ্ড ইয়ার চলেছে। যুথিকা ছাত্রী ভাল। যতদিন নরেন অপেক্ষা করবে, ততদিন যুথিকার কলেজের পড়ার জীবনও চলতে থাকবে। সেটাও এক-রকমের ভালই বলতে হবে। বরং এই সময় বিয়ে হয়ে গেলেই যুথিকার পড়া বন্ধ হয়ে যাবার ভয় আছে। যুথিকাকে কি বোম্বাই নিয়ে না গিয়ে আরও কটা বছর পাটনা কলেজের ছাত্রী হয়ে থাকতে দিতে রাজি হবে নরেন!

ঠিক ওসব প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, নরেন আবার অর্থাৎ নরেনের মনটা

আবার যদি উদাস হয়ে যায়? সত্যিই মাঝে একবার উদাস হয়ে গিয়েছিল! বছরের মধ্যে বার তিনেক পাটনাতে আসে নরেন; যূথিকার সঙ্গে প্রত্যেকবারই দেখা হয়। এবং ওদের দু'জনের মেলামেশার আনন্দও বছরে তিনবার উৎসবের মত উতলা হয়ে উঠে। এই দেখা-শোনা ও মেলামেশার মধ্যে যদি হঠাৎ কোন ছেদ পড়ে; যদি একবার, কিংবা পর পর কয়েক বার দুজনের মেলামেশার উৎসব বাদ পড়ে যায়, তবে যে নরেনের মনে অপেক্ষার আগ্রহও উদাসীন হয়ে যেতে পারে! এমন অনর্থ অনেক ভালবাসার জীবনে ঘটছে দেখা গিয়াছে। শুধু একটানা এক বছরের অদেখাতেই ভালবাসা ভেঙ্গে গেল। এবং কেউ কারও খোঁজও নিল না, এমন ঘটনা চারুবাবু তাঁর নিজের শ্যালিকা সুমতির জীবনে দেখেছিলেন। তাই একটা ভয় আছে তাঁর মনে। যূথিকার মা এবং মামীর মনেও ভয় আছে। যেন হাতছাড়া না হয় নরেনের মত ছেলে! ভারত সরকারের টেক্সটাইল উন্নয়নের কাজে এক হাজার টাকা মাইনের একটা পদ এই ত্রিশ বছর বয়সেই দখল করেছে যে ছেলে, সেই যূথিকার মত একটা সায়েন্স পড়া সেকেণ্ড ইয়ারের মেয়েকে ভালবেসেছে; যূথিকার ভাগ্যের জোর আছে। যূথিকা দেখতে সুন্দর বটে কিন্তু ওরকম সুন্দর মেয়ে কতই তো আছে।

যূথিকারও জানতে বাকি নেই, পাটনার মামী চিঠিতে কি লিখেছেন। নরেন এসেছে। যূথিকা ঘোষের পক্ষে মনের চঞ্চলতা নিরোধ করে রেখে উদাস হয়ে থাকা অসম্ভব। নরেন পাটনায় থাকবে, আর যূথিকাকে দেখতে পাবে না, নরেনের চোখের বেদনাকে যেন চোখে দেখতে পায় যূথিকা। ইস, মাত্র আর তিনটি দিন পাটনায় থাকবে নরেন! তার পরেই পাটনার ছেলে হতাশ হয়ে তার বোম্বাই-এর কাজের জীবনে চলে যাবে। এসময় গিরিডিতে পড়ে থাকা যে যূথিকার জীবনের একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। ভুল করবে না নরেন, যদি অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে যূথিকাকে বিশ্বাসঘাতিকা বলে সন্দেহ করে ফেলে!

একাই পাটনা চলে যেতে পারা যায়না কি? পারা যায়, কিন্তু চারুবাবুই যেতে দিতে রাজি হবেন না। তা ছাড়া, যূথিকাও মনে মনে স্বীকার করে, যূথিকার নিঃশ্বাসের আড়ালেও একটা ভয় আছে। একা যেতে আর সাহস হয় না। মনে পড়ে, সেবার বড়দিনের ছুটির সময় পাটনা থেকে একাই গিরিডি রওনা হয়েছিল যূথিকা। এবং ট্রেন বদল করবার জন্য গয়াতে নেমেই দেখতে পেয়েছিল, চামড়ার বড় বাক্সটা নেই আর গলার হারটাও নেই।

মেয়ে কামরায় ভিতরেই ছিল যুথিকা, এবং ভুলের মধ্যে এই যে, মাত্র পনর-বিশ মিনিট, বড় জোর আধ ঘণ্টা হবে, জানালার কাঠের উপর মাথা হেলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমিয়েছিল। তাইতেই এই কাণ্ড! না, একা একা ট্রেনে যাওয়া-আসা করবার ইচ্ছাটাও আর সাহস পায় না।

আদালত থেকে বাড়ি ফিরে এসে চারুবাবু বললেন—নবলকিশোরবাবু বললেন, হিমু নামে একটা লোক আছে, যার ওপর এরকম একটা কাজের দায় অনায়াসে ছেড়ে দেওয়া যায়। বেশ ডিপেণ্ডেবল্। আর, একটা ডাক দিলেই ছুটে চলে আসে।

বীরু আর নীরু এক সঙ্গে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে—হোমিও হিমু, হোমিও হিমু।

চারুবাবু আশ্চর্য হন—তার মানে?

যুথিকাও হাসে—লোকটার পুরো নাম হিমাদ্রিশেখর দত্ত। লোকটা নাকি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করে।

চারুবাবু—কই, এ শহরে এরকমের কোন ডাক্তারের নাম তো কখনও শুনিনি।

যুথিকা—লোকটা সত্যিই ডাক্তারী করে না। মাস্টারী করে। গণেশ-বাবুর ছেলে-মেয়েদের পড়ায়।

চারুবাবু—লোকটাকে তুই চিনিস নাকি?

যুথিকা—দেখছি। ওর নামে মজার মজার অনেক গল্পও শোনা যায়।

চারুবাবু—দেখে কি রকম মনে হয়? ছ্যাঁচোর-ট্যাচোর নয় তো?

যুথিকা—না। তবে একটু ইডিয়টিক মনে হয়।

চারুবাবু—তা হলে মন্দ নয়। তাহলে লোকটাকে ডাকতে হয়।

যুথিকার মা ব্যস্ত হয়ে বলেন—ডাকতে হয় আবার কি? ডেকে ফেল। আর একটুও দেরি করা উচিত নয়।

ডাকতে দেরি হয়নি। হিমু দত্তকে ডেকে আনবার জন্য ব্যস্তভাবে চলে গেল ড্রাইভার, এবং মাত্র আধঘণ্টা পরে ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যস্তভাবে চলে এল হিমু দত্ত।

চারুবাবু বলেন—তুমি ড্রাইভারের কাছ থেকেই সব শুনেছ বোধহয়।

হিমু—হ্যাঁ।

চারুবাবু—আজই, এই সন্ধ্যার ট্রেনেই রওনা হতে হবে।

হিমু—যে আজ্ঞে।

চারুবাবু—শুনেছি তুমি খুব ডিপেণ্ডেবল্ আর ডিউটি সম্বন্ধে খুব সজাগ।

হিমু বিনীতভাবে হাসে—আপনাদের সামান্য একটু উপকার করবো, এর জন্য মিছামিছি কেন এত প্রশংসা করছেন।

চমকে ওঠেন চারুবাবু—উপকার? উপকার করতে বলছে কে তোমাকে?

হিমু দত্তও অপ্রস্তুত হয়; আর চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে। চারুবাবু বলেন—আমার ধারণা, তোমার দৈনিক রোজগার দু'টাকার বেশি হয় না। কি বল?

হিমু বলে—তা বটে। মাসে ষাট টাকার মত হলে দিন দু'টাকায় তো দাঁড়ায়।

চারুবাবু—পাটনা যেতে আর ফিরে আসতে তোমার তিনটি দিন লাগবে।

হিমু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চারুবাবু—সুতরাং, তোমার তিন দিনের কাজের কামাই হিসাব করে ধরলে, তোমার রোজগারের ছ'টা টাকার ক্ষতি হয়।

হিমু হাসে—হিসাব করলে তাই হয়, কিন্তু সত্যি ক্ষতি হয় না।

চারুবাবু—তার মানে?

হিমু—ছেলে পড়াবার কাজে দু'তিন দিন কামাই করলে কেউ আমার মাইনে কাটে না।

চারুবাবু—ওসব কথা বলে আমাকে লাভ নেই; পরে কি করে বা না করে, সে-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার কথা হলো···

দেয়ালের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চারুবাবু বলেন—এই ছ'টাকা তুমি পাবে। তা ছাড়া তোমার খোরাকী বাবদ দিন আরও দু'টাকা। অর্থাৎ ছ'টাকা ছ'টাকা বার টাকা।

হিমু বলে—না।

যূথিকার মা বলেন—বেশ তো, না হয় আরও দুটো টাকা পাবে।

হিমু—না।

চারুবাবু তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে কঠোরভাবে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—আমার কাজের দরকারটাকে তুমি ব্ল্যাক-মার্কেট মনে করলে না কি হে?

এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল হিমু। এইবার মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। এবং তাকিয়ে দেখতে

পায়, এই মুহূর্তে পাটনা রওনা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে মেয়ের জীবন, সেই মেয়েই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরাদরির ভাষাগুলি শুনছে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে যুথিকা ঘোষ। হিমু দত্তের চতুর অবাধ্যতার উপর বিরক্তি আর ঘৃণার আক্রোশ যেন কোন মতে চেপে রেখেছে যুথিকা। লোকটা একটুও ইডিয়ট নয়, মানুষের বিপদের উপর দর হেঁকে টাকা আদায়ের কায়দা খুব ভাল করেই রপ্ত করেছে লোকটা।

কিন্তু সত্যিই কি চলে যেতে চাইছে লোকটা? দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে কেন?

যুথিকা ডাক দেয়—বাবা?

ডাকটা আর্তনাদের মত শোনায়। যুথিকা ঘোষের জীবনের আশার অভিসারকে ব্যর্থ ক'রে দেবার ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছে হিমু দত্ত নামে চতুর পয়সালোভী এই লোকটা। ওকে এই মুহূর্তে সন্তুষ্ট না করতে পারলে, ওকে রাজি করাতে না পারলে, যুথিকা ঘোষের জীবনও যে আশার পথে এগিয়ে যেতে পারবে না।

যুথিকা ঘোষের ডাকের অর্থ বুঝতে দেরি করেন না চারুবাবু। হিমু দত্তের দিকে তাকিয়ে ডাক দেন।—শোন ওবে।

ডাক শুনে মুখ ফেরায় হিমু। এবং শোনবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

চারুবাবু বলেন—তোমাকে মোট ত্রিশটা টাকা পারিশ্রমিক দিচ্ছি।

হাঁপ ছেড়ে এবং নিশ্চিন্ত হয়ে হিমু দত্তের দিকে তাকান চারুবাবু। এবং সেই মুহূর্তেই চমকে ওঠেন। কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে হেঁটে দরজার দিকে চলে যাচ্ছে হিমু দত্ত।

চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবাবু—এ কি? তুমি একটা কথাও না বলে…এ কি রকমের অভদ্রতা!

হিমু দত্ত থমকে দাঁড়ায়; এবং শান্তভাবে হাসে—আমি টাকা নিই না স্যার।

চারুবাবু—তার মানে…এমনি শুধু…একটা বাতিকের জন্য…

হিমু—লোকের দরকারে আমি এমনিতেই একটু আধটু খেটে উপকার করি স্যার।

চারুবাবুর জীবনের একটা অহঙ্কারের স্তম্ভকেই যেন একটা ভয়ানক ঠাট্টার আঘাতে কাঁপিয়ে আর নাড়িয়ে দিয়েছে হিমু দত্ত।—ছটফট ক'রে বার-বার এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন চারুবাবু। কোথা থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে

বাজে একটা লোক এসে চারুবাবুর মত শুদ্ধ অহঙ্কারের গৌরবে গরীয়ান এক মানুষের একটা দরকারের সুযোগ পেয়ে যেন তাঁর চুল ধরে মাথাটাকে টেনে নীচু ক'রে দিচ্ছে। কারও উপকারের পরোয়া করেন না, কারও ধার ধারেন না যে মানুষ, সে মানুষকে আজ হিমু দত্তের মত একটা ইডিয়টের অহঙ্কারের ব্যক্তিকের কাছে হাত পেতে ঋণ চাইতে হবে?

গলার ভিতর যেন ধুলো ঢুকেছে; জোরে একবার কেশে নিয়ে এবং মাথাটাকে একটু হেঁট ক'রে বিড়বিড় করেন চারুবাবু।—বেশ, তবে তাই হোক, টাকা নিও না।

হোমিও হিমুর জীবনের একটা মূর্খ ব্যক্তিকের কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছেন চারুবাবু। কিন্তু চারুবাবুর এই আহ্বানের মধ্যে হৃদয়ের অভিনন্দন নেই। যেন একটা আক্রোশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শুধু দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে হিমু দত্তের উপকার সহ্য করতে রাজি হয়েছে। মানুষকে অপমান করবার আগে অহঙ্কারে মানুষ নিজে পায়ের জুতোর দিকে তাকাতে গিয়ে ঠিক এইরকম মাথা হেঁট করে।

হিমু দত্ত বলে—যা-হোক, আমার আর কিছু বলবার নেই।

চারুবাবু—তাহলে তৈরী হও, এই সন্ধ্যার ট্রেনেই···

হিমু হাসে—না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জীবনে এই প্রথম, অন্তত হিমু দত্তের গিরিডির জীবনে এই প্রথম স্পষ্ট স্বরে 'না' করতে পেরেছে হিমু, 'না' বলবার ইচ্ছে হয়েছে হিমুর। হিমু দত্তের জীবনের মূর্খ ব্যক্তিকটা হঠাৎ চালাক হয়ে গিয়েছে কিংবা হিমু দত্তের জীবনের গোবেচারা সম্মানটাই হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

যূথিকা ঘোষের ছায়ার পাশ দিয়েই ব্যস্তভাবে হেঁটে চলে গেল হিমু দত্ত। মস্ত বড় বারান্দা, তাড়াতাড়ি হেঁটে পার হতেও এক মিনিট লাগে। হন হন করে হেঁটে চলে যেতে থাকে হিমু, এবং ফুলের টবের সারি পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই পিছনের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায়।

—হিমাদ্রিবাবু! পিছন থেকে ডাক দিয়েছে যূথিকা ঘোষ। ডাকতে ডাকতে একেবারে কাছে এসেছে।

—হিমাদ্রিবাবু? ডাকটা যে একটা কপট স্তুতি। এই ডাকের পিছনে চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষের জীবনের একটা দরকারের তাগিদ মুখ টিপে হাসছে। সত্যিই তাই কি?

যূথিকা ঘোষের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝা যায় না। বুঝতে

পারে না হিমু। শুধু বোঝা যায়, হিমু দত্তের এই বিদ্রোহকে যেন কোন মতে শান্ত করবার জন্য যুথিকার উদ্বিগ্ন চোখের মধ্যে একটা চেষ্টা ছটফট করছে।

যুথিকা বলে—আপনি রাজি না হলে আমার আজ পাটনা রওনা হবার কোন উপায় নেই। আর, আজই রওনা না হতে পারলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে হিমাদ্রিবাবু।

—বেশ তো। বেশ তো। ঠিক আছে, কিছু ভাববেন না। আপনি তৈরী হয়ে নিন।

বলতে বলতে, এবং বোধহয় মনের মধ্যে একটা নতুন বাতিকের তাড়নায় বিচলিত হয়ে ফুলের টবের কাছে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াতে থাকে হিমু দত্ত। যুথিকা ঘোষের মুখে করুণ অনুরোধ, একটা নকল করুণতা নিশ্চয়। কিন্তু তবু তো হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে। ইচ্ছে নেই, তবু তো সম্মান দেখিয়েছে।

যুথিকা ঘোষের তৈরি হতে পাঁচ মিনিট লাগে। ড্রাইভারের গাড়ি বের করতে এক মিনিট লাগে। এবং সন্ধ্যার ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনে পৌঁছে যেতে পাঁচ মিনিট।

জগদীশপুর পার হয়ে গেল ট্রেন। মাঝে মাঝে ফুলের নার্সারি আর রাঙামাটির মাঠের এদিকে-ওদিকে ছোট ছোট শালের কুঞ্জ। ট্রেনে বসে ফুলের নার্সারি আর শালকুঞ্জের দিকে চোখ পড়লেও যুথিকা ঘোষের মনের মধ্যে পাটনার ছবি ফুর-ফুর করে। ট্রেনটা ছুটতে ছুটতে দু'পাশের ফুলের নার্সারির বাতাসকে বুকের ভিতরে টানছে। গোলাপের গন্ধে মাঝে মাঝে ভরে যাচ্ছে ট্রেনের কামরা। কিন্তু যুথিকা ঘোষের কল্পনাকে নিকটের ঐ গোলাপের গন্ধ বোধহয় স্পর্শ করতে পারে না। হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকায়নি যুথিকা ঘোষ, শালকুঞ্জগুলিকে দেখেও দেখতে পায়নি।

মধুপুরে পৌঁছতে ট্রেনটার বেশ দেরি হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। পথের মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়েছে ট্রেনটা। একজন যাত্রী নেমে গিয়ে খবর নিয়ে ফিরেও আসে. এক ভদ্রলোক অ্যালার্ম শিকল টেনেছেন। দুটো চোর তাঁর স্যুটকেস নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—এই জন্যেই একা একা আর ট্রেনে ঘুরতে সাহস পাই না হিমাদ্রিবাবু।

এতক্ষণে এই প্রথম যুথিকা ঘোষ পাটনার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে যেন কাছের জগতের একটা সমস্যার সঙ্গে আলাপ করলো। এতক্ষণ কামরার ভিতরে হিমু দত্ত নামে মানুষটা যুথিকার চোখের খুব কাছে বসে থাকলেও তাকে দেখতেই পায়নি যুথিকা, এবং কোন কথা বলবার দরকারও বোধ করেনি।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করতেই যূথিকা বলে—আমি একাই পাটনা চলে যেতে পারতাম। কিন্তু শুধু ঐ একটি কারণে আপনাকে সঙ্গে নিতে হলো। চোরেরা মেয়েছেলেকে একটুও ভয় করে না। তাই, অন্তত, নামে-মাত্র একটা পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকলেও চোরের উপদ্রব থেকে একটু নিরাপদ থাকা যায়।

হিমাদ্রিবাবু নামে ডাক শুনে যে মেয়ের মুখের দিকে একবার খুবই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল হিমু দত্ত, সেই মেয়েরই মুখের দিকে আর একবার আশ্চর্য হয়ে তাকায়। এটা প্রথম আশ্চর্য ভেঙ্গে যাবার আশ্চর্য। হিমাদ্রিবাবু কথাটার মধ্যে সম্ভ্রম আছে, কিন্তু যূথিকা ঘোষ যাকে হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে, তার মধ্যে কোন সম্ভ্রমের বস্তু দেখতে পেয়েছি কি? হিমু দত্তকেও কি শুধু নামে-মাত্র একটা পুরুষ বলে মনে করেছে যূথিকা ঘোষ?

বেশিক্ষণ নয়, কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, আর বেশি সময় লাগেনি, এই প্রশ্নেরও একটি পরিষ্কার উত্তর পেয়ে যায় হিমু দত্ত।

যূথিকা তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে।—তাই আপনাকে সঙ্গে নিতে হলো।

চারু ঘোষের মেয়ের জীবনে একটা কাজের দরকারে, শুধু পাটনা পৌঁছে দেবার জন্য তার পিছনে একটা নাম মাত্র পুরুষ হয়ে একটি বা দুটি দিনের জন্য একটা অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে যাকে, তাকেই হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে যূথিকা। কিন্তু এমন ডাক ডাকবার কি প্রয়োজন ছিল? নিভা আর সরযূদের মত হিমুদা বলে ডাকাই তো উচিত ছিল? না, হিমুদা ডাকটা যূথিকা ঘোষের মুখে ভাল শোনাবে না। হিমুর চেয়ে যে বয়সে এমন কিছু ছোট নয় যূথিকা, সেটা যূথিকার চেহারা আর হিমুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যায়। প্রায় সমবয়সী কোন অনাত্মীয় পুরুষকে দাদা বলে ডাকতে কোন মেয়ের ইচ্ছে হয় না বোধহয়, এবং ডাকটা মুখেও বেধে যায়। কিন্তু নামেমাত্র পুরুষকে একটা নামে-মাত্র দাদা বলে মনে করে ফেললেই তো হয়। তা যদি না পারে, তবে সোজা হিমু বলে ডেকে ফেললেই বা দোষ কি? একটা নামে-মাত্র পুরুষকে অনায়াসে শুধু নাম ধরে ডাকতে পারবে না কেন কোন মেয়ে? তা ছাড়া, যূথিকা ঘোষের জীবন ও হিমু দত্তের জীবনের পার্থক্যটাও দেখতে হয়! কোথায় আভিজাত্যে সম্পদে শিক্ষায় কালচারে রুচিতে আর আকাঙ্ক্ষায় এত বড় হয়ে গড়ে ওঠা যূথিকা ঘোষ নামে এই মেয়ের জীবন, আর কোথায় হোমিও হিমুর জীবন, যে-জীবন বলতে গেলে কাঠের উপর লেখা একটা নাম মাত্র।

মস্ত বড় বাড়ি ঐ উদাসীনের মেয়ে অনায়াসে হিমু দত্তকে হিমু বলেই ডাকতে পারতো। ডাকলে অন্যায় বা অমানান কিছু হতো না। এবং তাহলে হিমু দত্তের মনটাও অকারণে কয়েক ঘণ্টা ধরে একটা মিথ্যা প্রশ্ন দিয়ে মনের ভিতরে কোন ভাবনার দ্বন্দ্ব বাধাতো না।

হিমু দত্ত কি ভাবছে, যুথিকার কথাগুলি হিমু দত্তের মনের ভিতরে গিয়ে কোন আঘাত দিল কি না দিল সেটুকু চিন্তা করবার কথাও যুথিকা ঘোষের মনে দেখা দিতে পারে না। হিমু দত্তের মুখের উপর কোন নতুন ছায়া পড়েছে কি না পড়েছে, সেটা হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকালেও বুঝতে পারে না যুথিকা। হিমু দত্তের মুখ তেমনিই শান্ত, তেমনই একটি জড়পদার্থ। বই-এর রঙিন ছবিকেও একটু নাড়া-চাড়া করলে ছবিটা যেন রং বদলায়। কিন্তু হিমু দত্তের ঐ নিরেট ও নির্বিকার মুখের উপর রং ছিটিয়ে দিলেও বোধহয় মুখটা রঙীন হয়ে উঠবে না।

এবং কালি ছিটিয়ে দিলেও বোধহয় কালো হয়ে যাবে না হিমু দত্তের শান্ত মুখ। হিমু দত্তের মনের ভিতর থেকে কয়েক ঘণ্টার ছোট একটা বিস্ময় হঠাৎ ভেঙ্গে গেল, বেশ হলো। কিন্তু সেজন্য হিমু দত্তের মুখের উপর কোন ভাঙনের বেদনা কালো হয়ে ওঠে না।

ছোট হাত ব্যাগটাকে আস্তে আস্তে খোলে যুথিকা। ব্যাগের ভেতরে ছোট একটি আয়না। সেই আয়নার বুকে নিজেরই মুখের ছবিকে প্রায় আধ-মিনিট ধরে অপলক চোখে দেখতে থাকে। হাত তুলে কপালের দু'পাশের চুলের ফুরফুরে দুটি ছোট স্তবক নেড়ে-চেড়ে একটু ভেঙ্গে দিয়ে এবং আরও ফুরফুরে ক'রে দিয়ে ব্যাগ বন্ধ করে যুথিকা। যুথিকার চোখের কাছে, সামনের বেঞ্চিতেই প্রায় মুখোমুখি বসে আছে যে নামেমাত্র একটা অস্তিত্ব, সেটা আছে বলেও যেন মনে করতে পারে না যুথিকা।

উঠে দাঁড়ায় যুথিকা। উপরে রাখা ছোট বাক্সটাকে খুলে একটা বই বের করে। ঝকঝকে ও রঙীন মলাটের একটি উপন্যাস। মধুপুর পৌছতে আর বেশি দেরী নেই। উপন্যাসের পাতার উপরে চোখ রেখে মনের সব আগ্রহ জমাট করে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে যুথিকা।

মধুপুর পৌছবার পর একটু বিরক্ত হয়ে এবং বাধ্য হয়ে হিমু দত্তের সঙ্গে যুথিকাকে কয়েকটা কথা বলতে হলো। কারণ ট্রেনটা মাত্র থেমেছে, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো হিমু দত্ত—কুলি! কুলি।

গিরিডি টু মধুপুর, ট্রেন প্রায় ফাঁকা, নামবার যাত্রীর সংখ্যাও খুব কম।

তা ছাড়া, প্ল্যাটফর্মের উপর গিজগিজ করছে কুলি। লাগেজ নামাবার জন্ত হুড়োহুড়ি ক'রে কুলিগুলো তো এখুনি ছুটে আসবে। অনর্থক অকারণ কুলি কুলি বলে চেঁচিয়ে একটা কাজ দেখাবার দরকার কি?

যুথিকা বলে—আঃ, কেন মিছিমিছি হাঁক ডাক করছেন? কোন দরকার নেই! আপনাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না।

হিমু দত্ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে তার পরেই হঠাৎ একমুখ হাসি হেসে প্রশ্ন করে—আপনি বোধহয় হাঁকডাক চেঁচামেচি পছন্দ করেন না?

যুথিকা শুধু বলে—অবান্তব প্রশ্ন।

মধুপুরে ট্রেন থামবার পর বেশ কিছুক্ষণ থেকে কামরার ভিতরেই বসে থাকতে হয়, কারণ কুলিগুলো ছুটে আসে না। আসতে দেরি করছে। সেই ফাঁকে কিছুক্ষণের জন্ত গণেশবাবুর স্ত্রীর কথা, সেই সঙ্গে গণেশবাবুর বাড়ির আরও অনেক কথা ভাবতে হয়। কারণ হিমু দত্তেরই ঐ গায়ে পড়ে প্রশ্ন করবার রকম দেখে যুথিকার মনে পড়ে যায়, ঠিক এই রকমই গায়ে পড়ে কথা বলবার আর প্রশ্ন করবার একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে গণেশবাবুর স্ত্রীর, অর্থাৎ রমা মাসিমার।

উদাসীনের মেয়ে কারও উপকার নেয় না, নিতে চায় না। চারুবাবুর জীবনের সেই দার্শনিক আদর্শটা তাঁর মেয়ের জীবনেও কম সত্য হয়ে ওঠেনি। গায়ে-পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলে না যুথিকা; কেউ গায়ে-পড়ে কথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। গণেশবাবুর স্ত্রী একদিন একরকম গায়ে পড়েই, অর্থাৎ নিজের ম্যালেরিয়ার গল্প বলতে বলতে হঠাৎ যুথিকাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার বয়স কত হলো যুথি?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে যুথিকা প্রশ্ন করেছিল—রোজ দশ গ্রেণ ক'রে কুইনিন খাবার পর কি হলো তাই বলুন। সারলো কি আপনার ম্যালেরিয়া?

উদাসীনের কোন মানুষ ভুলেও গণেশবাবুর বাড়িতে যায় না। কিন্তু ওরা আসে উদাসীনে; গণেশবাবু, রমা মাসিমা ও লতিকা। এবং এসেই গায়ে পড়ে যত গল্প আর প্রশ্ন ক'রে চলে যাওয়া ওদের একটা ধর্ম যেন।

রমা মাসিমার উপর রাগ করতে যুথিকা ঘোষের মনটা আরও একজনের উপর রাগান্বিত হয়ে ওঠে। রমা মাসিমার মেয়ে লতিকার উপর। সত্যিই, কেমন যেন ওরা! যেমন গণেশবাবু, তেমনি রমা মাসিমা, আর তেমনি লতিকা—বাপ মা আর মেয়ে।

গণেশবাবুর বাড়িটা উদাসীন থেকে বেশি দূরে নয়। উত্রী থেকে বেড়িয়ে উদাসীনে ফিরতে হলে পথের উপরেই পড়ে গণেশবাবুর বাড়ি। বাড়িটার ফটকের কাছে প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল গাছ। একটুও রুচি নেই বাড়িটার। শিউলি নয়, করবী নয়, হাসনুহানা নয়—কাঁঠাল। তাছাড়া বাড়িটাও যেন কাঁঠলের কড়া গন্ধে মাখানো। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছেই আর আসছেই, আর ভনভন ক'রে চলে যাচ্ছে। ফটকটা কখনও বন্ধ থাকে না। একটা গায়ে-পড়া বাড়ি; পথের লোককে যেন ঘরের ভিতরে ঢোকাতে পারলেই ধন্য হয়ে যায়।

বারান্দার উপর চেয়ার পেতে আর খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা সব সময় বসে থাকেন গণেশবাবু। পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলেই হাঁক দিয়ে একটা কথা না বলে ছাড়েন না।

—কোথায় চললে হে চিন্তাহরণ? ছেলের পরীক্ষার ফল কি হলো? পাশ করেছে?

—এই মালতী! তোর জেঠিমাকে আজ সন্ধ্যায় একবার আসতে বলবি তো! বলবি, কটক থেকে চিঠি এসেছে।

—কেয়া সর্দারজী, কাহাঁ চলে? মামলা ডিসমিস হো গিয়া কেয়া?

—এই ঝুরিভাজা? খবরদার যদি এদিকে আবার এসেছ। কলেরা ছড়াবার জায়গা পাওনি?

—কত দাম পড়লো ক্ষিতীশবাবু? পেঁপেগুলি পরেশনাথের নাকি?

গণেশবাবুর এইসব প্রশ্ন তবু একরকম পদে আছে। তাঁর গায়ে-পড়া প্রশ্নগুলির মধ্যে কোন মতলব নেই। কিন্তু রমা মাসিমার গায়ে-পড়া প্রশ্নগুলি যে ভয়ানক একটা মতলবের ব্যাপার; একটা তদন্ত বলা যায়। নইলে যূথিকার বয়সের খোঁজ নেবার দরকার কি? লতিকার চেয়ে যূথিকার বয়স একটু বেশি কিনা, এই তো জানতে চান রমা মাসিমা। কেন জানতে চান, তা'ও জানে যূথিকা। এবং জানে বলেই মনটা মাঝে মাঝে বড় বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। তখন রাগ হয় আর একজনের উপর, যার চোখের সামনে দাঁড়াবার জন্য গিরিডি থেকে পাটনা ছুটে চলেছে যূথিকা। নরেনও যে লতিকাকে চেনে, এবং লতিকার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে, আলাপও হয়েছে নরেনের।

পাটনাতে থাকবার কোন দরকার হয় না লতিকার। কারণ পড়া ছেড়েই দিয়েছে লতিকা। তবু বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস পাটনাতেই থাকে লতিকা।

বছরে প্রায় আট-দশবার পাটনা থেকে গিরিডি আর গিরিডি থেকে পাটনা করছে। লতিকার বড়দা পাটনাতেই থাকে আর ডাক্তারী করে।

কোন দরকার নেই তবু বারবার গিরিডি থেকে পাটনা যাওয়া আর পাটনাতে থাকা কেন দরকার হয়েছে লতিকার জীবনে, সন্দেহ করতে আর বুঝতে কি কোন অসুবিধা আছে যুথিকার? একটুও না। যুথিকার মা বুঝেছেন, চারুবাবুও বুঝেছেন এবং পাটনার মামীও বুঝেছেন।

পাটনার মামীই অনেকবার স্পষ্ট করে যুথিকার মাকে লিখেছেন কোন সন্দেহ নেই কুসুমদি, আপনাদের পড়শী গণেশবাবু আপনাদের শত্রু হয়ে উঠেছে। গণেশবাবুর স্ত্রীটি আরও সাংঘাতিক বলে মনে হচ্ছে। সে বহুটি নিজে পাটনাতে এসে গর্দানিবাগে নরেনের বাড়ি গিয়ে নরেনের সঙ্গে আলাপ করে এসেছে। লতিকার সঙ্গে নরেনের বিয়ে দেবার জন্য ওরা কি ভয়ানক উঠে পড়ে লেগেছে, আপনি ধারণা করতে পারবেন না।

সাধ্যি কি লতিকার? সব খবর জেনেও মনে মনে হাসে যুথিকা। যেমন নরেনকে, তেমনি নরেনের মনের ইচ্ছাকেও চেনে যুথিকা। সেখানে ঘেঁষবার সাধ্যি কারও নেই। লতিকার ডাক্তার দাদা নরেনকে তোষামোদ করে যত নিমন্ত্রণই করুক না কেন, আর লতিকা যতই স্টাইল করে সেজে নরেনের চোখের সামনে এসে হেসে-হেসে কথা বলুক না কেন?

তবু একটা অস্বস্তি। লতিকা যে এখন পাটনাতেই আছে। নরেনও পাটনাতে আছে। ভাবতে গিয়ে যুথিকা ঘোষের মনের সঙ্গে শরীরটাও যেন ছটফট ক'রে ওঠে।

অ্যাঁ, কি ব্যাপার? সামনের পৃথিবীটাকে এতক্ষণে চোখে পড়েছে, তাই প্রশ্ন করতে পেরেছে যুথিকা।

—কি বলছেন? প্রশ্ন করে হিমু।

—কুলি আসেনি এখনো?

—না।

—কেন?

—কুলিরা আজ ষ্ট্রাইক করেছে।

চমকে ওঠে যুথিকা—তাহলে, কি উপায় হবে?

—আজ্ঞে?

—জিনিসপত্র নামাবে কে, আর পাটনার গাড়িতে তুলে দেবেই বা কে? এ তো আচ্ছা বিপদ দেখছি!

স্টেশনের বাতাস একটা আগন্তুক ট্রেনের ইঞ্জিনের তীব্র চিৎকারের শব্দে চমকে ওঠে। যাত্রীর হুড়োহুড়ি শুরু হয়, পাটনা যাবার ট্রেন ইন করেছে।

চেঁচিয়ে ওঠে যুথিকা।—কি উপায় হবে হিমাদ্রিবাবু? এই ট্রেনে যদি উঠতে না পারি, তবে পাটনা গিয়ে আর লাভই বা কি।

যুথিকা ঘোষের হতাশার বেদনা ওর উদ্বিগ্ন চোখ দুটোকে বোধহয় এখনি জলে ভরিয়ে দেবে। বড় বেশি ছলছল করে চোখ দুটো।

ব্যাঙ্কের উপর থেকে যুথিকার বেডিং আর বাক্সটাকে হিড়হিড় করে টেনে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে হিমু দত্ত বলে—চলুন।

রাতও হয়েছে, ট্রেনে ভিড়ও খুব। ফার্স্ট ক্লাসের কামরাও যাত্রীর ভিড়ে ঠাসা।

ভিড় একটু কম, এমন কামরা খুঁজতে খুঁজতে সময়ও পার হয়ে গেল। গার্ডের আলোর সঙ্কেত জলে উঠতেই তাড়াতাড়ি একটা ভিড়ে ঠাসা কামরার ভিতরেই উঠবার চেষ্টা করতে হলো।

দুলে উঠেছে ট্রেন। জানালা দিয়ে বাক্স আর বেডিং কামরার ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিল হিমু; যাত্রীর ধমক খেলো হিমু। দরজার হাতল ধরে কামরার ভিতরে পা এগিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো যুথিকা। তারপর পিছন থেকে হিমু দত্ত। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে যুথিকা ঘোষ—সর্ব্বনাশ।

—কি হলো? শান্ত হিমু দত্তও যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করে।

নিজের একটা পা-এর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে যুথিকা ঘোষ—একটা স্যাণ্ডেল নীচে পড়ে গেল।

যুথিকা ঘোষের এক পায়ের এক পাটি স্যাণ্ডেলের দিকে তাকায় হিমু দত্ত। সোনালী জরির কাজ করা লাল মখমলের স্যাণ্ডেল। তার পরেই মুখ ফিরিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে হিমু—ঐ যে।

তারপর হিমু দত্তকে আর দেখতে পায় না যুথিকা। বুক দুরদুর করে যুথিকার। লোকটা সত্যিই যে জুতোটাকে আনবার জন্যে নেমে পড়েছে, আর ট্রেনে যে এখন বেশ গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করেছে।

কামরায় ভিতরে বসবার জায়গা ছিল না। স্তব্ধ হয়ে, এক ঠায় দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে কাঁপতে থাকে যুথিকা। লোকটা সত্যিই আবার গাড়িতে উঠতে পারবে তো? জুতোটাকে কুড়িয়ে আনবার জন্ম লোকটাকে কোন হুকুম, কোন অনুরোধ করেনি, এমন কি চোখের ইঙ্গিতেও কোন নির্দেশ দেয়নি যুথিকা। আশ্চর্য, একটু ভয়-ডরের বোধও নেই লোকটার।

যুথিকার একটা খালি পায়ের দিকে তাকালো, তারপরেই একটা লাফ দিয়ে নীচে নেমে গেল।

যূথিকা ঘোষের আতঙ্কিত শরীরের কাঁপুনি, আর বুকের দুরদুরু হঠাৎ থেমে যায়। কামরার দরজার বাইরে পা-দানির উপর একটা মূর্তি। আবার লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠতে পেরেছে লোকটা। দরজা ঠেলে কামরার ভিতরে ঢুকেই যূথিকা ঘোষের পা-এর কাছে জুতোটাকে ফেলে দিয়ে কামরার চারদিকে তাকায় হিমু দত্ত।

সত্যিই ন স্থানং তিলধারণং। হিমু চিন্তিতভাবে কামরার এদিকে আর সেদিকে তাকাতে থাকে। তাই দেখতে পায় না, চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ একটা হাক ছেড়ে কি-রকম ক'রে হাসছে, আর হিমু দত্তকেই কি একটা কথা বলতে চেষ্টা করছে।

ধন্যবাদ জানবার চেষ্টা করছিল যূথিকা। কিন্তু লোকটা যে একবারও মুখের দিকে তাকাচ্ছেই না। ধন্যবাদ জানবার সুযোগেই পায় না যুথিকা, এবং আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে থাকে।

ফার্স্ট ক্লাসের কামরার ভিতরে জীবনে কোনদিন ঢোকেনি হিমু দত্ত। ফার্স্ট ক্লাসের মানুষগুলিকে দেখতেও বোধহয় একটু ভয়-ভয় করে।

গাড়ির মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। সশিশু মহিলারা টান হয়ে শুয়ে আছেন, ওদের কাছে গিয়ে কোন অনুরোধ করবার সাহস পায় না হিমু দত্ত। পুরুষেরা সবাই কামরার মেঝের উপর রাখা বাক্স আর বেডিং-এর উপর বসে আছেন। এঁদের অনুরোধ করবার কোন অর্থ হয় না। শুধু ঐ ট্রাউজার পরা ভদ্রলোক যদি···

অনুরোধ করলে শুনবে কি? একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, এই অবস্থাটা চোখে দেখিয়ে দিয়ে যদি ঐ ভদ্রলোককে একটু ছোট হয়ে বসতে অনুরোধ করা হয়, তবে ভদ্রলোক একটু ছোট হয়ে বসতে এবং একটু জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হবে কি? ভদ্রলোকের পরনে ট্রাউজার, তাই আরও হতাশ হয়ে যায় হিমু দত্ত।

দেখতে পায় যূথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে কি যেন বলছে হিমু দত্ত। বুঝতে পারে যূথিকা, একটু আরাম করে বসবার জন্যে জায়গা খুঁজছে হিমু দত্ত।

—নো নো, সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে ওঠেন ট্রাউজার পরা ভদ্রলোক।

হিমু বলে—আমি না, আমার জন্য বলছি না।

যুথিকার দিকে চোখ পড়ে ভদ্রলোকের, এবং সেই মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে আধ-শোয়ানো শরীরটাকে গুটিয়ে আর পা নামিয়ে পাশে আধ-হাত পরিমাণের একটা জায়গা তৈরী করেন। তারপর সাগ্রহ স্বরে হিমুকে বলেন—আসতে বলুন ওঁকে। যথেষ্ট জায়গা আছে।

যুথিকাকে এগিয়ে আসবার জন্য, এবং ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে খালি জায়গাটিতে বসবার জন্য হাত তুলে ইঙ্গিত করে হিমু দত্ত। যুথিকা ঘোষ একটু আশ্চর্য হয়। তরপরেই ছোট একটা ভ্রুকুটি করে যুথিকা মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে আবার সেই রকমই দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে থাকে।

মাথা নেড়ে আপত্তি করতে গিয়ে যুথিকা ঘোষের মনের ভিতরে অদ্ভুত রকমের একটা রাগের ঝাঁজও যেন তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভুরু কুঁচকে চোখ দুটো ছোট ক'রে হিমু দত্তের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবাব মুখ ফেরায় যুথিকা। মুখটাও লালচে হয়ে ওঠে।

ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের এই বেহায়া উদারতার রকম দেখে রাগ করেছে কি যুথিকা? কত ব্যস্ত হয়ে, যুথিকাকে পাশে বসাবার আশায় কত খুশি হয়ে সরে বসেছেন আর জায়গা ক'রে দিয়েছেন ভদ্রলোক। কিন্তু পরের উপকার নেওয়া পছন্দ করে না যে মেয়ে, তার পক্ষে রাগ হবারই কথা। কিন্তু রাগ করে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকায় কেন যুথিকা? চারু ঘোষের মেয়ের মনে এ আবার কোন রকমের ভুল? একজন অচেনা ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে বসবার জন্য যুথিকা ঘোষকে ইশারা করেছে হিমু দত্ত; এমন ইশারা করতে পারলো হিমু দত্ত? একটুও বাধলো না তাই কি রাগ করেছে যুথিকা?

যুথিকা ঘোষের ধারণা আর জল্পনাগুলিকে যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকে দিয়ে যুথিকার মনে আরও অস্বস্তি ভরে দিচ্ছে হিমু দত্ত। ধারণা করেছিল যুথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে নিজের জন্য জায়গা করেছে হিমু দত্ত। সে-ধারণা মিথ্যে হয়ে গেল। ধারণা করেছিল যুথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে ঐ জায়গাতে যুথিকা যখন বসলই না, তখন হিমু দত্ত নিজেই বসে পড়বে আর মনের সুখে হাঁপ ছাড়বে। যুথিকার এই ধারণাকেও মিথ্যে করে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হিমু দত্ত।

কিন্তু কতক্ষণই বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে হিমু দত্ত? হিমু দত্তের হাত-পা আর চোখ দুটো যেন একটু সুস্থির হতে আর শান্ত হতে জানে না। কামরার এদিকে ওদিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার কি যেন দেখতে থাকে, এবং

এক একজনের নীরব ও গম্ভীর ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কত রকমের ভঙ্গীতে মিনতি ক'রে কি-যেন বলতে থাকে। বোধহয় হিমু দত্তের মিনতি ব্যর্থ হয়, সাড়া না পেয়ে আবার এগিয়ে এসে যুথিকা ঘোষের বাক্সটাকেই একটা টান দেয়।

যেন কামরার ভিতরের এই মানুষ ও মালপত্রের ভিড়টাকে একটু এলোমেলো ক'রে দিয়ে বাক্সটারই জন্য জায়গা করতে চায় হিমু দত্ত। যাত্রী ভদ্রলোকেরা বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করেন; কেউ কেউ সতর্ক করেন দেন—একটু ভদ্রভাবে ধাক্কাধাক্কি করুন মশাই।

হিমু বলে—কিছু না, কাউকে একটু ছোঁবও না মশাই। শুধু এই বাক্সটাকে একটু সোজা করে রাখতে দিন।

বাক্সটাকে সোজা করে পেতে বেডিংটাকে তার পাশে কাত ক'রে দাঁড় করিয়ে দেয় হিমু দত্ত। এবং তারপরেই হেসে হেসে যেন এতক্ষণের চেষ্টায় একটা সাফল্যের গৌরবে ধন্য হয়ে যুথিকার দিকে তাকিয়ে বলে—এইবার বসুন!

—কি? ভ্রূকুটি করে যুথিকা।

—বসুন।

—আমার জন্য জায়গা করলেন নাকি?

—তবে কার জন্যে?

আনমনার মত কি যেন ভাবে যুথিকা; পরের কাছ থেকে এরকমের অদ্ভুত উপকার স্বীকার করে নিতে একটা লজ্জা আছে। তা ছাড়া, সত্যি কথা, যুথিকা ঘোষের মনটাও বিশ্বাস করতে পারে না, হিমু দত্তের এই চেষ্টাগুলি কি সত্যিই বিশুদ্ধ উপকার? এর পিছনে অন্য কোন ইচ্ছা নেই? হিমু দত্তকে প্রথমে দেখে যতটা বোকা-বোকা মনে হয়েছিল, এবং এখনও দেখে যতটা সরল মনের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, ততটা বোকা-বোকা আর ততটা সরল মনের মানুষ নয় বোধহয় হিমু দত্ত। ট্রাউজার-পরা ঐ ভদ্রলোকের মত স্পর্শলোভী না হলেও হিমু দত্তের মনটা একটু ছায়ালোভীও কি নয়? ধারণা করতে পারে যুথিকা, হিমু দত্তের অনুরোধে বিশ্বাস করে এই বাক্সের উপরে বসে পড়লে ভুল হবে। সন্দেহ হয়, হিমু দত্তও বাক্সের একদিকে একটুখানি জায়গা নিয়ে যুথিকা ঘোষের ছায়া ঘেঁষে বসে পড়বে! তখন কি আর হিমু দত্তের অভদ্রতাকে ধমকে শাসন করতে পারা যাবে? কিন্তু সন্দেহই বা করা যাবে কি করে?

যূথিকা ঘোষের সতর্ক মন, হিসেবী মন, আর উদাসীনের আভিজাত্যে-তৈরি কঠিন অহঙ্কারে মনও যেন একটা চতুর কৌশল খুঁজে পায়। বাঙ্কটার সারা পিঠটা জুড়ে একেবারে পা ছড়িয়ে বসে, আর বেডিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ে যূথিকা। যূথিকার গায়ের ছায়া ঘেঁষে বসবার আর একটুও জায়গা নেই। জব্দ হোক হিমু দত্তের গোপন ইচ্ছাটা।

অনেকক্ষণ ধরে একমনে উপন্যাস পড়ে যূথিকা। কতক্ষণ পার হয়ে গেল, সেই হুঁসও বোধহয় নেই যূথিকার। কারণ সত্যিই তো উপন্যাস পড়ছে না যূথিকা। উপন্যাসের পাতার দিকে তাকিয়ে নিজেরই জীবনের এক আশার অভিসারের আনন্দ তৃপ্তি আর উল্লাসগুলিকে মনে মনে পড়ছে। এই রাত্রিটা পার হয়ে যাবার পর আর মাত্র পাঁচ-ছয় ঘণ্টা, কিংবা একটু বেশি, তার পরেই নরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। স্টেশনে আসবে কি নরেন? মামী তো আসবেনই, কারণ বাবা নিশ্চয় একটা জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছে। কিন্তু মামী কি বুদ্ধি ক'রে নরেনকে খবর না দিয়ে ছাড়বেন? কাল সকালেই পাটনা পৌঁছে যাবে যূথিকা, খবর নিয়ে টেলিগ্রামটা কি এখনো পাটনায় পৌঁছে যায়নি?

জব্দ হয়েছে হিমু দত্ত. হঠাৎ দু'চোখ তুলে একেবারে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায় যূথিকা, বাঙ্কের একটা শেকল ধরে এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে হিমু দত্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে; আর ঘুমন্ত মাথাটা বার বার ঝুঁকে বাঙ্কের ফ্রেমের উপর পড়ে ঠুক ক'রে বেজে উঠছে।

খোলা উপন্যাস, মিথ্যা উপন্যাসটাকে বন্ধ ক'রে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় যূথিকা ঘোষ। রাত মন্দ হয়নি। আর ঘুম-হারানো চোখ দুটোর মধ্যেও বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি যেন ছটফট করছে।

হিমু দত্তকে একটা ধমক দিতে ইচ্ছে করে। কেন? ইচ্ছেটারই উপর যেন রাগ করে যূথিকা। লোকটার একটা ডিসেন্সি বোধও নেই? কি-রকম অভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত মাথাটাকে ব্যাঙ্কের কাঠের উপর ঠুকছে। লোকটার শরীরে কি একটু অস্বস্তিরও বোধ নেই?

তবু ভাল; এই কামরার এতগুলি ভদ্রলোক আর মহিলা তবু বুঝতে পারবে যে, যূথিকা ঘোষের সঙ্গে একটা বাজে লোক শুধু সঙ্গী হয়ে চলেছে। কোন আপনজন নয়। কোন নিকট আত্মীয়তারও সম্পর্ক নেই। হিমু দত্ত যদি যূথিকা ঘোষের পাশে বসে পড়তো, তবে এই কামরার সব মানুষের চোখ

কে-জানে কেমন করে তাকাতো, আর কি বুঝতো? ঐ যে শিখ মহিলা বার বার কেমন সন্দেহভরা চোখ নিয়ে একবার যুথিকার মুখের দিকে আর একবার হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, উনিই বোধহয় কোন সন্দেহ না ক'রে একেবারে বিশ্বাস করে ফেলতেন যে, এক বাঙালী ছোকরা তার…ছি, যা নয়, তাই বিশ্বাস করে ফেলতেন ঐ শিখ মহিলা।

ট্রেন থেমেছে। এটা জসিডি। বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনটা থেমে থাকবে। মা বলে দিয়েছেন, রাত বেশি করিস না, জসিডি পৌছেই খাবার খেয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিবি।

খাবারের বাক্সটাকে পাশেই দেখতে পায় যুথিকা, এবং হাত বাড়িয়ে খাবারের বাক্সটাকে কাছেও টেনে নেয়। কতগুলি লুচি আর সন্দেশ, এই তো খাবার। কিন্তু এতগুলি লুচি আর এতগুলি সন্দেশ কি জীবনে কোনদিন একসঙ্গে খেয়েছে যুথিকা? জিনিসগুলি নষ্ট হবে। অনর্থক, আদরের বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে এত বেশি খাবার সঙ্গে দিয়েছেন মা। আশ্চর্য, মা যেন যুথিকাকে একটা ক্ষিদের রাক্ষুসী বলে মনে করেন।

না, পাটনা পৌছতে পৌছতে খাবারগুলি নিশ্চয় নষ্ট হবে না। মামীর ছেলে অরুণ আছে, মামীর মেয়ে ধীরা আছে; বাসি লুচি-সন্দেশ খুশি হয়ে খাওয়ার মানুষ মামীর বাড়িতে আরও আছে।

খাবারের বাক্সের ভিতর থেকে অয়েল পেপারের একটা ছোট টুকরো বের করে নিয়ে তার উপর গুনে গুনে চারটে সন্দেশ আর চারটে লুচি রাখে যুথিকা। খাবারের বাক্স বন্ধ করে আবার পাশে রেখে দেয়।

ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ। একটা সন্দেশ মুখের ভিতর ফেলতেই চমকে ওঠে যুথিকা।

—চা চাই নিশ্চয়? চেঁচিয়ে উঠেছে হিমু দত্ত।

যুথিকা ঘোষের খাওয়ার আনন্দটাকেও যেন চমকে দিয়ে যুথিকার মনের ভিতর আবার কতগুলি বিরক্তি আর অস্বস্তি ভরে দিল হিমু দত্ত। চা চাই নিশ্চয়, কিন্তু এত চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করবার কি আছে?

কথা বলবার জন্য মুখ তুলেই দেখতে পায় যুথিকা, হিমু দত্ত নেই, প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে, এবং শোনাও যায়, চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে হিমু দত্ত- এই চা-ওয়ালা ইধার আও।

চা-এর পেয়ালা নিজেই হাতে নিয়ে দরজা ঠেলে কামরার ভিতরে ঢুকলো হিমু দত্ত, এবং যুথিকা ঘোষের হাতের কাছে চা-এর পেয়ালা এগিয়ে দিল।

কোন কথা না বলে, আর হিমু দত্তের মুখের দিকেও না তাকিয়ে চা-এর পেয়ালা হাতে তুলে নেয় যুথিকা ঘোষ। চা-এর পেয়ালায় চুমুক দেয়, এবং তারপরেই কেমন যেন সন্দেহ হয়। হ্যাঁ, চোখ তুলতেই খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পায় যুথিকা, দরজার কাছেই প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে হিমু দত্ত, আর, এক হাতে একটা শাল পাতার ঠোঙ্গা ধরে পুরি-তরকারি খাচ্ছে।

তিন চুমুকে চা শেষ ক'রে দিয়ে পেয়ালাটাকে পাশে রেখে দেয় যুথিকা, অয়েল পেপারের উপর এখনও চারটে লুচি আর তিনটে সন্দেশ পড়ে আছে, কিন্তু খাওয়া আর হলো না। যুথিকা ঘোষের হাতটা যেন রাগ ক'রে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে খাবার সুদ্ধ অয়েল পেপারের টুকরোটাকে দলা পাকিয়ে একটা আবর্জনার মত একপাশে ফেলে রেখে দেয়। তার পরেই উপন্যাসের পাতা খুলে মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করে, অনেক রাত হয়েছে, খাবার না খাওয়াই ভাল কিন্তু মিছিমিছি কিসের জন্য আর কার ওপর এত রাগ হলো?

চা-ওয়ালা আসে। পেয়ালা তুলে নিয়ে চলে যায়। চা-এর দামটা দিয়ে দেয় যুথিকা।

হিমু দত্ত আবার কামরার ভিতরে ঢোকে। যুথিকা ঘোষ প্রশ্ন করে —আপনার পুরি-তরকারির দাম কত? ক' আনা দিতে হয়েছে?

হিমু বলে—ছ'আনা।

ছ'আনা পয়সা হিমুর হাতের দিকে এগিয়ে দেয় যুথিকা ঘোষ। হাত এগিয়ে দিয়ে হিমু দত্তও বেশ আগ্রহের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে ছ'আনা পয়সা দিয়ে পকেটের ভিতর রাখে।

যুথিকা বলে—পয়সা গুনে নিন।

পকেট থেকে পয়সা বের করে আর গুনে নিয়ে হিমু বলে—ঠিক আছে।

সামান্য কয়েকটা কথা, এবং খুব অল্প কয়েকটা কথা কিন্তু এটুকু কথা বলতেই যেন হাঁপিয়ে পড়েছে যুথিকা ঘোষ, আর চোখ দুটোও জ্বলছে। এখন মনে হয়, এত অস্বস্তি ভোগ করে পাটনা যাবার কোন দরকারই ছিল না। না হয়, নরেন রাগ করে বোম্বাই চলে যেত। কিন্তু হিমু দত্ত নামে এধরনের অদ্ভুত লোকের সঙ্গে একটা ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকাও যে একটা শাস্তি। বড় নীচ মনের লোক। এর কাছে কোন সৌজন্য আর কোন লজ্জা আশা করা বৃথা। লোকটা প্রশ্ন করতেও জানে না। লোকটা যে যুথিকা ঘোষকেই নামে-মাত্র একটা মেয়ে বলে মনে করেছে।

আসানসোলতেই যাত্রীদের অনেকে নেমে গিয়েছে। এদিকের সীট একেবারে

খালি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারেনি যুথিকা, এরই মধ্যে কখন বেডিংটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সীটের উপর পেতে ফেলেছে হিমু দত্ত।

হিমু হাসে—আঃ, এবার আর কোন অসুবিধা নেই। অনেক জায়গা। আপনি এবার টান হয়ে শুয়ে পড়ুন।

কি বিশ্রী ভাষা। যুথিকা ঘোষের মত বয়সের মেয়েকে অনায়াসে টান হয়ে শুয়ে পড়তে বলে, বলতে মুখে একটু সঙ্কোচও নেই; হিমু দত্তের ভাষা সহ্য করতে আর ইচ্ছা হয় না।

কিন্তু খোলা বেডিং-এর দিকে এগিয়ে না যেয়েও পারে না যুথিকা। সত্যিই যে টান হয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে। এতক্ষণ কামরার ভিতরে ভিড়ের চাপের মধ্যে বাক্সটার উপর বসে ধুঁকতে ধুঁকতে শরীরে ব্যাথাও ধরে গিয়েছে।

যুথিকা বলে—আমার ব্যাপার নিয়ে বেশি ব্যস্ত হবেন না। আপনি এবার একটু নিজের সুবিধা ক'রে নিন।

হিমু বলে—আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি মিথ্যে ব্যস্ত হবেন না। আমার সুবিধা তো আমি ক'রে নিচ্ছিই।

বাস্তবিক, লোকটা একেবারে নিরেট। একটা ভাল কথারও সম্মান দিতে জানে না।

হিমু দত্তের কথা শুনলে রাগ হয়, এটাও যে যুথিকা ঘোষের মনের একটা দুর্বলতা। হিমুর মুখের একটা কথার অর্থ নিয়ে এত চিন্তা করাই ভুল। হিমুর কথার মধ্যে এক ফোঁটাও ঘষা-মাজা ভদ্রতা থাকবে, এটা আশা করাও ভুল। হিমুর চোখের সামনে টান হয়ে শুয়ে পড়লেই বা কি আসে যায়? যুথিকা ঘোষ রাগ করে ওর নিজেরই মনের রাগটার উপর।

কিন্তু হিমু দত্ত বসবে কোথায়? লোকটা কি এখনও দাঁড়িয়ে থাকবে বলে মনে করেছে? সন্দেহ হয় যুথিকার, আর বোধহয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে দুলতে বাঙ্কের কাঠের উপর ঘুমন্ত মাথাটাকে ঠুকে ঠুকে কষ্ট পাওয়ার ইচ্ছা নেই হিমু দত্তের; হিমু দত্তও ক্লান্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে সন্দেহ করতে হয়, এই সীটেরই একদিকে বসে পড়বে না তো হিমু দত্ত?

কী বিপদ! বিছানার উপর টান হয়ে শুয়ে পড়তে গিয়েও চুপ করে বসে থাকে যুথিকা। হিমু দত্তের কাণ্ডজ্ঞানের উপর ভরসা করা যায় না। হয়তো যুথিকা ঘোষের পা-এর কাছেই বসে পড়বে। মাথার কাছে বসে পড়লেই

বা কি? অস্বস্তির জ্বালায় যুথিকা ঘোষের শরীরটা জ্বলবে, আর ঘুমের দফা রফা হয়ে যাবে।

যুথিকা ঘোষের মন যেন শক্ত হয়ে এই সন্দেহগুলিকে একেবারে তুচ্ছ ক'রে আর মিথ্যে ক'রে দিতে চায়। বসুক না হিমু দত্ত, মাথার কাছে কিংবা পা-এর কাছে; চোরা চাউনি তুলে কিংবা হাঁ ক'রে যুথিকা ঘোষের ঘুমন্ত চেহারাটার দিকে যতখুশি তাকিয়ে যা ইচ্ছা হয় ভাবুক না কেন লোকটা। রাত জেগে কাহিল হতে পারবে না যুথিকা। শুয়ে পড়তেই হবে। হিমু দত্ত এমন মানুষ নয় যে, ওর চোখের দু-একটা চোরা চাহনিকে ভয় করতে হবে। টান হয়ে শুয়ে পড়ে যুথিকা ঘোষ। হাত তুলে চোখ দুটোকে ঢাকে, যেন উপরের কড়া আলোটার ঝলক চোখে না লাগে।

এইবার যেন মনে-প্রাণে একটা ঘুম প্রার্থনা করে যুথিকা। রাতটা স্বপ্নের মধ্যে দুলতে দুলতে পার হয়ে যাক।

নরেনের সঙ্গে লতিকার কি সত্যিই দেখা হয়েছে এবার? অসম্ভব নয়। লতিকা কি নরেনকে কোনদিন চিঠি লিখেছে? অসম্ভব নয়। নরেন কি লতিকার চিঠির কোন উত্তর দিয়েছে? অসম্ভব! কিন্তু উত্তর দিলেই বা কি? লতিকাকে কি লিখতে পারে নরেন, সেটা কল্পনা করতে পারে যুথিকা। এবং নরেনের চিঠির সেই ভাষা আর সেই কথা পড়ে লতিকা ঘোষের মনে আর যে-কোন ভাবনা দেখা দিক না কেন, কোন আশা দেখা দেবে না।

শেষ যে-দিন নরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যুথিকার, কি কথা বলেছিল নরেন? হাতের ছায়ায় ঢাকা-পড়া যুথিকা ঘোষের চোখ-বোঁজা মুখটাই হেসে ওঠে।—আর বড় জোর একটা বছর দেখবো যুথিকা, দেখি কলকাতায় বদলি হতে পারি কিনা। যদি দেখি যে, কলকাতায় বদলি হবার কোন আশা নেই, তবে অগত্যা তোমাকে বোম্বাই প্রবাসিনী হতে হবে যুথিকা।

প্রশ্ন করেছিল যুথিকা—লতিকার ডাক্তার দাদা তোমাদের বাড়ি গিয়ে কিসের গল্প করে এলেন?

কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু মৃদু হেসে যুথিকা ঘোষের প্রশ্নের সূক্ষ্ম সন্দেহটাকে একেবারে মিথ্যে ক'রে দিয়েছিল নরেন। সেদিনের পাটনার যত আশ্বাস, যত হাসি, যত আলো আর শব্দগুলি যেন এখানেই এসে ঝিমঝিম ক'রে বেজে বেজে যুথিকার মনটাকেই ঘুম পাড়াতে থাকে।

একটা ছোট স্টেশনে, কে জানে কেন, হঠাৎ থেমে গেল ট্রেনটা, এবং থামতে গিয়ে জোরে একটা ঝাঁকানি খেয়ে যাত্রীদের ক্লান্ত শরীরগুলিকে

চমকেও দিলো। ঘুম ভেঙে যায় যুথিকার ; ভয় পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে চোখ দুটো চমকে ওঠে।—অ্যাঁ ? একি ? কোথায় গেলেন আপনি ?

কিন্তু কই হিমু দত্ত ? যুথিকা ঘোষের পা-এর কাছেও না মাথার কাছেও না। দেখতে পায় যুথিকা, কামরার দরজার পাশে সেই কোণটি ঘেঁষে, কাত হয়ে দাঁড়িয়ে, কামরার কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে অঘোর ঘুমের সুখে মজে আছে হিমু দত্ত।

এমন লোককে সঙ্গে রাখা আর না রাখা সমান। যদি কোন চোর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে যুথিকার গলার হার ছিঁড়ে নিয়ে চলে যেত, তবে ? হিমু দত্তের দায়িত্ববোধ তো এই, যুথিকা ঘোষকে অসহায় ক'রে কামরার একদিকে ফেলে রেখে দিয়ে, নিজে আর একদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু এসব আবার কি কাণ্ড ? উপরের আলোটাকে কালো কাগজের ঠোঙা দিয়ে ঢেকে দিল কে ? যুথিকার গা-এর উপরের আলোয়ানটা মেলে দিল কে ? তাহলে অনেকবার কাছে এসেছে, দেখেছে আর চলে গিয়েছে হিমু দত্ত। যুথিকার ঘুমের আরামটাকে বেশ ভাল ক'রে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তবু···ইচ্ছে ক'রে, বোধহয় জোর ক'রে দূরে সরে গিয়ে একটা জেদের ভান করছে। কি মনে করে হিমু দত্ত, যুথিকা ঘোষ একেবারে খাঁটি ভদ্রতার কায়দা অনুযায়ী ওকে কাছে বসে থাকতে অনুরোধ করবে ? এবং সে অনুরোধ না করলেই একেবারে ওদিকে গিয়ে যেন কোন সম্পর্কই নেই এই-রকম একটা পোজ নিয়ে, আর শুধু নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে একটা কাণ্ড··· হিমু দত্তের কাণ্ডগুলি সত্যিই অদ্ভুত। বেশ সূক্ষ্ম একটা একরোখা জেদ আছে মানুষটার।

চোখ মেলে তাকায় হিমু। ব্যস্তভাবে যুথিকার কাছে এগিয়ে আসে। আর, পকেট থেকে সোনার একটা হার বের ক'রে যুথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—আপনার হারটা গলা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল। আপনি ঘুমের ঘোরে টের পাননি।

খালি গলাটার উপর হাত বুলিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আর হাত কাঁপিয়ে হারটাকে হিমুর হাত থেকে তুলে নিয়েই গম্ভীর হয়ে যায় যুথিকা।

ছোট একটা ধন্যবাদ জানিয়ে হিমু দত্তকে এইবার সরে যেতে বললেই তো হয়। কিন্তু ধন্যবাদের ভাষা যেন যুথিকার গলার ভিতরে আটকে গিয়েছে। তার কারণও মনের একটা অস্বস্তি, এবং অস্বস্তির মধ্যে একটা রাগের

উত্তাপও আছে। ধন্যবাদ শুনতে চায় না, ধন্যবাদের জন্য কোন লোভই নেই, পুরস্কার দাবি করে না, শুধু উপকার করবার জন্য একটা বাতিকের ঘোরে লোকের উপকার করে, এহেন লোকের সঙ্গে কথা বলাও যে একটা সমস্যা। কি বলবে বুঝতে পারে না যুথিকা ঘোষ।

সত্যিই হারটা নিজের থেকেই গলা থেকে খুলে নীচে পড়ে গিয়েছিল তো? চারু ঘোষের মেয়ের মন মানুষকে সহজে বিশ্বাস করবার মত মনই নয়। বিনা স্বার্থে মানুষের উপকার করবার বাতিকটাও নিঃস্বার্থ বাতিক নয়। পৃথিবীর ভয়ানক চালাকরা ভয়ানক বোকা সেজে থাকে, এ সত্যও জানা আছে যুথিকা ঘোষের। উদাসীনের খুব বিশ্বস্ত একটা চাকর ছিল, রামটহল। মনে পড়ে, রামটহলের সেই অতিসূক্ষ্ম ভালমানুষী ছলনার ঘটনাটা। হঠাৎ একদিন একটা দশ টাকার নোট হাতে নিয়ে চারুবাবুর কাছে গিয়ে বলেছিল রামটহল—এটা কিসের কাগজ, দেখুন তো বাবা, আপনার দরকারী কোন কাগজ নয় তো?

চারুবাবু আশ্চর্য হলেন, এবং ছোঁ মেরে নোটটাকে রামটহলের হাত থেকে তুলে নিয়ে বললেন—না, না, এটা একটা বাজে কাগজ; কোথায় ছিল এটা?

রামটহল—খাটের নীচে ঝাড় দিতে গিয়ে পেয়েছি।

হিসাবে দশটা টাকার গরমিল কোনদিন হয়নি; কোনদিন দশ-টাকার একটা নোট হারিয়েছে বলে মনেও পড়েনা চারুবাবুর। তবু বুঝলেন, সত্যিই ভুল হয়েছিল নিশ্চয়; ভুলক্রমে দশ টাকার একটা নোট নিশ্চয় কদিন আগে পকেটের ভিতর থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। যাই হোক কিন্তু চাকরটা কী চমৎকার বেকুব। একেবারে প্রস্তর যুগের বুনো মানুষের মত নিরেট একটা মূর্খ; দশ টাকার নোট পর্যন্ত চেনে না।

তার পর থেকে চারুবাবু আদালত থেকে ফিরে এসে রোজই গায়ের কালো কোটটা খুলে রামটহলের হাতে দিতেন। রামটহলই কোটটাকে আলনার হুকে টানিয়ে রাখতো। কোটের পকেটে তাড়া তাড়া নোট থাকতো; কিন্তু কোন আশঙ্কা নেই; নিশ্চিন্ত ছিলেন চারুবাবু। ঐ নোট রামটহলের কাছে অর্থহীন কতকগুলি কাগজ মাত্র।

সেই রামটহল একদিন উধাও হয়ে গেল। এবং দেখা গেল, চারুবাবুর কালো কোটটা ঠিক আছে; কিন্তু কোটের পকেটের ভিতর দু'হাজার টাকার নোটের দুটি ব্যাণ্ডিল নেই।

যূথিকা ঘোষের গলায় সোনার হার ফিরিয়ে দেওয়া রামটহলী কৌশলের মত একটা মতলবের ব্যাপার নয় তো? ঘুমন্ত যূথিকার গলা থেকে হারটাকে নিজেই খুলে নিয়ে, তারপর এইভাবে ফিরিয়ে দিয়ে চমৎকার সাধুতার একটা কীর্তি দেখিয়ে হিমু দত্তের এই বোকা-বোকা চোখের মধ্যে ভয়ানক চালাক কিছু লুকিয়ে নেই তো? যূথিকা ঘোষ বলে—কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, হারটা খুলে পড়ে যাবে কেন?

হিমু বলে—জানি না কেন খুলে পড়ে গেল। তবে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন।

হিমু দত্ত সেই শিখ মহিলাকে দেখিয়ে দেয়।

যূথিকা বিরক্ত হয়ে বলে—ঐ মহিলাকে কি জিজ্ঞাসা করতে বলছেন?

হিমু—উনি দেখেছেন, আপনার গলার হারটা খুলে নীচে পড়ে গেল। উনিই আমাকে ডাক দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, হারটা নীচে পড়ে আছে।

কথা শেষ ক'রে এবং যূথিকা ঘোষের কোন কথা শোনবার আশায় না থেকে সরে যায় হিমু দত্ত। এবং সরে গিয়ে দরজার কাছে সেই কোণটিতে সেই ভঙ্গীতে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোবার জন্য চোখ বন্ধ করে।

অনেকক্ষণ নিথর হয়ে বিছানার উপর বসে থাকে যূথিকা। সোনার হারটাকে আবার গলায় পরানো হয়নি। হাতের মুঠোর মধ্যে কুঁকড়ে পড়ে আছে ঝকঝকে সোনার হার। হারটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সাহস হয় না। মা'র কাছে অনেক মিথ্যে কথা বলে হার হারানোর অপরাধ ঢাকতে হবে, সেই ভয়ে বোধহয় যূথিকা ঘোষের হাতটা স্তব্ধ হয়ে থাকে; নইলে হিমু দত্তের মত একটা লোকের সততার ছোঁয়ায় একেবারে নির্লজ্জ হয়েছে যে হারটা, সেটার স্পর্শ এখন যূথিকা ঘোষের শুধু হাতটাকে নয়, মনটাকেও কামড়াচ্ছে; সে হার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেই ভাল ছিল।

গিরিডি থেকে রওনা হবার পর কম সময় তো পার হয়ে গেল না। কিন্তু এই ন'ঘণ্টার মধ্যে একটা মিনিটও বোধহয় মনের আরাম নিয়ে জেগে থাকবার সময় হয়নি যূথিকার। বিরক্ত করেছে হিমু দত্ত। বারবার জব্দ করেছে হিমু দত্ত। ভয় পাইয়ে দিয়েছে হিমু দত্ত। বারবার লোকটাকে সন্দেহ করতে হয়েছে, আর সন্দেহ করেই ঠকতে হয়েছে। ইচ্ছে করেনি তবু ওর উপকার সহ্য করতে হয়েছে।

হিমু দত্তের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল যুথিকা ঘোষ, এবং নিজেরই বোধহয় হুঁস ছিল না যে, হিমু দত্ত হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে ফেলতে পারে, এবং দেখেও ফেলতে পারে যে, চারু ঘোষের মত মানুষের মেয়ে হিমু দত্তের মত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু হিমু দত্তের চেহারাটাকে যে একটা ভয়ানক গর্বের চেহারা বলে মনে হয়। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার ক্ষমতা সংসারের সবচেয়ে সাংঘাতিক নিন্দুকেরও নেই, বোধহয় এই গর্বেই মজে আছে হিমু দত্তের মন। এটাই বোধহয় ওর ব্যক্তিত্বের একমাত্র আনন্দ।

হিমু দত্তের এই গর্ব কি ভেঙে দেওয়া যায় না? ওর কোন ভুল ধরে দেওয়া যায় না? যুথিকা ঘোষের মনের মধ্যে যে অস্বস্তি ছটফট করে, সেটা হলো একটা জেদ। হিমু দত্তকে জব্দ করবার জন্য একটা জেদ। হিমু দত্তের ব্যবহারের খুঁত ধরবার একটা প্রতিজ্ঞা।

ট্রেনটা থেমেছে।

কে জানে কোন স্টেশন? হিমু দত্তের ঘুমন্ত চোখ সেই মুহূর্তে দপ ক'রে সতর্ক পাহারাদারের চোখের মত জেগে ওঠে।

—শুনেছেন? ডাক দেয় যুথিকা।

এগিয়ে আসে হিমু দত্ত।

যুথিকা বলে—আপনার তো সব দিকেই নজর আছে, খুব সাবধান আপনি। আমার কোন অসুবিধাই হতে দিচ্ছেন না। কিন্তু—

হিমু—বলুন।

যুথিকা—কিন্তু…

বলতে গিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে ফেলে যুথিকা—কিন্তু আপনি জানেন না যে, আমার এখনও খাবারটুকু খাওয়ারও সুযোগ হয়নি।

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে হিমু।

—আপনি দেখেননি, দেখতে পাননি, দেখতে ভুলে গিয়েছেন। যুথিকার অভিযোগের ভঙ্গীটাই হঠাৎ যেন, রুষ্ট হয়ে ওঠে। হেসে হেসে ঠাট্টা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা আক্রোশ প্রকাশ ক'রে ফেলেছে যুথিকা।

হিমু বলে—দেখেছি।

যুথিকা আশ্চর্য হয়—কি?

হিমু—আমি দেখেছি, আপনি শুধু একটা সন্দেশ খেয়ে বাকি সব খাবার কাগজে মুড়ে ফেলে রেখে দিলেন।

কি আশ্চর্য! চমকে ওঠে যুথিকা; তারপরেই একেবারে বোবা হয়ে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

না, হিমু দত্তের তুলনা হয় না। হিমু দত্তের চোখ ভয়ানক সাবধান ও সজাগ চোখ। হিমু দত্তের একটি ত্রুটি ধরে অভিযোগ করবার আনন্দটুকুও যুথিকা ঘোষের কপালে জুটলো না। কিন্তু একটা প্রশ্ন তো করা যায়। বেশ রুক্ষস্বরে এবং প্রায় চেঁচিয়ে উঠে প্রশ্ন করে যুথিকা—চোখে দেখেও তো কিছু বললেন না।

হিমু দত্ত হাসে—বলা কি উচিত হতো?

—তার মানে? ভ্রূকুটি করে যুথিকা ঘোষ।

হিমু দত্ত আবার হাসে—বললে আপনি হয়তো ভাবতেন যে, আমি একটা অবান্তর কথা মিছিমিছি বলি আপনাকে··

—বুঝেছি। থাক, আর বলতে হবে না। যুথিকা ঘোষ আস্তে আস্তে ক্লান্ত ও অলস স্বরে কথাগুলি বলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আর জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকার দেখতে থাকে।

—বুঝতে আর অসুবিধা নেই, একেবারে মর্মে মর্মে এইবার বুঝতে পারা গিয়েছে, হিমু দত্তের মন জড়-পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। যা বলা হয় তাই শোনে, যা শোনে তাই বোঝে, যা চোখে পড়ে তাই দেখে হিমু দত্ত। নিজের থেকে কিছু শোনবার বুঝবার আর দেখবার চেষ্টা ওর মনের মধ্যেই নেই। মধুপুর স্টেশনে সেই যে শাসানি দিয়ে অবান্তর কথা বলতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিল যুথিকা, সে শাসানি স্মরণ করে রেখেছে হিমু দত্ত। কেমন যেন চাকর-চাকর মনের একটা লোক মাত্র। এহেন মানুষকে সন্দেহ ক'রে যুথিকা যে নিজেকেই ছোট ক'রে ফেলেছে। মনে মনে এই লজ্জা স্বীকার করে যুথিকা।

তবে ভাগ্য ভাল, যুথিকা ঘোষের মনের এই লজ্জা পৃথিবীর কারও চোখে ধরা পড়ে যাবে না। সেই ভয় নেই। এই হিমু দত্তও কল্পনা করতে পারে না যে, ওর মত মানুষকেও জব্দ করবার জন্য চারু ঘোষের মেয়ের মনে একটা জেদ চেপে বসেছিল! যুথিকা ঘোষেরও এই লজ্জা ভুলে যেতে কতক্ষণ লাগবে। আর একবার টান হয়ে শুয়ে মনের সুখে একটা ঘুম দিয়ে ভোর করে দিতে পারলেই হলো।

লজ্জাই বা কিসের? একটা লোক পরের উপকার করবার বাতিকে ভুগছে; সে লোকটার ওপর রাগ হওয়াই তো উচিত। তাকে সন্দেহ করাই উচিত।

আকাশে তারা নেই। তবে কি ভোর হয়ে আসছে? অন্ধকারটা ফিকে হয়েছে? তাই তো!

পাটনা পৌঁছতে এখনও বেশ দেরি আছে। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই ভাল।

কি গভীর ঘুম! আশা করেনি, ভাবতে পারেনি যূথিকা; ট্রেনের কামরায় একটা সীটের উপরে এলোমেলো একটা বিছানার উপর শুয়ে আর এত দোলানির মধ্যে এত ভাল ঘুম হতে পারে। ভোর হয়ে গিয়েছে কখন, জানতে পারেনি যূথিকা। সূর্য উঠেছে, সকাল হয়েছে, কামরার জানালা দিয়ে ভিতরে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, আর প্রত্যেকটা স্টেশনে এত হাঁকডাক হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেনি যূথিকা। ঘুম ভাঙলো তখন, যখন হিমু দত্তের ডাক কানের ভিতরে গিয়ে বেজে উঠলো।—শুনছেন, পাটনা এসে পড়েছে।

—পাটনা? চমকে জেগে উঠেই প্রশ্ন করে যূথিকা।

হিমু দত্ত বলে—হ্যাঁ।

যূথিকা ঘোষ তাড়াতাড়ি হাত-ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে। হিমু দত্ত যূথিকা ঘোষের বিছানা গুটিয়ে বাঁধা-ছাঁদা করে।

ট্রেনের গতি মৃদু হয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করেই প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকায় যূথিকা। হেসে ওঠে যূথিকার চোখ। ট্রেনটা থেমে আসছে। কিন্তু এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে যূথিকা, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে দু তিনটে চেনা মুখ হাসছে। মামী এসেছেন, মামীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে অরুণ। যূথিকাকে দেখতে পেয়ে হাত দোলাচ্ছে আর, ফরফর ক'রে উড়ছে নরেনের গলার লালরঙা টাই। নরেনের মুখে হাসি, সেই সঙ্গে নরেনের হাতের রুমালও স্মিত অভ্যর্থনার মত দুলে উঠেছে।

ট্রেন থেকে নেমে, প্রায় ছুটে গিয়ে মামীর কাছে দাঁড়ায় যূথিকা অরুণের গাল টিপে আদর করে; এবং তার পরেই নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

একটা কুলি যূথিকা ঘোষের বাক্স আর বিছানা মাথায় তুলে নিয়ে হাঁক দেয়—চলিয়ে।

যূথিকা বলে—চল।

চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় যূথিকা।—ও হ্যাঁ...

মনে পড়েছে, হিমু দত্তকে গিরিডি ফেরবার খরচটা দিতে হবে। হাত-ব্যাগ থেকে টাকা বের ক'রে হিমুর দিকে তাকায় যূথিকা ঘোষ।

এগিয়ে আসে হিমু। হিমুর হাতে টাকা ফেলে দিয়েই যূথিকা মামীর দিকে তাকায়।—চল এবার।

মামী বলেন—ছেলেটি?...

যূথিকা বলে—ও এখন গিরিডি ফিরে যাবে।

মামী—কে ছেলেটি?

যূথিকা ব্যস্তভাবে বলে—ও কেউ নয়, সঙ্গে এসেছে, এই মাত্র।

গর্দানিবাগের মাঠের কিনারায় পলাশের মাথা ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠলো যখন, তখন যূথিকা ঘোষের প্রাণটাও যেন গিরিডি ফিরে যাবার আশায় ফুলেল হয়ে ওঠে। কলেজের ছুটি হয়েছে, এবং এখন আর পাটনাতে পড়ে থাকবার দরকার নেই। কারণ, নরেন এখন আর ছুটি পাবে না, আর পাটনাতে আসতেই পারবে না। কাজেই, এখন গিরিডিতে চলে যাওয়াই ভাল।

লতিকা অনেকদিন আগেই গিরিডি চলে গিয়েছে। এবারের পাটনা-জীবনের ঘটনাগুলির ইতিহাস মনে পড়লে মনে মনে হেসে ফেলে যূথিকা। নরেনকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অন্তরঙ্গ হবার জন্য কতই না কষ্ট করেছিলেন লতিকার দাদা ডাক্তার শীতাংশু। কিন্তু যূথিকার মামী লতিকার ঐ ডাক্তার দাদার চেয়ে অনেক চালাক। যে দুটো দিন পাটনাতে ছিল নরেন, সে দুটো দিন চারবেলা নারনকে নিমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন মামী। লতিকার ডাক্তার দাদার নিমন্ত্রণ স্বীকার করবার সুযোগ পায়নি নরেন।

কিন্তু নরেনের মনটা একটু উদার, এবং কোমলও বটে। যূথিকার কাছেই কথায় কথায় অভিযোগ করেছিল নরেন, মামী এরকম চারবেলা ধরে একটা জবরদস্ত নেমন্তন্ন না খাওয়ালেই ভাল করতেন। শীতাংশুদা বেচারা নিজে এসে বারবার কত অনুরোধ করলেন; ওঁদের বাড়িতে গিয়ে এককাপ চা খেয়ে এলেও কত খুশি হতেন শীতাংশুদা।

যূথিকা গম্ভীর হয়ে বলেছিল—লতিকাও নিশ্চয় খুশি হতো।

নরেন—তা, খুশি হতো নিশ্চয়।

যূথিকা—গেলেই পারতে।

নরেন হাসে—যেতে পারলে ভালই ছিল, কিন্তু পারলাম কোথায়?

সব ভাল নরেনের, শুধু ওর মনের এই দুর্বলতাটা ভাল লাগে না যূথিকার। লতিকার ডাক্তার দাদা শীতাংশুবাবুর জন্য নরেনের এত বেশী শ্রদ্ধার আবেগও যূথিকা ঘোষের ভাল লাগে না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল মামীর চেষ্টা, এবং যূথিকার ইচ্ছা। যে ছুটি দিন পাটনাতে ছিল নরেন, যূথিকার সঙ্গে চারবেলা দেখা হয়েছে। ছু'দিন সন্ধ্যাবেলা ছু'জনে বেড়িয়ে এসেছে। এবং ছু'জনের মনের কথা ছু'জনের কানের কাছে আবার নতুন করে বলে বলে অনেক মুখরতা করেছে ছু'জনে। কোন সন্দেহ নেই যূথিকার, নরেনের মনও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, শুধু এ ভাবে বছরে কয়েকবার চোখের দেখা দেখে, আর যূথিকাকে শুধু ছু'দিনের বেড়াবার আর গল্প শোনার সঙ্গিনীরূপে কাছে পেয়ে তারপরেই বোম্বাই চলে যেতে ভাল লাগে না নরেনের। কিন্তু এখনও তৈরি হতে পারছে না নরেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, কলকাতায় বদলি হবার সুযোগ পাওয়ার আগেই যূথিকাকে বিয়ে করে হঠাৎ অত দূরে বোম্বাই-এ নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা।

যূথিকা বলে—বিয়েটা হয়ে যাক না ; বোম্বাই না হয় পরে যাব।

হেসে ফেলে নরেন—অপেক্ষা করতে কি তোমার ভয় হচ্ছে, কোন সন্দেহ হচ্ছে যূথিকা ?

—ছিঃ। কি যে বল! বরং তোমার মুখে এরকমের প্রশ্ন শুনতেই ভয় করে।

—তবে অপেক্ষা কর। মৃদু হেসে যূথিকাকে আশ্বাস দেয় নরেন।

কিন্তু এভাবে আশ্বস্ত হতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে যূথিকার প্রাণ। মনের ভিতরে কোথায় যেন একটা কাঁটার খোঁচা খচখচ করে। ভালবেসেও শান্ত হয়ে শুধু অপেক্ষা করার একটা ভয়ানক শক্তি যেন নরেনের আছে। লতিকাদের বাড়িতে যাবার জন্য, ডাক্তার শীতাংশুদার অনুরোধ রাখবার জন্য নরেনের মনের ছুর্বলতাগুলিও যেন নরেনের একটা শক্তি। তাই যূথিকার মনটা যেন মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে যায়। ভালবাসতে গিয়ে কি এভাবে কেউ হাঁপিয়ে পড়ে ? এত সাবধান হতে হয় কি ? বারবার এত ছুর্ভাবনা নিয়ে গিরিডি থেকে ছুটে আসবার দরকার হয় কি ? হারাই হারাই সদা ভয় হয়, এই বুঝি ভালবাসার লক্ষণ।

নরেনের বোম্বাই রওনা হবার দিন স্টেশনে গিয়েছিল যূথিকা। মামীও গিয়েছিলেন। আর, কি আশ্চর্য লতিকার ডাক্তার দাদাও গিয়েছিলেন। লতিকা অবশ্য যায়নি, এবং কেন যাবার সাহস হয়নি লতিকার, সেটা অনুমান করতে পারে যূথিকা। যূথিকা আছে যে! একেবারে জলজ্যান্ত যূথিকার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নরেনের সঙ্গে কথা বলবে লতিকা, এমন সাহসী প্রাণী নয় লতিকা। যাই হোক, ডাক্তার শীতাংশুদার এসেও কোন লাভ হয়নি।

ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নরেনের সঙ্গে অনর্গল কথা বললেন মামা ; শীতাংশুদা নরেনের সঙ্গে একটা কথা বলবারও সুযোগ পেলেন না।

পাটনার এই জীবনের কয়েক মাস আগের এই ইতিহাসের এক একটি ঘটনায় যূথিকা ঘোষের আশা জয়ের গর্বে ভরে উঠেছে। শুধু একবার মনে হয়েছিল, এবং মনটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, নরেনের একটা চিঠির ভাষাতে একটু অবান্তর কৌতূহলের মায়া ছিল। লিখেছিল নরেন, লতিকা বোধহয় এখন পাটনাতে আছে। যূথিকার চিঠি লিখতে গিয়ে লতিকার কথা মনে পড়ে নরেনের, এটা যে নরেনের মনের পক্ষে একটুও উচিত নয় ; সরল মনের নরেন এটুকুও বুঝতে পারে না।

গর্দানিবাগের পলাশের লাল দেখতে আর কি-এমন সুন্দর! মধুপুর পার হলেই ছ'পাশের মাঠে পলাশের মাথাগুলি এমন যে রঙীন আগুনের স্তবকের মত ফুটে রয়েছে। যূথিকাকে গিরিডি নিয়ে যাবার জন্য কবে আসবেন বলাইবাবু ?

মামী এসে বললেন—গিরিডি থেকে কুসুমদির চিঠি এসেছে। বলাইবাবু আসবেন না। লিখেছেন—

মামীর হাত থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে যূথিকা পড়ে।—ব্যবস্থা হয়েছে, হিমুই তোমাকে গিরিডি নিয়ে আসবে। পরেশবাবুর পিসিমাকে কাশী রেখে আসতে গিয়েছে হিমু, হিমুকে বলে দেওয়া হয়েছে, টেলিগ্রাম করে তোমাকে আগেই জানিয়ে দেবে, কখন কোন ট্রেনে দানাপুর পৌছবে হিমু। মামী যেন তোমাকে বাড়ির গাড়িতে দানাপুর পর্যন্ত পৌছে দেয়।

—হিমু কে ? প্রশ্ন করেন মামী।

—হিমাদ্রিবাবু। হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দেয় যূথিকা। আর মুখের উপরেও যেন মাঠের পলাশের লাল আভাটা ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ে।

—হিমাদ্রিবাবু কে ? আবার প্রশ্ন করেন মামী।

—তুমি তো তাকে দেখেছো। ঐ যে, যে ভদ্রলোক এবার আমাকে গিরিডি থেকে নিয়ে এল।

—তাই বল। ছেলেটিকে দেখে বড় ভাল ছেলে বলে মনে হলো।

—ভাল বৈকি।

—ছেলেটি দেখতেও বেশ।

—তা, খারাপ কেন হবে ?

—তেমন শিক্ষিত নয় বোধহয় ?

—একটুও শিক্ষিত নয়। কিন্তু…

—অবস্থাও বোধহয় খারাপ?

—ঠিক জানি না, তবে গরীব মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

মামী মুখ টিপে হাসেন—দূর পাগল মেয়ে; যার তার সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলতে নেই।

পাটনা থেকে কতবার গিরিডি যেতে হয়েছে, কিন্তু যুথিকা ঘোষের মুখটা সে যাত্রার জন্ম তৈরি হতে গিয়ে এরকম খুশিতে লালচে হয়ে উঠেছে কি কখনও? কোনদিনও না। এতদিন তো শুধু গিরিডি থেকে পাটনা ছুটে আসার পালাটাই জীবনের একটা ভাবনামধুর আর উদ্বেগসুন্দর পালা ছিল। কিন্তু গিরিডি থেকে ফিরে যাওয়ার হয়রানিটাও যে কল্পনায় মিষ্টি হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে কি যুথিকা?

হিমুর টেলিগ্রাম এল, আজই রাত আটটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনে দানাপুর পৌঁছবে হিমু, এবং যুথিকা ঘোষ যেন টিকিট কিনে সেই ট্রেনেই উঠবার জন্ম যথাসময়ে দানাপুরে উপস্থিত থাকে।

এখন দুপুর মাত্র; অনেক সময় আছে। কিন্তু যুথিকা ঘোষের ব্যস্ততা দেখে হেসে উঠলেন মামী—মামীর বাড়িতে কি খেতে পাচ্ছিলে না যুথি, গিরিডি যাবার নাম শুনেই লাফিয়ে উঠলে কেন?

দানাপুরের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আগন্তুক আটটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনটাকে দেখতে পেয়ে হেসে ওঠে যুথিকা ঘোষের মুখ। এবং ট্রেন থামবার পর, একটি কামরা থেকে হিমুকে নেমে আসতে দেখে সে হাসিটা আর একবার চমক দিয়ে যেন আরও সুন্দর হয়ে গেল।

ট্রেন ছাড়লো যখন, তখন কামরার একই সীটের উপর হিমুর পাশে ধপ করে বসে পড়ে যুথিকা ঘোষ, আর হাঁপ ছেড়ে বলে—আঃ, আমাকে গিরিডি নিয়ে যাবার জন্ম আপনিই আবার আসবেন, আমি কোনদিন ধারণাও করতে পারিনি!

হিমু—হ্যাঁ, আমি কাশী যাচ্ছি শুনতে পেয়ে আপনার মা ডেকে পাঠালেন, আর…

যুথিকা—সব জানি, সব জানি। আজই মা'র চিঠি পেয়েছি।…যাই হোক, আমাকে কিন্তু পরের স্টেশনেই চা খাওয়াতে হবে; সেই বিকালে এক

কাপ চা খেয়েছিলাম, তারপর আর···আমার ব্যাগটা ওপর থেকে একবার নামিয়ে দিন তো হিমাদ্রিবাবু, প্লীজ···আর দেখুন তো একবার, সীটের নীচে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন না, জলের কুঁজোটা উঠেছে, না দানাপুরেই পড়ে রইল ?

উঠে দাঁড়ায় হিমু, আর যূথিকা ঘোষের এতগুলি নির্দেশের ইঙ্গিতে খাটতে গিয়ে যেন তাল সামলাতে পারে না। বাঙ্কের উপরে তাকিয়ে হিমু বলে—না, জলের কুঁজো নেই। আর উবু হয়ে বসে মাথা নীচু করে সীটের নীচে তাকিয়ে বলে—কই, আপনার ব্যাগ এখানে নেই।

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে যূথিকা—আপনারও এরকম ভুল হয় ? আপনি না খুব স্মার্ট, কাজের মানুষ !

বিব্রতভাবে তাকায় হিমু—কি হলো ?

যূথিকা বলে—ব্যাগটা বাঙ্কের ওপরে, আর কুঁজোটা সীটের নীচে।

লজ্জিত হয় হিমু। আবার বাঙ্কের দিকে আর সীটের নীচে তাকিয়ে নিয়ে বলে—হ্যাঁ, ঠিক সবই আছে।

যূথিকা—তবে দিন।

হিমু—কি ?

যূথিকা—এক গেলাস জল।

কুঁজো থেকে গেলাসে জল ঢেলে যূথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় হিমু।

যূথিকা হাসে—আপনি খান। আপনার জন্তেই জল চেয়েছি।

হিমু একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়। যূথিকা বলে—আমি দেখেছি হিমাদ্রিবাবু দানাপুর স্টেশনে আপনি জলের কলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন...কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিল বলে জল না খেয়েই চলে এলেন।

জল খেয়ে নিয়ে হিমু বলে—ওঃ, এরকম কাণ্ড তো সারা জীবন ক'রে আসছি। ওসব গা-সহা হয়ে গিয়েছে।

যূথিকা ঘোষের চোখ, উদাসীনের কঠোর আভিজাত্যে তৈরি দু'টি চোখ অপলক হয়ে হিমু দত্তের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। বোকা হিমু দত্তের মুখের ভাষাকে যে কবির ভাষার মত মনে হয়! তেষ্টা পায়, এবং ছুটেও যায় হিমু দত্ত। কিন্তু বেশি দূর এগিয়ে যাবার সৌভাগ্য হয় না। তেষ্টার বেদনা বুকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে যায়, নইলে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

চারু ঘোষের মেয়ে তার নিজের মনটাকে বুঝতে চেষ্টা করে, এবং আশ্চর্যও হয়। হিমু দত্তের উপর আজ আর একটুও রাগ করতে পারছে না কেন

মনটা? যার উপকার সহ্য করতে করতে বিরক্ত হয়ে গিরিডি থেকে পাটনা পর্যন্ত সারাটা পথ বিশ্রীভাবে কেটেছিল, তারই কাছে আজ উপকার চাইতে ইচ্ছা করছে। হিমু দত্তকে খাটাতে ইচ্ছে করছে! এক গেলাস জল দিক, ব্যাগটা হাতে তুলে দিক। পরের স্টেশনে ট্রেন থামলেই যেন নিজে নেমে গিয়ে আর নিজের হাতে চাএর কাপ এনে যুথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় হিমু।

বোধহয় প্রায়শ্চিত্ত করছে যুথিকা ঘোষের সেদিনের অকারণ ক্ষোভে রাগে আর সন্দেহে অভিভূত মনটা। ভদ্রলোক একটু বেশি ভালমানুষ হয়েই বোধহয় জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ করেছে।

যুথিকা হঠাৎ বলে—আপনি তো সবারই উপকার করেন হিমাদ্রিবাবু।

হিমু হাসে—যদি কেউ ডাকে এবং যদি আমার সাধ্যি থাকে, তবে তাকে একটু সাহায্য করি, এই মাত্র।

যুথিকা হাসে—এই জন্যেই আপনার উপকারের দাম কেউ দিল না।

হিমু—দামই যদি পেলাম, তবে উপকার করা আর হলো কোথায়?

যুথিকা—আপনার এই বাতিকের কোন অর্থ হয় না।

হিমু—হ্যাঁ, আপনার বাবা তাই বলেছিলেন বটে।

চমকে ওঠে যুথিকা, যুথিকার চোখে একটা বেদনার ছায়াও দেখা যায়।

—বাবার কথা শুনে আপনি সেদিন বোধহয় খুব দুঃখিত হয়েছিলেন?

হিমু—হয়েছিলাম; কিন্তু তাতে কি আসে যায়!

যুথিকা উঠে দাঁড়ায়!—না, আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। মোট কথা…

হিমু—বলুন।

যুথিকা—আমি চা খেয়েই শুয়ে পড়বো। আর, আপনি…সাবধান…

হিমুর চোখের দৃষ্টিও কঠোর হয়ে ওঠে—কিসের সাবধান করছেন?

যুথিকা—আপনি আবার ঐ দরজার পাশের কোণটিতে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে, কাঠের উপর মাথা ঠুকে ঠুকে ঘুমোতে পারবেন না।

হিমুর চোখের কঠোর দৃষ্টিটা যেন হঠাৎ বিস্ময় আর লজ্জায় সব উত্তাপ হারিয়ে শান্ত হয়ে যায়। যুথিকা ঘোষের কাছ থেকে সমবেদনার মত অদ্ভুত একটা কোমল অনুভবের ধমক খেতে হবে, কল্পনা করতে পারেনি হিমু। নিজেরই রুক্ষ মেজাজের উপর রাগ হয়; এবং হাসতে চেষ্টা করে হিমু—সেদিন গাড়িতে একটুও জায়গা ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে…

যূথিকা—জায়গা থাকলেই বা কি? আপনি আমার কাছে থাকবেন। এখানেই বসে থাকবেন। নইলে—সত্যিই আমার ভয় করবে হিমাদ্রিবাবু।

হিমু—না না, ভয় কিসের? আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ুন।

কামরার আর এক প্রান্তের সীটের উপর বসে আছেন যে প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলা, তিনি অনেকক্ষণ ধরে যূথিকা ও হিমুর ভাষাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। সুতরাং, তাঁর চোখে একটা সন্দেহের দৃষ্টি জলজল করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

যূথিকার চোখ প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলার চোখের দিকে পড়তেই হিমুর গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে আর মুখের হাসিটা চাপা দিতে চেষ্টা ক'রে যূথিকা চাপা স্বরে ডাকে—হিমাদ্রিবাবু।

—কি?

—দেখছেন তো।

—কি দেখতে বলছেন?

—আস্তে কথা বলুন। সব শুনতে পাচ্ছেন ঐ মহিলা।

—কি শুনতে পেয়েছেন?

—আমাদের কথা।

—তাতে ক্ষতি কি?

—তাতে ভয় আছে।

—কিসের ভয়?

—উনি সন্দেহ করছেন।

—কি সন্দেহ?

—আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?

—না।

—উনি সন্দেহ করেছেন, আমরা বোধহয় স্বামী-স্ত্রী নই।

—বাজে সন্দেহ। লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করে হিমু, আর হাসতে থাকে।

যূথিকা হেসে হেসে ফিসফিস করে—আঃ, আপনি অকারণে বেচারার ওপর রাগ করছেন। আপনার ব্যবহার দেখে আপনাকে আমার দাদা বলেও কেউ মনে করবে না।

হিমু—সে তো সত্যি কথা।

যূথিকা—কোন আত্মীয় বলেও মনে করবে না।

হিমু—হ্যাঁ, তাই বা মনে করবে কেন ?

যুথিকা—স্বামী বলেও মনে করবে না।

হিমু—আপনিও বড় বাজে কথা বলতে পারেন।

যুথিকা—আমি বলতে চাই, আমাকে দেখে তো কেউ বিবাহিতা মেয়ে বলে মনে করতে পারে না।

হিমু—তা তো নিশ্চয়।

যুথিকা হাসে—তাই উনি বোধহয় ভাবছেন যে, একটা বেহায়া মেয়ে তার ছেলেবন্ধুর সাথে কোথায় যেন সরে পড়েছে।

হিমু হাসে—আপনি মিছিমিছি মহিলাকে সন্দেহ করছেন। উনি এসব কিছুই ভাবছেন না।

যুথিকা—আপনাকে ও আমাকে যদি দুই বন্ধু বলে উনি মনে করেন, তবে কি ভুল হবে ?

হিমু—না, সেটা মনে করা ভুল হবে কেন ?

একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। যুথিকা ব্যস্তভাবে বলে—চা, আমার চা কই হিমাদ্রি, হিমাদ্রিবাবু।

—দেখি, অন্তত চেষ্টা করে তো দেখি। বলতে বলতে কামরা থেকে নেমে যায় হিমু। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে থাকে যুথিকা। এবং মনে মনে একটা বিক্ষোভ আগে থেকেই তৈরি করে রাখে; যদি শুধু এক পেয়ালা চা নিয়ে আসে হিমু, তবে বেশ অভদ্রভাবে দুটো কড়া কথা হিমুকে শুনিয়ে দিতে হবে। এই তোমার আক্কেল ? তোমার চা কই ? বন্ধুত্বের সাধারণ একটা নিয়মও জান না ?

নিজের মনের এই কল্পনা নিয়ে মনে মনে হেসে রেগে কতক্ষণ নিজেকে মাতিয়ে রেখেছিল বুঝতে পারেনি যুথিকা। ট্রেনের ইঞ্জিনটা তীব্র একটা শিস দিয়ে রাত্রির বাতাস কাঁপিয়ে দিতেই চমকে ওঠে যুথিকা। আঃ, এক কাপ চা নিয়ে আসতে এত দেরী করছে কেন হিমাদ্রি ? সত্যিই তো নিজের হাতে চা-এর পেয়ালা বয়ে নিয়ে আসবার জন্য ওকে বলা হয়নি! একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে আনলেই হয়। আর, তারপর হিমাদ্রি যদি এখানে জানালার কাছে, প্ল্যাটফর্মের ঠিক এই জায়গাটিতে আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে চা-ওয়ালার হাত থেকে পেয়ালাটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে যুথিকার হাতের কাছে তুলে দেয়, এবং তারপর যদি নিজে এক পেয়ালা চা নিয়ে খেতে খেতে যুথিকার সঙ্গে গল্প করে, তা হলেই তো ওকে আর

নিছক একটা বাতিকের মানুষ বলে অভিযোগ করতে হয় না। তাহলে মেনে নিতে হবে, বন্ধুত্ব বুঝবার মত মন ওর আছে। এবং বুঝতেও পারা যাবে যে, খুব বোকাটি নয় হিমাদ্রি, বন্ধুত্ব করবার রীতি-নীতিও বেশ ভালই জানে।

ছুলে উঠলো ট্রেনটা, তারপরেই চলতে শুরু করলো।

কিন্তু হিমাদ্রি? কোথায় হিমাদ্রি? জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সারা স্টেশনের এদিকে আর ওদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে যূথিকা, হিমাদ্রি কোথাও নেই। লাফ ঝাঁপ দিয়ে কত যাত্রীই কত কামরার দরজায় উঠে পড়লো, কিন্তু প্ল্যাটফর্মের কোন প্রান্ত থেকে হিমাদ্রির মত দেখতে কোন ছায়ামূর্তি চলন্ত ট্রেনের এই কামরার দিকে ছুটে আসছে না।

—হিমাদ্রি! চেঁচিয়ে ডাক দেয় যূথিকা। যূথিকার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরের আহ্বান চলন্ত ট্রেনের চাকার শব্দে ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। প্ল্যাটফর্মের ল্যাম্পপোস্টগুলি চকিত ছবির মত যূথিকার চোখের উপরে একটা আতঙ্কের ধাঁধা রেখে দিয়ে তরতর ক'রে পার হয়ে যাচ্ছে। বেশ জোরে ছুটতে আরম্ভ করেছে ট্রেন।

—হিমাদ্রি! হিমাদ্রি! কামরার জানালা দিয়ে বাতাসে আর্তনাদ ছুঁড়তে ছুঁড়তে যূথিকার গলা ধরে যায়। নেতিয়ে পড়ে মাথাটা। আর চোখের কোণ দুটো তপ্ত হয়েই ভিজে যায়।

একি হলো? একটা তামাসা করতে গিয়ে, কে জানে কোন বিপদের মধ্যে হিমাদ্রিকে ফেলে দিয়ে চলন্ত ট্রেনটার সঙ্গে হুহু ক'রে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে যূথিকা ঘোষের জীবনটা!

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, নিশ্চয় কোন না কোন কামরায় উঠে পড়েছে হিমাদ্রি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না যূথিকা। নিশ্চয় মানুষটা স্টেশনেই কোথাও পড়ে আছে কিন্তু পড়ে রইল কেন?

একসঙ্গে মনের ভিতরে অনেক ভয় আর অনেক সন্দেহ ছটফট করতে থাকে। এবং জানালা দিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে, যেন কামরার আলোর চোখটাকে আড়াল করে নিজের চোখ দুটোকে অন্ধকারের গায়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে যূথিকা; কি ভয়ানক ঠাট্টা ক'রে মানুষকে জব্দ করতে পারে হিমাদ্রি।

কতক্ষণে আর একটা স্টেশন আসবে, আর ট্রেনটা থামবে? এবং

তারপরেও যদি দেখা যায় যে হিমাদ্রি এল না, তবে ? সত্যিই যদি অন্য কোন কামরাতে না উঠে থাকে হিমাদ্রি, তবে ?

তবে আর কি ? গিরিডি পর্যন্ত ট্রেনের ভিতরে সঙ্গীহীন কয়েকটা ঘণ্টার জীবন চুপ ক'রে সহ্য করতে হবে, এই মাত্র। ধমক দিয়ে আর রাগ ক'রে নিজেকে বুঝিয়ে দিয়েও বুঝতে পারে যূথিকা, এই কয়েকটা ঘণ্টার জীবনই যে অসহ্য হয়ে উঠবে। পাঁচটা মিনিটও মনের শান্তি নিয়ে বসে থাকা যাবে না। টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া আর স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা।

বাবা যখন প্রশ্ন করবেন, একলা এসেছিস মনে হচ্ছে, তখন বাবার মুখের উপর দু'কথা ভাল করে শুনিয়ে দেওয়া যাবে। হিমাদ্রিকে তোমাদের বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে যেদিন হিমাদ্রিকে ধরতে পারা যাবে, সেদিন কৈফিয়ৎ চাইতেও অসুবিধা হবে না,—এরকম একটা কাণ্ড করলে কেন হিমাদ্রি ? চা আনতে গিয়ে পালিয়ে গেলে কেন ?

কিন্তু হিমাদ্রির জন্য কেউ যদি এসে কৈফিয়ৎ দাবি করে, কই আমাদের হিমাদ্রিকে কোথায় ফেলে রেখে তুমি একলা হেসে হেসে গিরিডিতে ফিরে এলে মেয়ে, তবে ? তবে কি উত্তর দেবে যূথিকা ? যদি সিঁদুর দিয়ে রাঙানো সিঁথি নিয়ে, মাথার কাপড়টা একটু সরিয়ে নিয়ে, কুড়ি বছর বয়সের ঢলঢলে মুখটি তুলে কোন মেয়ে এসে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—কি গো চারু ঘোষের মেয়ে, ওকে কোথায় ফেলে রেখে এলে ? তুমি কি মনে করেছো ওর কেউ নেই ?

সত্যিই হিমাদ্রির এরকম কেউ আছে কি ? যদি থেকে থাকে, তবে সে যে তার চোখের দৃষ্টিকে জলন্ত শিখার মত কাঁপিয়ে আর কেঁদে কেঁদে যূথিকা ঘোষকে অভিশাপ দেবে।—তুমি একটা খেয়ালের তামাশা করে যে সর্বনাশ করলে, সে সর্বনাশ যেন তোমারও হয়।

জানালার উপর মাথা রেখে আর বন্ধ নিঃশ্বাসের একটা গুমোট বুকের মধ্যে নিয়ে বৃথা ঘুমোবার চেষ্টা করতে গিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনার মধ্যে ছটফট করতে থাকে যূথিকা। না মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে বলেই বোধহয় যত অদ্ভুত কল্পনা আর চিন্তা মাথা জুড়ে লাফালাফি করছে।

সোঁ সোঁ ক'রে হাওয়া কেটে যেন উড়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। ভয়ানক শব্দ। বোধহয় একটা নদীর পুল পার হয়ে চলে যাচ্ছে ট্রেন। যূথিকার মাথার উপর যেন ঠাণ্ডা হাওয়ার ফোয়ারা ছুটে এসে পড়ছে। ঘুম আসছে ঠিকই, ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

তারপর আর চেষ্টা করতে বা ইচ্ছে করতে হয় না। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে যুথিকা।

যুথিকার ঘুম কেউ ভাঙ্গায়নি। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়া যুথিকার কান দুটোর বধিরতার ঘোর তবু হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। শুনতে পায় যুথিকা ট্রেনের কামরাটা যেন কথা বলছে।

—তুমি ছিলে কোথায়? মেয়েটি এতক্ষণ কি ভয়ানক ছটফট করেছে। শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারা।

—চা তৈরী করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। তা ছাড়া চা-এর দোকানটাও তো প্ল্যাটফর্মের উপর নয়, বেশ একটু ভেতরের দিকে। হঠাৎ ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই দৌড়ে এসে শেষের দিকে একটা কামরায় উঠে পড়লাম।

—কি দরকার ছিল, সামান্য চা-এর জন্য এত দূরে যাবার?

—ভেবেছিলাম, তাড়াতাড়ি চা-টা পেয়ে যাব। কিন্তু···।

—তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

—গিরিডি।

—তোমার বাড়ি গিরিডি?

—না; ঠিক আমার বাড়ি গিরিডি নয়।

—শ্বশুরবাড়ি?

—না না, সে-সব কিছু নয়।

—তোমাদের বিয়ে বোধহয় বেশিদিন হয়নি।

—না না, সে-সব কিছু নয়, আপনি খুব ভুল বুঝেছেন।

চমকে চোখ মেলে তাকায় যুথিকা, এবং বুঝতে পারে ঐ প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলা হিমাদ্রির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে যে-কথা বলছিলেন, সেকথাই ঘুমন্ত যুথিকার স্বপ্নে ভাষা হয়ে কানের মধ্যে বেজেছে। যুথিকার পাশেই বসে আছে হিমাদ্রি। ট্রেনটা থেমে রয়েছে।

যুথিকা—ভ্রূকুটি ক'রে গম্ভীর হয়ে বলে—তুমি এরকম একটা কাণ্ড করলে কেন হিমাদ্রি?

হিমু—আপনি বিশ্বাস করুন যে···।

যুথিকা—বেশি আপনি আপনি করবে না। শুনতে বিশ্রী লাগে। তোমার বয়সের চেয়ে আমার বয়স কিছু কমই হবে।

হিমু—বেশ তো। বিশ্বাস কর; চা-ওয়ালা লোকটা সামান্য এক পেয়ালা চা তৈরী করতে এত দেরী ক'রে দিল যে ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

যূথিকা—যদি ট্রেনে উঠতে না পারতে, তবে ?

হিমু বিব্রতভাবে বলে—হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে খুবই বিপদে পড়তে হতো। তোমার বাবার কাছে আমাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হতো।

যূথিকা—তোমার কেউ একজন এসে যদি আমার কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করে বলতো, হিমাদ্রি কোথায় ? তবে কি হতো ? কি বলে তাকে আমি বোঝাতাম যে, আমার বিশেষ কিছু দোষ নেই ?

—আমার জন্ম উদ্বিগ্ন হয়ে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে কে ? কি বলছো তুমি ? হাসালে তুমি !

—কেউ নেই ?

—কেউ নেই ; তুমি কি জান না ?

—আমি জানবো কেমন করে ?

—গিরিডির সকলেই তো জানে।

—তা জানুক, আমি গিরিডির সকলেই মত নই। আমি কারও হাঁড়ির খবর জেনে বেড়াই না।

—যাই হোক ; বলতে গিয়ে হেসে ফেলে হিমু। আমার কৈফিয়ৎ তো শুনলে ; এইবার বিছানাটা পেতে দিই, কেমন ?

—না, থাক।

—কতক্ষণ জেগে বসে থাকবে ?

—যতক্ষণ পারি।

—না না, রাত জেগে কোন লাভ নেই।

—লাভ আছে।

—কি ?

—গল্প করতে পারা যাবে।

হিমু হাসে—আমার সঙ্গে গল্প করলে তোমার লাভ হবে না যূথিকা।

যূথিকার চোখ আবার গম্ভীর হয়।—তার মানে ?

হিমু হাসে—আমি সত্যিই গল্প টল্প জানি না, বলতেও পারি না যূথিকা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, যাদের আমি পড়াই, তারাও আমার উপর ভয়ানক রাগ করে, গল্প বলতে পারি না বলে। ভুলু একদিন বলেই ফেললো, মাস্টার মশাইটা কিচ্ছু জানে না।

যূথিকা—এই তো বেশ গল্প করতে পারছো।

পৌঢ়া বাঙালী মহিলা উপরের আলোটার দিকে একবার তাকিয়ে যেন

রাগের সুরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—কি যে কাণ্ড, ছিঃ ; ভগবান জানেন কি ব্যাপার !

মাথা হেঁট ক'রে মুখের হাসি লুকিয়ে এবং হাতটাকেও লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে দিয়ে হিমুর কামিজের পকেটটা ধরে টান দেয় যুথিকা। ফিস ফিস ক'রে বলে—শুনলে তো হিমাদ্রি, মহিলা কি বলছেন ?

হিমু—না, ঠিক শুনতে পাইনি।

যুথিকা—মহিলা একটা সমস্যায় পড়েছেন।

হিমু—কিসের সমস্যা ?

যুথিকা—উনি বুঝতে পারছেন না, কে কার সঙ্গে চলেছে। তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি, না আমার সঙ্গে তুমি যাচ্ছ।

হিমু হাসে—তোমার কাণ্ড দেখে মনে হতে পারে, তোমার সঙ্গেই আমি যাচ্ছি।

যুথিকা—তার মানে, মহিলা তোমাকে একটা অপদার্থ বলে মনে করেছেন।

হিমু—অনেকেই তো তাই মনে করে, মহিলাও তাই মনে করবেন, তার আর আশ্চর্য কি ?

যুথিকা—অনেকে মানে, কে কে ?

হিমু—তা কি আর মনে করে রেখেছি ? দেখেছি, অনেকেই তাই মনে করে।

যুথিকা—সেই অনেকের মধ্যে আমিও আছি বোধ হয় ?

হিমু—থাকলে দোষ কি ?

যুথিকা কটমট ক'রে হিমাদ্রির মুখের দিকে তাকায়—ওভাবে বেঁকিয়ে কথা বলো না। ঠিক ক'রে, স্পষ্ট ক'রে বল, তোমার কি ধারণা ? আমিও তোমাকে অপদার্থ বলে মনে করি ?

হিমু—বললাম তো, তাতে দোষের কি আছে ? মনে করলে অন্যায় কিছু হবে না।

কে বলে মাটির মানুষ ? বেশ তো ক্ষোভ অভিমান আর অভিযোগের টাটকা রক্তমাংস দিয়ে তৈরি বেশ গভীর বুদ্ধির মানুষ ! খুব বুঝতে পারে, খুব দেখতে পায়, আর কিছুই ভুলে যায় না ; কি ভয়ানক নিখুঁত হিমাদ্রির মাটির মানুষের ছদ্মবেশটা ! ইচ্ছে করলে, ওর মুখের ঐ বোকা-বোকা হাসিটাকেই ঝিক করে একটা বিদ্যুতের আলায় জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষের মুখের

দিকে বেশ তো তাকাতে পারে হিমাদ্রি। মানুষের মনের কোমলতার উপর বেশ আঘাত দিয়ে কথা বলতে পারে। যুথিকা ঘোষের মনের সব কৌতুক আর কৌতুহলের দুঃসাহস চমৎকার একটি নিষ্ঠুর বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত ক'রে দিয়ে এখন কেমন নির্বিকার মনে নস্যির ডিবে ঠুকছে হিমাদ্রি।

যুথিকা বলে—আমিও তোমাকে এরকম একটা শক্ত কথা বলতে পারি।

হিমু হাসে—একটা কেন, অনেক বলতে পার।

যুথিকা—মিথ্যে অভিযোগের কথা নয়। সত্যি অভিযোগ।

হিমু হাসে—তোমাকে সময় মত এক পেয়ালা চা এনে দিতে পারিনি, এছাড়া আমার বিরুদ্ধে বোধহয় আর কোন অভিযোগ খুঁজে পাবে না।

যুথিকা—খুঁজে পেয়েছি।

হিমু—কি?

যুথিকা—তুমি আমাকে একটা অহঙ্কেরে মেয়ে বলে মনে কর।

হিমু হাসে—তা মনে করি, কিন্তু সেজন্য রাগ করি না নিশ্চয়।

যুথিকা—রাগ করবে কেন? তুমি যে ভয়ানক চালাক। মানুষকে ছোট ভাবতে তোমার বেশ মজা লাগে। আর।···

আনমনার মত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে যুথিকা। তারপরে গলার স্বরের একটা রুক্ষ তীব্রতাকে যেন কোনমতে চেপে রেখে আস্তে আস্তে বলে—তাই পরের উপকার ক'রে বেড়াও। ওটা মোটেই তোমার বাতিক নয়। ওটা তোমার ভয়ানক একটা অহঙ্কার। মানুষ নিজেকে কত ছোট ক'রে ফেলতে পারে, তাই দেখে মনে মনে মজা করবার জন্য অকারণ পরের উপকার করে বেড়াচ্ছ। গিরিডির কেউ তোমাকে বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমি বুঝেছি।

হিমু—তুমি যে আমাকে আমার চেয়েও বেশি বুঝে ফেলেছো মনে হচ্ছে।

যুথিকা—আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি নিজেই জাননা যে তুমি—

হিমু—বলেই ফেলো।

যুথিকা—তুমি কি ভয়ানক চালাক আর অহঙ্কারী!

এক টিপ নস্যি নিয়ে হিমু আবার হেসে ওঠে—বেশ, অনেক গল্প তো হলো।

যুথিকা হাসে—এবার ভয়ানক খিদে পেয়েছে!

হিমু—তোমার সঙ্গে খাবার আছে নিশ্চয়?

যুথিকা—আছে; কিন্তু সে খাবার খাব না।

হিমু—কেন?

যুথিকা—কোন স্টেশনে ট্রেনটা থামুক। খাবারওয়ালার কাছ থেকে পুরি তরকারী কিনে খাবো।

হিমু—না! খবরদার না।

যুথিকা—তুমি বাধা দেবার কে?

হিমু—আমার বাধা না শুনলে কোন লাভ হবে না।

যুথিকা—তার মানে?

হিমু...আমি তোমার সঙ্গের লুচি সন্দেশ খেতে রাজি হব না।

চমকে ওঠে যুথিকা। এবং মনে মনে সারা গিরিডির একটা অসার ধারণার আনন্দকে ধিক্কার দেয়। হিমু দত্তকে চিনতে বুঝতে আর ধরতে পারেনি কেউ। ওর বুকের প্রত্যেক নিঃশ্বাস ওর উদাস আনমনা ভালমানুষী চোখের প্রত্যেকটা দৃষ্টি যে চরম চালাকির লীলাখেলা। যুথিকা ঘোষের মনের গভীরের এত গোপন ইচ্ছাটাকেও কত সহজে দেখে ফেলেছে হিমাদ্রি।

সত্যি কথা; হিমাদ্রিকে লুচি-সন্দেশ খাওয়াবার একটা ছুতো খুঁজছিল যুথিকা। কিন্তু সন্দেহ ছিল যুথিকার মনে, বাতিকের মানুষ হিমাদ্রি যুথিকার খাবারের ঝুড়ির লুচি-সন্দেশ স্পর্শ করতে রাজি হবে না। হিমুর সেই অনিচ্ছাকে জয় করবার জন্য কি কথা বলতে হবে, তা'ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যুথিকা। কিন্তু তুমি না খেলে আমিও লুচি সন্দেশ খাব না, একথা বলবার সুযোগও পেল না যুথিকা। ধূর্ত হিমু দত্ত মানুষের মনের একটা সদিচ্ছাকে, একটা সৌজন্যের আগ্রহকেও কি-ভয়ানক আঘাত দিয়ে ব্যথা দিতে জানে।

কিন্তু হিমাদ্রির বুদ্ধির কাছে কি হার মানবে চারু ঘোষের মেয়ে যুথিকা ঘোষ?

যুথিকা বলে—তুমি যদি সত্যিই বাধা দিয়ে আমাকে পুরি-তরকারী খেতে না দাও, তবে মনে রেখ, আমার খাওয়াই হবে না।

হিমু—কেন? তোমার সঙ্গেই তো ভাল খাবার আছে।

যুথিকা—হ্যাঁ আছে। তেমনই থাকবে!

হিমু—তার মানে?

যুথিকা—তার মানে, তুমি যদি সেবারের গ্লানির সময় আমার একটা ভুলের কথা ভুলতে না পেরে শুধু একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায়...

হিমু হাসে—তুমিও তো মানুষের ভুলের খুঁটিনাটি ধরতে কম যাও না! যাও আমি তর্ক করতে চাই না।

তর্ক ছেড়ে দিয়ে যূথিকাও হাসে, এবং সে হাসির মধ্যে বোধহয় বিজয়িনীর মনের মত একটা সুখী মনের গর্বও হাসে—খাবার খাওয়ার পালা একটু পরে শুরু হলেই ভাল হয়; এখন গল্পের পালা থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কি বল হিমাদ্রি ?

হেসে হেসে গল্প করবার আনন্দও অবান্তর কোন প্রশ্নের আঘাতে এলোমেলো হয়ে যায় না। কথায় কথায় শুধু একটি প্রশ্নকে কয়েকবার টেনে নিয়ে এসে শেষে শান্ত হয়ে যায় যূথিকা।

—তোমার কেউ নেই, এটা কি একটা কথা হলো ? এ কথার কোন মানে হয় না হিমাদ্রি।

হিমু—মানে হোক বা না হোক, কথাটা সত্যি।

যূথিকা—তুমি আমার কথাটাই বুঝতে পারনি।

আশ্চর্য হয় হিমু। না বোঝবার কি আছে ? অনেক কথাই তো জিজ্ঞাসা করেছে যূথিকা, যে-কথা হিমুর গিরিডি-জীবনের এক বছরের মধ্যে কোন মানুষ হিমুকে জিজ্ঞাসা করেনি। যূথিকার ছোট ছোট এক একটা সরল প্রশ্নের উত্তরে হিমুও সরল ভাষায় উত্তর দিয়ে দিতে পেরেছে; হ্যাঁ, বাবা-মা দুজনের কেউ এখন আর বেঁচে নেই। দেশের বাড়ি অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ভাই-বোন কেউ নেই; চাকরির চেষ্টা করতে করতে সেই ডিব্রুগড় থেকে হঠাৎ এই গিরিডিতে এসে পড়া, এই তো ব্যাপার। দেখা যাক, আবার কোন্‌দিকে ভেসে পড়তে হয়।

যূথিকা হেসে ফেলে—সব বলেও একটি কথা বোধহয় বলতে পারলে না হিমাদ্রি। বোধহয় বলতে তোমার লজ্জা করছে।

হিমু—আর কি বলবো বুঝতে পারছি না।

যূথিকা—এমন কেউ একজন তো থাকতে পারে, যে তোমাকে ভেসে পড়তে দিতে চায় না; ধরে রাখতে চায় ?

হিমু—তার মানে ?

যূথিকা—বিয়ে করনি ?

হিমু হো হো করে হেসে ওঠে।—এত কথা শোনার পর তোমার মনে এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন দেখা দিল, কি আশ্চর্য !

যূথিকা—বুঝলাম, বিয়ে করনি। কিন্তু…কিন্তু তাতেও প্রমাণ হয় না যে, তোমার কেউ নেই।

হিমু বিরক্ত হয়ে বলে—না নেই। আমি পাগল নই, আমার ওসব অদ্ভুত শখ থাকতে পারে না।

যুথিকাও যেন অদ্ভুত এক জেদের আবেগে আরও জোর দিয়ে বলে—তুমি পাগল নাই বা হলে, কিন্তু গিরিডিতে অন্তত একটা পাগল মেয়ে তো থাকতে পারে; তোমার অদ্ভুত শখ না থাক, অন্য কারও তো থাকতে পারে। সে তোমাকে ভেসে পড়তে দিতে রাজি হবে কেন?

হিমু—না, এরকমও কেউ নেই।

যুথিকা—কেন নেই?

হেসে ফেলে হিমু—ঠাট্টা করবার আর গল্প করবার কিছু না থাকলেও এসব কথা বলতে হয় না।

যুথিকা—তোমাকে যদি ভয় করতাম, তবে নিশ্চয়ই এসব কথা জিজ্ঞাসা করতাম না।

যুথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় হিমু। ভয় করে না যুথিকা, কিন্তু ভয় করে না বলেই কি এত ঠাট্টা করতে হয়? চারু ঘোষের মেয়ের মাথার মধ্যে একরকমের পাগলামির পোকা আছে বোধহয়।

কিন্তু মনটাকে এত গম্ভীর রেখেও বুঝতে পারে হিমু দত্ত, যুথিকার প্রশ্নগুলি যেন হিমু দত্তের জীবনের উপর মানুষের মায়ার প্রথম অভিনন্দন। যেকথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি, সে-কথা জিজ্ঞাসা করেছে চারু ঘোষেরই অহঙ্কারী মেয়ে; আপন বলতে কেউ আছে কিনা হিমু দত্তের। আর কটা কথা মনে পড়ে, এই তো সেই যুথিকা ঘোষ; যে মেয়ে হিমাদ্রিবাবু বলে প্রথম ডেকেছিল। সে ডাকের পিছনে একটা ঠাট্টা ছিল নিশ্চয়; কিন্তু তবু তো ডেকেছিল। এবং শুনতে খারাপও লাগেনি।

কি-যেন বলেছে যুথিকা। বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে হিমু—কি বললে?

যুথিকা—তোমাকে বন্ধু বলে ভাবতে সত্যিই আর ভয় করে না।

হিমুর গম্ভীর মুখ যেন হঠাৎ ভয়ের চমক লেগে কেঁপে ওঠে।—বন্ধু?

যুথিকা—হ্যাঁ। তোমাকে কি একটা পূজনীয় গুরুজন বলে মনে করবো ভেবেছ?

হিমু হেসে ফেলে—কিন্তু ভয় করবার কথা বলছো কেন?

যুথিকা—ভয় করে না বলছি।

হিমু—কেন?

যুথিকা খিল-খিল করে হেসে ওঠে—তোমার মত একটা একলা অপদার্থ মানুষকে ভয় করবো কেন ?

আস্তে একবার চমকে ওঠে হিমু, তারপরেই অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

অনেক রাত হয়েছে। আর বেশি গল্প করলে রাতটা যে চোখের উপরেই ভোর হয়ে যাবে।

হিমু বলে—তুমি এইবার শুয়ে পড় যুথিকা।

যুথিকা শান্তভাবে বলে—হ্যাঁ।

বাঙ্কের উপর থেকে বেডিংটা টেনে নামিয়ে সীটের উপর পেতে দেয় হিমু।

যুথিকা বলে—তুমি এই সতরঞ্চিটা ঐ সীটের উপর পেতে ঘুমিয়ে পড় লক্ষীটি। সেবারের মত দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে সারাটা পথ কষ্ট ক'রে…

হিমু বলে—না না, কষ্ট করবো কেন ? সেবার কামরাতে জায়গাই ছিল না ; তাই বাধ্য হয়ে…

যুথিকা—আর একটা কথা।

হিমু—কি ?

যুথিকা আস্তে আস্তে বলে—তুমি আমার গায়ের উপর চাদর-টাদর মেলে দিতে চেষ্টা করো না। কেমন ?

হিমু—আচ্ছা।

যুথিকা—কিছু মনে করলে না তো ?

হিমু—না।

যুথিকা—মহিলা হয়তো একটা বাজে সন্দেহ করে বসবেন, সেই জন্যেই বলছি।

হিমু—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

এ কি অদ্ভুত কথা বলছে দিদি ! বাবা শুনলে যে রাগ করবে। আর মা নিশ্চয় আরও রাগ করে শেষে ধমক দেবে, না, এরকম বিশ্রীভাবে বেড়াতে যাবার কোন মানে হয় না।

যুথিকার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে দুই ভাই, বীরু আর নীরু। একবার বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে আসতে চায় দিদি ; বীরু আর নীরুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু ঠিক কোথায় যে বেড়াতে যেতে চায়, সেটা ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারছে না দিদি। উশ্রীর দিকে নয় ; বরাকরের দিকে নয় ; বেনিয়াডি

কোলিয়ারি যাবার সড়কের দিকে, যেখানে মাঠের উপর অনেক পলাশের শাখা লাল ফুলে রঙীন হয়ে রয়েছে, সেদিকেও নয়। তবে কোথায়? কোন্ দিকে?

যুথিকা বলে—ওসবই তো দেখা, তার চেয়ে বরং…

বীরু—মহেশমুণ্ডার দিকে?

যুথিকা—না; অতদূরে নয়।

নীরু—তবে কি পরেশনাথের দিকে?

যুথিকা—না; পায়ে হেঁটে কি অতদূরে বেড়াতে যাওয়া যায়?

বীরু আর নীরু একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—পায়ে হেঁটে?

যুথিকা—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? এত বড় বড় চোখ করে আশ্চর্য হবার কি আছে?

উদাসীন নামে এত বড় বাড়ির আত্মাটাও বোধহয় চমকে উঠেছে। বেড়াতে যেতে চায় যুথিকা। কিন্তু এত সুন্দর জায়গা থাকতে ঐ শ্রীহীন শহরের ভিতরে একটু ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে আসতে চায়। তাও আবার গাড়িতে নয়, শুধু পায়ে হেঁটে। তা ছাড়া এমন একটা অসময়ে।

শহরের দিকে, যে-দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে জগতের যত ধুলো-ময়লার ভিড়, যত বাজে মানুষের ছুটোছুটি আর সোরগোল, যত দীনতা আর হীনতার ছায়াও পথের উপর আর দু'পাশে ছড়িয়ে আছে। শর্মা ব্রাদার্সের অমন সুন্দর ভ্যারাইটি স্টোর্সের কাছে যেতে হলেও অনেক বাজে মানুষের ভিড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে যেতে হয়। গাড়ি ছাড়া কোনদিনও পায়ে হেঁটে শহরের কোন দোকানে আসেনি চারু ঘোষের ছেলে-মেয়ে।

কিন্তু যুথিকা যে-কথা বলছে, সেটা দোকানে-টোকানে যাবার পরিকল্পনাও নয়। কোন পথের জিনিস কেনবার কথাও ওঠেনি। শুধু শহরের ভিতরেই এদিকে-ওদিকে একবার ঘুরে আসতে চায় যুথিকা। বাজারের দিকে, চকের দিকে, স্টেশনের দিকে। বিনা দরকারের শহরের যে-সব পথে ঘুরে বেড়াবার কোন অর্থ হয় না, সেই সব পথেই বেড়িয়ে আসবার জন্য অদ্ভুত এক ইচ্ছার খেয়ালে যেন দুরন্ত হয়ে উঠেছে যুথিকা ঘোষের মন।

ভয় পায় নীরু।—কিন্তু রাস্তায় যে ভিখারী আছে দিদি; নোংরা খেঁকি কুকুরও আছে।

যুথিকা হাসে—থাকুক না; ভয় কিসের?

দিদির সাহসের হাসি দেখে আশ্বস্ত হয় নীরু।

এবং, তারপর আর দেরি হয় না। চারু ঘোষের মেয়ে যুথিকা ঘোষ, সঙ্গে

চারু ঘোষেরই দুই ছেলে বীরু আর নীরু, যখন উদাসীনের ফটক পার হয়ে সড়কের ধুলো মাড়িয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন উদাসীনের মালীটাও একটু আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

মাত্র বিকেল হয়েছে। আদালত থেকে চারু ঘোষের বাড়ি ফিরতে এখনও বেশ দেরি আছে; এবং চারু ঘোষের স্ত্রীও এখন ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী তিন ঘণ্টার রেস্ট নেবার জন্য উপর-তলার একটি ঘরে নীরবতার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে আছেন।

এত রোদ! এখন যে ঠিক বেড়াতে যাবার সময়ও নয় কিন্তু যূথিকা ঘোষের প্রাণটা যেন উদাসীনের জীবনের এতদিনের নিয়মের শাসন ভঙ্গ করবার কৌতুকে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। বীরু আর নীরুকে হেসে হেসে অশ্বাস দেয় যূথিকা—না না; বাবা কিছু বলবে না বীরু। মাও বলবে না নীরু। দেখো, আমার কথা সত্যি হয় কিনা।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর, যূথিকা ঘোষের প্রাণের এই দুরন্ত অবাধ্যতার আনন্দ যে মুখর হয়ে হেসে ওঠে। বীরু আর নীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলে—যদি একটু বকুনি খেতে হয় তো খাব।

যূথিকার সাজটাও বেড়াতে যাবার মত সাজ নয়। বীরু বলে—তোমাকে বড় অভদ্র দেখাচ্ছে দিদি।

—কেন? চমকে ওঠে যূথিকা।

নীরু বলে—বিচ্ছিরি ড্রেস করেছো, একেবারে গরীব লোকের মত।

ঠিক কথাই বলেছে বীরু আর নীরু। যূথিকা ঘোষের পায়ে এক জোড়া চটি, আর গায়ে এলোমেলো করে পরা একটি রঙিন ছাপাশাড়ি ও ছিটের ব্লাউজ। খোঁপা নয়, বিনুনিও নয়, সাবান-ঘষা মাথার চুল এতক্ষণে শুকিয়ে আর রুক্ষ হয়ে ফেঁপে উঠেছে। স্নানের পর ঘাড়ে আর গলায় যে সামান্য একটু পাউডার ছড়ানো হয়েছিল, সে পাউডারের কোন চিহ্নও এখন আর নেই। স্নানের সময় গলার হার আর কানের দুলও খুলে রাখা হয়েছিল। সেগুলিও আর পরা হয়নি। আয়নার দেরাজের মধ্যেই সেগুলি পড়ে আছে।

চেহারাটা অভদ্রের মত দেখাচ্ছে, গরীবের মত দেখাচ্ছে, কিন্তু খারাপ দেখাচ্ছে কি? প্রশ্নটা হয়তো মুখ খুলে বলেই ফেলতো যূথিকা ঘোষ, আর বীরু ও নীরুর চোখের বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলতে পারতো যূথিকা, একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না নিশ্চয়।

কিন্তু প্রশ্ন করতে হয় না; কারণ বীরুই হঠাৎ যূথিকার মুখের দিকে

তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে একটা ছেলেমানুষী আনন্দের কথা বলে ফেলে—তোমার গায়ে অনেক রক্ত আছে দিদি।

—কি করে জানলে ?

—তোমার মুখটা কি চমৎকার লাল হয়ে উঠেছে ?

হাসতে গিয়ে আরও লাল হয়ে ওঠে যুথিকার মুখ। তবে আর সন্দেহ নেই ; উদাসীনের মেয়ের মুখ পথের রোদের ছোঁয়ায় একটুও অসুন্দর হয়ে যায়নি ; একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না যুথিকাকে। বরং বীরুর চোখের এই বিস্ময় লক্ষ্য করবার পর বিশ্বাস করতে হয়, যুথিকার এই সাজহীন মূর্তিটা নতুন রকমের একটা প্রাণের আভায় রঙীন হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

যুথিকা জানে না, বীরু আর নীরুও জানতে পারে না, কিসের জন্য আর কি দেখবার জন্য পথের এত ভিড় পার হয়ে, এত সোরগোল শুনতে শুনতে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। কোন কাজ নেই, দরকার নেই কোথাও থামবার আর ফিরোবার কথা নেই, শুধু শহরের ভিতর এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরে বেড়ানো, এই মাত্র।

ঘুরে বেড়াতে একটুও খারাপ লাগে না। লোহার পুলটা পার হবার সময় ট্রেনছাড়া একটা একলা ইঞ্জিন ভয়ানক চীৎকার করে আর ঘন কালো ধোঁয়ার স্তবক ধমকে ধমকে উড়িয়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে উদাসীনের দিদি আর দুই ভাই। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে মোটা মোটা কয়লার গুঁড়ো যুথিকার রুক্ষ চুলের উপর ঝড়ে পড়ে।

ছুটন্ত ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে বীরু আর নীরু। তারপর যুথিকার চুলের উপর কয়লার গুঁড়োর ছড়াছড়ি দেখে আরও জোরে হাততালি দেয়।

যুথিকা বলে—দুষ্টুমি করো না ; ছিঃ—আচ্ছা, এইবার চল, একবার চকের কাছে গিয়ে···তারপর একবার স্টেশনের দিকটা ঘুরে এসে, তারপর ··

বিচিত্র এক উদ্‌ভ্রান্তির অভিযান ! এগিয়ে যেতে থাকে যুথিকা, বীরু আর নীরু। চকের দোকানগুলিতে যেমন ভিড় তেমনই হৈ-হৈ। কত মানুষ আসছে আর যাচ্ছে, কত ব্যস্ততা। কত কথা বলছে, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করছে, আবার ঝগড়াও করছে মানুষগুলি। গাড়িতে করে এই চক কতবার পার হয়ে গেছে যুথিকা, কিন্তু কোনদিন ভীড়ের মুখগুলির দিকে তাকাবার কোন দরকার হয়নি। তাকাতে ইচ্ছেও করেনি।

কিন্তু আজ বারবার তাকাতে ইচ্ছে করে। দরকারের মানুষগুলি আসছে

যাচ্ছে আর ভিড় করে থমকে রয়েছে, দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু···কি আশ্চর্য, একটা চেনা মুখ এখন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না। পথের ভিড়গুলি যেন একটা নিরেট অচেনা জগতের কতগুলি হাসাহাসির, মুখরতার আর ব্যস্ততার ভিড়।

মাঝে মাঝে এক-একবার চমকেও ওঠে যুথিকা ঘোষের খেয়ালের চোখ। ঠিক হিমাদ্রির মত নীলরঙের কামিজ গায়ে, এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে একটা ফলের দোকানের ভিড়ের সঙ্গে মিশে রয়েছেন। আশ্চর্য, হিমাদ্রি নয় তো? কিন্তু আশ্চর্য হবার কি আছে? চকের এই সব দোকানে এসে যদি এত মানুষের ভিড় করবার দরকার থাকে, তবে হিমাদ্রিই বা আসবে না কেন?

না হিমাদ্রি নয়। নীলরঙের কামিজ বটে, কিন্তু আস্তিন দুটো গোটানো নয়। আর পায়ে এক জোড়া নাগরা, সাদা রবারের জুতো নয়।

স্টেশনের কাছে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে আর পথের ভিড়ের অনেক মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে যায় যুথিকা ঘোষের এই বিচিত্র উদ্‌ভ্রান্তির অভিযান। নীলরঙের কামিজ, আস্তিন দুটো গোটানো, আর পায়ে সাদা রবারের জুতো, এমন কোন মূর্তি শহরের এত ভিড়ের কোন ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল না!

বীরু বলে—এবার কোন্ দিকে যাবে দিদি?

যুথিকা বলে—আর কোন দিকে না।

নীরু—কেন দিদি?

যুথিকা—সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

বীরু—তাতে কি হয়েছে?

যুথিকা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—কারও মুখ স্পষ্ট করে যে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে চিনতে পারা যাবে না।

নীরু ভয়ে ভয়ে বলে—তবে এবার বাড়ি ফিরে চল দিদি।

যুথিকা বলে—হ্যাঁ, চল।

ফটক পার হয়ে উদাসীনের বারান্দার উপর দাঁড়াতেই বুঝতে পারে যুথিকা, হ্যাঁ, বকুনি খেতে হবে। বীরু আর নীরুও বুঝতে পারে বোধহয়, তা না হলে ওরা দু'জনে ওভাবে যুথিকার এলোমেলো চেহারাটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করে কেন?

অনেকক্ষণ হলো আদালত থেকে ফিরেছেন চারু ঘোষ। অনেকক্ষণ হলো বিশ্রামের ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন চারু ঘোষের স্ত্রী কুসুম ঘোষ। অনেক

ডাকাডাকি করেও উদাসীনের ছেলে মেয়ের কোন সাড়া না পেয়ে অনেক আতংক অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছেন। তারপর মালীর কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু মনের রাগটাকে শান্ত করতে পারেননি। বলা নেই কওয়া নেই, অনুমতি না নিয়ে, একটা জানান না দিয়ে বাচ্চা ভাই দুটোকেও সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে কোথায় গেল বাইশ বছর বয়সের কাণ্ডজ্ঞানহীন ধিঙ্গি? গনেশবাবুর স্ত্রীর মত নিন্দুকের চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই। এক বেলার মধ্যেই বোধহয় সারা গিরিডির সব পাড়া ঘুরে দুর্নাম রটিয়ে দেবে, কিপ্‌টে চারু ঘোষ শুধু নিজে একাই গাড়ি চড়ে; ছেলেমেয়েগুলো পায়ে হেঁটে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়।

কি আশ্চর্য, ভেবে কেনে কারণই ঠাহর করতে পারেন না চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ; উদাসীনের সুশ্রী জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েও আর এত বড় হয়ে ওঠবার পরেও যুথিকার মত মেয়ের মনে আবার এ কোন্ রকমের অপরুচির অনাচার? গাড়ি ছাড়া কোনদিন বেড়াতে বের হয়েছে যুথিকা, এমন ঘটনা স্মরণ করতে পারেন না কুসুম ঘোষ; কারণ এমন ঘটনা কোনদিনই ঘটেনি। তবে আজ হঠাৎ এমন অধঃপতনের ধুলো পায়ে গায়ে আর মাথায় মাখবার জন্ত এ কেমন নোংরা শখের খেলা খেলে এল মেয়েটা? কেন, কিসের জন্ত, কোথায় কোথায় গিয়েছিল যুথিকা? কার সঙ্গে কথা বলে এল?

সন্দেহ করেন কুসুম ঘোষ, নিশ্চয় একটা কাণ্ড করে এসেছে যুথিকা। তা না হলে, না বলে-কয়ে একটা চুপি-চুপি চেষ্টার মত বাইরে বের হয়ে গেল কেন? বিশ্রী কাণ্ড করতে হলে যে ঠিক এই ধরনের চুপি-চুপি চেষ্টা করতে হয়। কুসুম ঘোষের জেঠতুতো দাদা, আই-সি-এস মোহনদার বউ বর্ণালীর কথা মনে পড়ে। চাল-চলনে প্রায় মেমসাহেব হয়ে গিয়েছে যে বর্ণালী বউদি; একশো টাকা মাইনের মগ কুকের হাতের রান্না যত রোস্ট গ্রিল আর ফ্রাই ছাড়া যার মুখে কোন বাংলা রান্না রোচে না; সেই বর্ণালী বউদি লুকিয়ে লুকিয়ে চাপরাশিকে দিয়ে বাজারের তেলেভাজা বেগুনি আনিয়ে আর ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত।

যুথিকার কাণ্ডটা প্রায় এই রকমের একটা চুপি-চুপি সেরে আসা নোংরা শখের কাণ্ড। যুথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ধমক দেন কুসুম ঘোষ—ছিঃ!

যুথিকা হাসে—কি হলো মা?

—হঠাৎ এরকম একটা কাণ্ড করবার মানে কি?

যুথিকা—শহরের ভেতরে একটু এদিক ওদিক বেড়িয়ে এলাম।

—কেন ? কারণ কি ?

যূথিকা হাসে—এমনি ; কোন কারণ নেই।

—তার মানে পাগলামিতে পেয়েছিল ?

চারুবাবু বলেন—যাক্ গে ; আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কুসুম ঘোষ চুপ করেন ; এবং চারুবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বলেন—মোট কথা, তোমার কাণ্ড দেখে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি যূথিকা। আমাদের প্রেস্টিজের দিকে চোখ রেখে কাজ করবে। উদাসীনের মেয়ে উদাসীনের কালচার ভুলে যাবে কেন ?

উদাসীনের কালচারের উপর আবার একটা উপদ্রব। এই উপদ্রবও উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষের একটা খেয়ালের কাণ্ড। এবং এই খেয়ালটাও একটা নোংরা শখের খেয়াল। খুব দুঃখিত হলেন চারু ঘোষ, এবং খুব রাগ করলেন কুসুম ঘোষ।

দিনটা ছিল যূথিকা ঘোষেরই জন্মদিনের উৎসবের দিন।

সেদিন আদালতে যাননি চারু ঘোষ। সেদিন স্কুলে যায়নি বীরু আর মীরু। সেদিন শহরে গিয়ে শর্মা ব্রাদার্সের ভ্যারাইটি স্টোর থেকে যূথিকার জন্য দু'শো টাকা দিয়ে একগাদা ফরাসী পারফিউমারির সৌরভ-সামগ্রী আর প্রসাধনের উপচার কিনে এনেছেন চারু ঘোষ। দশ শিশি সেণ্ট, পাস্তুরাইজ্‌ড ফেস ক্রীম, অল-টোন শ্যাম্পু, স্কিন টনিক লোশন, ওয়াটারপ্রুফ মাসকারা আর বিউটি গ্রেন।

সকাল আটটা থেকে সুরু করে বেলা বারটা পর্যন্ত অনেক স্নেহময় আগ্রহ উৎসাহ আর যত্ন নিয়ে কুসুম ঘোষ রান্না করেছেন মিষ্টি পোলাও, রুই মাছের ক্রোকে, মাংসের দম্পক্ত, নারকেল-চিংড়ি আর ছানার পায়েস।

তখনো টেবিলে খাবার সাজানো হয়নি ; আর চারু ঘোষের স্নান সারাও বাকি ছিল। কিন্তু উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষ ওর সেই সুরভিত আর প্রসাধিত সুন্দর চেহারাটাকে নিয়ে ঝলমলে শাড়ির আভা ছড়িয়ে দুলিয়ে আর ছুটিয়ে বারবার যেন একটা পেটুকে লোভের আবেগে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে কুসুম ঘোষকে বিরক্ত করতে থাকে।—রান্না শেষ হলো কি মা ?

কুসুম ঘোষ হাসেন—হাঁ রে লোভী মেয়ে। শেষ হয়ে এসেছে, শুধু জলপাই-এর চাটনিটা বাকি।

জলপাই-এর চাটনি রাঁধতে এমন কি আর সময় লাগে ? পনর মিনিট পার হতে না হতে আবার ছুটে আসে যূথিকা।—হলো চাটনি ?

কুসুম ঘোষ হাসেন—হ্যাঁ। এবার ওকে স্নান সেরে নিতে বল।

যুথিকা—বলছি হ্যাঁ…একটা কথা!

—কি!

যুথিকা—তিনটে থালাতে খাওয়ার সাজিয়ে দাও তো।

কুসুম ঘোষ আশ্চর্য হন—তিনটে থালাতে?

যুথিকা—হ্যাঁ।

—কিসের খাবার?

যুথিকা—এই যে, এইসব পোলাও টোলাও …সবই কিছু কিছু করে তিনটে থালাতে সাজিয়ে দাও।

কুসুম ঘোষের চোখে এইবার একটা ভ্রুকুটি ফুটে ওঠে—কার জন্যে?

যুথিকা—গিরধারীর জন্যে, জানকীরামের জন্যে আর সোমরার জন্যে?

—কি বললি? কুসুম ঘোষ যেন একটা আর্তনাদ করে তাঁর যন্ত্রণাক্ত বিস্ময়টাকে সামলাতে চেষ্টা করেন।

ড্রাইভার গিরধারী, চাকর জানকীরাম আর মালী সোমরার জন্য তিনটে থালাতে এইসব আভিজাতিক খাবার নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে হবে, যুথিকা যেন কুসুম ঘোষের হাত দুটোকে একটা অভিশাপ সহ্য করতে বলছে। বলতে একটুও লজ্জা পেল না যুথিকা? একটুও ভেবে দেখলো না, কি অদ্ভুত কথা বলছে? ভুলে গেল মেয়েটা, এরকম নোংরা কাণ্ড যে এই উদাসীনের পঁচিশ বছরের জীবনে কোনদিন সম্ভব হয়নি। কুসুম ঘোষ বলেন—না; তোমার বাজে খেয়াল বন্ধ কর যুথি।

যুথিকাই এইবার আশ্চর্য হয়—আমার জন্মদিনে আমরা সবাই পোলাও টোলাও খাব, আর ও বেচারারা বাড়িতে থেকেও খাবে না?

—না।

যুথিকা নাক সিঁটকে বিড়বিড় করে—কি বিশ্রী ব্যাপার!

—বিশ্রী হয়ে গিয়েছে তোর বুদ্ধিশুদ্ধি।

—যাগগে। আবার নাক সিঁটকে নিয়ে গম্ভীর হয়ে, আর ছটফট করে চলে যায় যুথিকা।

কুসুম ঘোষের সন্দেহ হয় এবং দু'চোখের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকেন, কেমন যেন একটা আধপাগলা রকমের মুখ করে ধেই ধেই ক'রে চলে গেল মেয়েটা। মেয়েটার ব্যবহারের রকম-সকম, কথা বলবার ঢং, চোখের চাউনি, হাঁটা-চলা আর বুদ্ধি আর রুচি ইচ্ছে টিচ্ছে সবই যেন কেমনতর বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটার জন্মদিন, তাই খুব বেশি ধমক-ধামক করতে ইচ্ছে করে না। তাই রাগ সামলাতে চেষ্টা করেন কুসুম ঘোষ।

চারু ঘোষও সব কথা শুনতে পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। মেয়েটাকে যেন উদাসীনের জীবনের রীতি আর অভ্যাসগুলিকে অপমান করবার শখে পেয়েছে। কিংবা কাণ্ডজ্ঞানই হারিয়েছে। তা না হলে বুঝতে পারে না কেন, এরকমের কাণ্ড করলে উদাসীনের প্রেষ্টিজ নষ্ট করা হয়।

যাই হোক, খাবার টেবিলের আনন্দটা আর নষ্ট করেনি যুথিকা। কোন বিশ্রী উপদ্রব করেনি। বরং, শেষ পর্যন্ত দেখতে পেয়ে খুশি হলেন, আর একটু নিশ্চিন্ত হলেন চারু ঘোষ এবং কুসুম ঘোষ, বীরু আর নীরুর লোভের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে সব খাবারের সব স্বাদুতা একেবারে চেটেপুটে খেল যুথিকা; প্রত্যেকবার জন্মদিনের উৎসবের দিনে একটু বেশি উৎফুল্ল হয়ে বীরু নীরুর সঙ্গে যে সব গান গায় আর গল্প করে যুথিকা, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

উদাসীনের পিতা আর মাতার মুখের অপ্রসন্ন ভাবটাও শেষ পর্যন্ত হাসি-চাপা পড়ে। মনে মনে বোধহয় একটু আশ্বস্ত হন এবং একটু হাঁপও ছাড়েন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ; না যুথিকার মনের এই ছন্নছাড়া খেয়াল বোধ হয় একটা বুদ্ধিহীন আমোদের খেলা মাত্র; ফিটের ব্যারামের মত কোন ব্যারাম নয়। গিরধারীকে, জানকীরামকে, আর সোমরাকে—একটা ড্রাইভার, একটা চাকর আর একটা মালীকে হঠাৎ সমাদর করে পোলাও-টোলাও খাওয়াতে গেলে ওরাই যে ভয় পেয়ে চমকে উঠবে; যুথিকা বোধহয় ওদের ঐ ভয়ের চমক দেখে একটু মজা পেতে চায়। তাই কি?

কুসুম ঘোষ বলেন—আমার মনে হয়, যুথিকা শুধু একটু মজা করবার জন্যে এরকমের একটা কাণ্ড করতে চেয়েছিল।

চারু ঘোষ—তা যদি হয়; তবে রাগ করবার কিছু নেই। কিন্তু আমার কেমন একটা সন্দেহ হয় যে···

—কি? কুসুম ঘোষ আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

চারুবাবু বলেন—আমার সন্দেহ হয়, যুথিকা বোধহয় আজকাল বাজে বই-টই পড়ছে।

কুসুম—হাঁ, গাদা গাদা নভেল পড়ে দেখেছি।

চারুবাবু—না-না, নভেল-টভেলের কথা বলছি না! ওতে কিছু হয় না, আমার সন্দেহ হয়, যুথিকা আজকাল বিবেকানন্দের বই-টই পড়ছে না তো?

কুসুম অবিশ্বাস করেন—বিবেকানন্দের বই যুথিকা পড়বে কোন্ দুঃখে ?

চারুবাবু—দুঃখে নয় ; খেয়ালে। বাতিকে। সেই জন্যেই তো বলছি। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

কুসুম আশ্চর্য হন—তুমি কবে বিবেকানন্দের বই পড়লে ?

চারুবাবু—আমি না ; আমি দেখেছি কয়েকজনকে, বিবেকানন্দের বই পড়তে পড়তে শেষে জীবনের সব প্রসপেক্টের কি ভয়ানক সর্বনাশ করে কি হয়ে গেলেন নন্তকাকা।

কুসুম—নন্তকাকা কে ?

চারুবাবু—আমারই বন্ধু—এক কলেজের বন্ধু ফটিকের আপন কাকা। ভদ্রলোক কেম্ব্রিজের এম-এ ; দেশে ফিরে এসেই আটশো টাকা মাইনের একটা সরকারী সার্ভিস পেলেন ; ভেবে দেখ, সে সময়ের আটশো টাকা ; তার মানে, আজকের প্রাইস ইনডেক্স অনুসারে বত্রিশ শো টাকা। ভদ্রলোক সে সার্ভিস নিলেন না ; একটা অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে নিজেই একটা স্কুল করলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি, স্কুল বাড়ির কাছে কাউ-শেডের মত একটা ঘরের ভেতরে বসে নিজের হাতে রান্না করছেন নন্তকাকা ; ভাত, ডাল আর ঢেঁড়সের চচ্চড়ি ; ব্যস্। কী সাংঘাতিক অবস্থা !

কুসুম—ইচ্ছে করে কেন এরকম অবস্থা করলেন নন্তকাকা ?

চারুবাবু—বললাম তো, বিবেকানন্দের বই পড়বার অভ্যাসে পেয়েছিল। গরীব হয়ে যাবার বাতিকে ধরেছিল।

চারুবাবুর সন্দেহটাকে সন্দেহ করবার মত মনের জোর আর পান না কুসুম ; এবং একটু ভয়ও পান বোধহয়। এবং একদিন হঠাৎ যুথিকার পড়ার ঘরে ঢুকে ভয়ের কথাটা একটু কৌশল করে বলেই ফেললেন কুসুম।—ভাল বই-টই পড়বি ; বিবেকানন্দের বই-টই পড়ে কোন লাভ নেই।

যুথিকা হাঁ করে আর চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে—বিবেকানন্দ কে ?

কুসুম—বিবেকানন্দ, অ বার কে ?

যুথিকা—আমি জানি না ; কোনদিন এরকম একটা নামও শুনিনি।

কুসুমের চোখের দৃষ্টিটাই যেন হঠাৎ খুশি হয়ে হেসে ওঠে। তাঁর কৌশলের প্রশ্নটাই সার্থক হয়েছে। বৃথা সন্দেহ, অযথা দুশ্চিন্তা।

এবং চারুবাবুর কাছে গিয়ে হেসে ফেলেন কুসুম।—মেয়েটার সামান্য দুটো-একটা খেয়ালের কাণ্ড দেখে মিছিমিছি বড় বেশি ভাবনা করা হচ্ছে, ছিঃ।

চারুবাবুও একটু লজ্জিত হয়ে হাসতে থাকেন।

উদাসীনের বারান্দার চেয়ারগুলির উপর রোজই সকাল বেলায় যে-সব মানুষকে বসে থাকতে দেখা দেয়, তারা সবাই মক্কেল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যা-বেলাতেও দু'চারজনের সমাগম দেখা যায়।

কিন্তু আজ সন্ধ্যায় উদাসীনের ফটক পার হয়ে, দু'চোখে কেমন একটা উৎসাহের দৃষ্টি নিয়ে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে এসে উদাসীনের বারান্দার উপর দাঁড়ালো যে মানুষটা, তাকে দেখলেই বোঝা যায়, মোটেই মক্কেল মানুষ নয়। তবে কে? কিসের জন্যই বা এসেছে?

চারুবাবু বাড়িতে নেই। কুসুম ঘোষও নেই। উদাসীনের বাপ-মা দুজনেই বেড়াতে বের হয়েছেন। বীরু-নীরুও সঙ্গে গিয়েছে। বাড়িতে আছে শুধু যুথিকা। যুথিকাকে আজ সকাল থেকে বিকালের মধ্যে অনেকবার হাঁচতে আর কাশতে দেখা গিয়েছে; একটু টেম্পারেচারও হয়েছে। কুসুম বলেছেন, সাবধান যুথি! তুমি আজ জানালার কাছেও দাঁড়াবে না, বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা।

উপর তলার সেই ঘর; যেটা যুথিকা ঘোষের পড়ার ঘর; তারই ভিতরে একটা চেয়ারের উপর বসে উলের মাফলার গলায় জড়াতে জড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ে যুথিকার ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলো একটা মানুষ, যে মানুষকে মক্কেল বলে মনে হয় না। হিমাদ্রি গোছের একটা মানুষ বলে মনে হয়। বয়সের দিক দিয়েও প্রায় হিমাদ্রিরই মত। গায়ের জামা-কাপড়ের চেহারাও প্রায় সেই রকমের। খয়েরা রঙের একটা আধা-আস্তিন পাঞ্জাবি, কেজো মানুষের মত মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি; ধুতিটা অবশ্য ময়লা নয়। হিমাদ্রিরও ময়লা ধুতি পরা অভ্যাস নয়। সাদা রবারের জুতো না হলেও আগন্তুকের পায়ে সাদাটে এক জোড়া চামড়ার চটি দেখা যায়। কি আশ্চর্য ভদ্রলোককে দেখলে হিমাদ্রিরই কথা মনে পড়ে যায়।

উদাসীনের যে মেয়েকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে গায়ে ঠাণ্ডা লাগা- নিষেধ করে গিয়েছেন উদাসীনের মা, সেই মেয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে জানালার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। তার পরেই উপরতলা থেকে তরতর করে নেমে এসে একেবারে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, যেখানে সারি সারি ফুলগাছগুলিকে দুলিয়ে দিয়ে ফুরফুর করছে অফুরান ঠাণ্ডা হাওয়া। গাছে

—কাকে চান?

যুথিকার প্রশ্ন শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আগন্তুক যুবক। এবং উত্তর দেয়—আমি চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—বাবা এখন বাড়িতে নেই।

—তাহলে আচ্ছা ··তাহ'লে আর একদিন আসবো।

চলে যাবার জন্য তৈরী হয় যুবক ভদ্রলোক।

দেখতে পায় যুথিকা, ভদ্রলোকের হাতে ছোট একটা খাতা আর রসিদ-বইয়ের মত দেখতে একটা বই।

—আপনি নিশ্চয় কোনও দরকারী কাজে এসেছিলেন। প্রশ্ন করে যুথিকা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহ'লে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন না কেন? বাবা বড় জোর আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বেন।

যুবক ভদ্রলোক বেশ খুশি হয়ে, এবং যেন একটু কৃতার্থ ভাবে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে আমার কোন অসুবিধা নেই।

—তাহ'লে বসুন।

যুবক ভদ্রলোক আবার চেয়ারে বসে; কিন্তু যুথিকা ঘোষ চলে যায় না। বরং অদ্ভুত এক কৌতূহলের আবেগে বাচাল হয়ে ওঠে।

—কিছু মনে করবেন না, যদি একটা প্রশ্ন করি।

—বলুন।

—বাবার কাছে আপনার কিসের কাজ?

—চাঁদা চাইতে এসেছি।

—কিসের চাঁদা?

—রিলিফের কাজের জন্য।

যুথিকা বোকার মত তাকায়।—তার মানে?

যুবক ভদ্রলোক বলে—বাংলা দেশে একটা বন্যা হয়ে গিয়েছে। প্রায় দু' 'খ মানুষের ঘর ভেসে গিয়েছে। ক্ষেতের সব ধান পচে গিয়েছে। খবরের কাজ দেখেছেন বোধহয় ··।

প্রশ্নটাইথকা—খবরের কাগজ আমি পড়ি না।

এব যাই হোক, দেশের সব বড়-বড় নেতাই সাহায্যের জন্য আবেদন ছুটো:ছেন। একটা রিলিফ কমিটিও হয়েছে।

ি —ঠিক বুঝলাম না।

—বন্যার জন্যে যে-সব লোক কষ্টে পড়েছে তাদের সাহায্য করবার জন্য রিলিফ কমিটিকে অনেকেই টাকা পাঠাচ্ছেন। আমরাও ঠিক করেছি, চাঁদা করে আমাদের গিরিডি থেকে অন্তত শ' পাঁচেক টাকা রিলিফ কমিটিকে পাঠাবো।

—আপনারা কারা?

—আমরা এখানেই চাকরি-বাকরি করি।

—তাই বলুন। হাঁপ ছাড়ে যুথিকা ঘোষ। এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোকের কথাগুলিকে একটা রহস্যের মত মনে হচ্ছিল, এবং কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছিল না।

বারকয়েক এদিকে-ওদিকে পায়চারি করে আর গলার শিথিল মাফলারটাকে ভাল করে জড়িয়ে, আবার অচমকা প্রশ্ন করে ওঠে যুথিকা—কত টাকা পেলে আপনি খুশি হবেন?

যুবক ভদ্রলোক হেসে ফেলে—আপনারা খুশি হয়ে যা দেবেন, তাতেই খুশি হব।

যুথিকা—দশ টাকা?

—হ্যাঁ।

—বেশ; তাহলে···

যুথিকার কথা শেষ না হতেই উদাসীনের ফটকের কাছে মোটর গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যায়। বেড়িয়ে ফিরছেন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ এবং বীরু ও নীরু।

বীরু-নীরু দৌড়তে দৌড়তে ছুটে এসেই বাড়ির ভিতর চলে যায়। এবং চারু ঘোষ ও কুসুম ঘোষ আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দার উপরে উঠেই চমকে ওঠেন।

যুবক ভদ্রলোকও ব্যস্তভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।—আপনারই কাছে এসেছি।

—হেতু? চারু ঘোষের গলার স্বর একটা গম্ভীর বিরক্তির শব্দের মত বেজে ওঠে।

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাংলা দেশে যে বন্যা হয়েছে···

—জানি, কিন্তু সেকথা জানাবার জন্য তোমার এখানে আসবার কি দরকার বুঝতে পারছি না।

—রিলিফ কমিটিতে কিছু টাকা পাঠাতে হবে। সেইজন্য আপনার কাছে কিছু চাঁদা চাই।

—নো চাঁদা। দেয়ার ইউ স্টপ।

—আজ্ঞে?

—আমি চাঁদা দেব না।

—যে আজ্ঞে। আমি চলে যাচ্ছি।

যুবক ভদ্রলোক তখুনি চলে যেত নিশ্চয়; কিন্তু যুথিকা হঠাৎ বলে ওঠে,—আমি যে ভদ্রলোককে কথা দিয়ে ফেলেছি বাবা।

যুথিকার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চারু ঘোষের চোখ দুটো যেন চমকে ওঠে।—কি কথা?

যুথিকা—দশ টাকা চাঁদা প্রমিস করেছি। সেই জন্ম উনি অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে আছেন।

—কতক্ষণ ধরে?

—আধ ঘণ্টা হবে?

চুপ করে কিছুক্ষণ ধরে আনমনার মত কি যেন ভাবেন চারু ঘোষ। তারপর কুসুম ঘোষের হতভম্ব মুখটার দিকে তাকান। ছোট একটা ভ্রুকুটির ছায়াও চারু ঘোষের চোখের উপর সিরসির করে কাঁপে। তারপরেই পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে যুবক ভদ্রলোকের হাতের দিকে এগিয়ে দেন চারু ঘোষ।

তাড়াতাড়ি পেন্সিল চালিয়ে খস খস করে একটা রসিদ লিখে চারু ঘোষের হাতের উপর ফেলে দিয়ে আর দশটাকার নোটটা হাতে নিয়ে চলে যায় যুবক ভদ্রলোক। দেখলে মনে হয়, হাঁ, লোকটা এই উদাসীনকে প্রকাণ্ড অপমান করবার আনন্দে তৃপ্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে যাচ্ছে।

কুসুম বলেন—এ কি কাণ্ড যুথি? আবার এরকমের একটা নোংরা কাণ্ড কেন করলে তুমি?

যুথিকা হাসে—রাগ করছো কেন?

কুসুম চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমাকে চড় মারা উচিত ছিল। কোথাকার কে না কে, যেমন চেহারা তেমনি আক্কেল, তাকে ইচ্ছে করে তুমি এই বাড়ির চেয়ারে আধ ঘণ্টা ধরে বসিয়ে রেখেছো।

চারু ঘোষের গম্ভীর স্বর আরও তপ্ত হয়ে ওঠে।—আমার প্রশ্ন, তুমি লোকটার সঙ্গে কথা বললে কেন?

কুসুম—তোমার জন্যেযে ওকে আজ একটা বাজে লোকের কাছে অপমানিত হতে হলো, এটুকু বুঝতে পারলে কি মুখ্যু মেয়ে?

—আমি তাহ'লে চলি।

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বারান্দা থেকে নেমে যাবার আগেই সরে গিয়ে পায়চারি করতে থাকে যুথিকা।

ফটকের কাছে গাড়ির শব্দ বেজে উঠতেই বুঝতে পারে যুথিকা: চলে গেলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ফটকের দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারে যুথিকা, না, ভদ্রলোকের ঝকঝকে গাড়িটা স্টার্ট নেয়নি। বাড়ির গাড়িটাই এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি ফিরেছেন বাবা আর মা। আর বীরু-নীরু। এবং আগন্তুক। ভদ্রলোকের সঙ্গে সবারই একেবারে মুখোমুখি দেখাও হয়ে গিয়েছে।

শুধু কি দেখা? যুথিকা ঘোষের চোখ দুটো একটু আশ্চর্য হয়ে, আর বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে বোকার মত তাকিয়ে দেখতে থাকে, বাবা আর মা যেন আগন্তুক ভদ্রলোকের পথ আটক করেছেন। ভদ্রলোককে এখনি চলে যেতে দিতে রাজি নন বাবা আর মা; তবে কি, সত্যিই কি ভদ্রলোক বাবা আর মা-র পরিচিত কোন মানুষ?

কোন সন্দেহ নেই। বারান্দাতে দাঁড়িয়েই শুনতে পায় যুথিকা, ভদ্রলোককে মাত্র পাঁচটি মিনিট বসে যেতে আর অন্তত একটি কাপ চা খেয়ে যেতে কি কাতর অনুরোধ করছেন বাবা আর মা!

কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা।—না, এক্সকিউজ মি!

ভদ্রলোকের গলার স্বর যেন একটা ব্যথিত অহংকারের সৌজন্যপূর্ণ গর্জন।

কুসুম ঘোষ অনুরোধ করেন—মাত্র পাঁচটা মিনিট বসে যাও সুমন্ত।

সুমন্ত? নামটা যেন বাবা আর মা-র মুখেই কয়েকবার শুনেছে যুথিকা ঘোষ। অনেকদিন আগে প্রায়ই এই নামটা বাবা আর মা-র মুখে শোনা যেত, আজকাল আর শোনা যায় না। ঐ ভদ্রলোক সেই সুমন্ত? বাবার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর ভাইপো যে সুমন্ত জার্মানী থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে ফিরেছে আর মধ্যপ্রদেশে একটা মস্ত বড় কারখানার জেনারেল ম্যানেজার হয়েছে, যাকে অনেকদিন আগে একবার গিরিডিতে আসবার জন্য আর উদাসীনে এসে অন্তত সাতটি দিন থেকে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাবা, ঐ ভদ্রলোক কি সেই সুমন্ত? তাই তো মনে হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুমন্তের জেদই জয়ী হলো। চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষের কাতর অনুনয়গুলি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

—আমার পাঁচ মিনিটেরও দাম আছে মিসেস ঘোষ। অকারণে আর

অযথাস্থানে একমিনিট সময়ও নষ্ট করতে পারি না। বলতে বলতে নিজের গাড়িতে উঠেই গাড়ি স্টার্ট করে সুমন্ত। উদাসীনের বারান্দা, উদাসীনের ফটক, আর উদাসীনের বাপ-মা-র দুটো দুঃখ-কাতর মুখের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে উধাও হয়ে গেল সুমন্ত।

বিমর্ষভাবে আর ফিসফিস করে আক্ষেপের স্বরে, বোধহয় সুমন্তর এই অদ্ভুত রকমের রূঢ় ব্যবহারের কথা আলোচনা করতে করতে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ান চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ। এবং যূথিকাকে দেখতে পেয়েই যেন একটা ভয়ানক বিস্ময়ের চমক লেগে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে কুসুমের চোখের চাহনি।

—সুমন্ত যে চলে গেল তুই কি দেখতে পাসনি যূথি ?

—পেয়েছি বৈকি।

—কোথায় ছিলি তুই ?

—এখানেই।

—তবে কি সুমন্তের সঙ্গে তুই কোন কথাই বলিসনি ?

—হ্যাঁ বলছি; সামান্য দু'একটা কথা।

—তার মানে ? সুমন্তের সঙ্গে সামান্য দু'একটা কথা কেন ?

চারুবাবু বলেন—সুমন্তকে একটু বসে চা খেয়ে যাবার জন্য তুমি অনুরোধ করনি ?

যূথিকা—না।

চারুবাবু—কেন ?

যূথিকা—কি আশ্চর্য, আমি কি করে জানবো যে উনি সুমন্ত না শ্রীমন্ত ? একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে গায়ে পড়ে চা খাওয়াবার জন্য অনুরোধ করতে গিয়ে শেষে কি ·।

চারুবাবু—থাক, আর বলতে হবে না। তোমার চমৎকার কাণ্ডজ্ঞানের আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

কুসুম চেঁচিয়ে ওঠেন—ছি ছি ছি! এরকম অভদ্রতা তোর পক্ষে সম্ভব হলো কেমন করে বল শুনি ? সুমন্ত যে নরেনের মাইনের চারগুণ মাইনে পায়। সুমন্তের তুলনায় নরেন তো বলতে গেলে একজন পেটি অফিসার মাত্র।···সুমন্তের সঙ্গে অভদ্রতা করে নিজেরই যে ক্ষতি করলি, তা যদি বুঝতে পারতিস তবে···।

যূথিকা—তোমার যা খুশি বলতে পার; কিন্তু আমি কোন অভদ্রতা করিনি, ভদ্রতাও করিনি।

—তোমার কপাল করেছ। ধমক দেন কুসুম।

—আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কুসুমের ক্ষোভ শান্ত করতে চেষ্টা করেন চারু ঘোষ।

উদাসীনের বাপ আর মা যখন নীরব হয়ে ঘরের ভিতরে চলে যান, তারও অনেকক্ষণ পরে, অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বই-এর পাতা হাতড়ে করমুল্লা খুঁজতে গিয়ে আনমনা হয়ে যায় যূথিকা।

যূথিকার অভদ্রতায় রাগ করে চলে গিয়েছে সুমন্ত; কিন্তু নরেন যদি আজ আড়ালে দাঁড়িয়ে চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষের এই সব কথা শুনতে পেত, তবে কি হতো? নরেনও কি রাগ করে চলে যেতো না?

বেশ হতো! যূথিকা ঘোষের মনটা যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে নীরবে হেসে ওঠে। সব লেঠা চুকে যেত। মামীর কাছ থেকে এক একটা উদ্বেগের চিঠি তেড়ে আসতো না; আর যূথিকার পাটনা যাবার সব ব্যস্ততারও ইতি হয়ে যেত। তখন দেখা যেত, যূথিকার কাছে এসে নিজেদের ভুলের কোন্ কৈফিয়ৎ দিতেন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ?

সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে এলেন গণেশবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ লতিকার মা অর্থাৎ রমা মাসিমা। বসতে না বললেও বসে পড়েন, প্রশ্ন না করলেও কথা বলেন, আর গায়ে পড়ে হাজার কথা বলে মানুষকে জ্বালাতে পারেন যে মহিলা তাঁকে দেখা মাত্র কুসুম ঘোষের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ভুলতে পারবেন কি করে কুসুম, ইনিই তো সেই প্রচণ্ড মতলবের আর কৌশলের মহিলা, যিনি নরেনের কাছে লতিকাকে গছাবার জন্য বছরে পাঁচবার পাটনা দৌড়চ্ছেন। ভাগ্য ভাল, যূথিকার মামী কণিকার মত শক্ত মানুষ পাটনাতেই থাকে; তাই নরেনকে টেনে নেবার অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত টেনে নিতে পারেন নি। কণিকা বাধা হয়ে বসেই পারেন নি। তা না হলে এতদিনে বোধহয় নরেনের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হয়েই যেত।

কিন্তু লতিকার মা এসেই হেসে হেসে সবার সামনে যে গল্পটা বললেন, সেটা একটা দুঃসহ বিস্ময়ের গল্প। শুনে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না। লতিকার মা যেন উদাসীনের আকাঙ্ক্ষার সব গর্ব মিথ্যে করে দিয়ে বিজয়িনীর মত ভঙ্গী নিয়ে একটা কৃতার্থতার কাহিনী বলছেন। যূথিকা সামনেই বসে রয়েছে; তবু বলতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করলেন না লতিকার মা।

লতিকার মা বললেন—আমি আজই পাটনা থেকে এসেছি। খবর নিয়েছি,

কণিকা ওর ছেলেপিলে নিয়ে ভালই আছে।...হ্যাঁ বোম্বাই থেকে হঠাৎ একদিনের জন্ম পাটনাতে এসেছিল নরেন। নিজেই ফোন করে শীতাংশুকে জানিয়ে দিল, আমি এসেছি শীতাংশুদা। জানই তো, আমার শীতাংশুর অভ্যাস, মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে কত ভালবাসে শীতাংশু!

কোন প্রশ্ন করবেন না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন যিনি, তিনিই, সেই কুসুম ঘোষই চমকে উঠে প্রশ্ন করে বসলেন :—শীতাংশু শেষ পর্যন্ত গায়ে পড়ে নরেনকে নিমন্ত্রণ করেছিল বোধহয়?

—হ্যাঁ; দুপুরে এল নরেন; সন্ধ্যা হবার পর চলে গেল। লতিকার গান শুনে কত প্রশংসা করলো নরেন।

কুসুম—গায়ে পড়ে গান শোনালে কে না প্রশংসা করবে বলুন?

লতিকার মা—এটা আবার কেমন কথা হলো। গায়ে পড়ে গান শোনাবে কেন লতি? নরেন নিজেই বারবার বললে, অগত্যা বাধ্য হয়ে...। হ্যাঁ নরেন তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বলেছি, সবাই ভাল আছে।

কুসুম—আবার পাটনাতে কবে আসবে নরেন?

লতিকার মা—তা জানি না। নরেন বললে, মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'এক দিনের জন্ম চলে আসতে পারে।

লতিকার মা চলে যেতেই যূথিকার মুখের দিকে আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করেন কুসুম—এসব কি শুনলাম?

যূথিকা হাসে—যা শুনতে পেলে তাই শুনলে; আবার কি?

কুসুম—আমার মনে হয়, সব মিথ্যে কথা।

যূথিকা—সত্যি কথা হলেই বা কি?

কুসুম রাগ করেন—বাজে কথা বলিস না।...কিন্তু আমি ভাবছি, কণিকা বসে বসে করছে কি? এরকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ তার কোন খবরই রাখে না কণিকা? হতেই পারে না?

লতিকার মা-র কথাগুলিকে অবিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে; কিন্তু অবিশ্বাস করবার মত মনের জোরটাই যেন বার বার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবতে গিয়ে এক-একবার সত্যিই শিউরে ওঠেন কুসুম ঘোষ; ভগবান না করেন, লতিকার মা-র কথাগুলি যদি মিথ্যে কথা না হয়, তবে যূথিকার জীবনে যে একটা ভয়ানক অপমানের জ্বালা লাগবে। মেয়েটার মনের দশাও যে কি হয়ে যাবে, ভগবান জানেন! জানেন কুসুম ঘোষ, কণিকার কাছ থেকে অনেক চিঠিতে যে-খবর এতদিন ধরে জেনে এসেছেন তাতে আর কোন সন্দেহই

নেই যে, নরেনকে ভালবাসে যূথিকা। নরেনের ভালবাসার উপরেও মস্ত বড় একটা বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে যুথিকা। এর পর, লতিকার সঙ্গে সত্যিই যদি নরেনের বিয়ে হয়ে যায়, তবে···।

কুসুম ঘোষের চোখ দুটো করুণ হয়ে যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু এ কি ব্যাপার? যূথিকার মুখে কোন উদ্বেগের বেদনা ফুটে উঠেছে বলে মনে হয় না। ঘরের ভিতরে কেমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে আর গুনগুন করে চাপা-গলায় গান গাইছে যূথিকা।

কণিকার অসাবধানতার উপর রাগ হয়, আর যূথিকার এই চাপা-গলার গানের গুঞ্জনের উপরেও রাগ করেন কুসুম ঘোষ। এরা ভেবেছে কি! কণিকা কি ক্লান্ত হয়ে সব চেষ্টাই ছেড়ে দিল? আর যূথিকা কি আচমকা একটা শক পেয়ে, একেবারে আশাশূন্য হয়ে, দুর্ভাগ্যের আর অপমানের জ্বালা চাপবার জন্য চাপা-গলায় গান গেয়ে উঠলো?

—যূথি ডাকতে গিয়ে কুসুম ঘোষের গলার স্বরটা যেন দুশ্চিন্তার প্রতিধ্বনির মত বেজে ওঠে।

—কি মা? গান থামিয়ে আর একটু আশ্চর্য হয়ে উত্তর দেয় যূথিকা।

—তুই ভাবিস না। লতিকার মা নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলেছে।

হেসে ওঠে যূথিকা।—বললাম যে, সত্যি হলেই বা কি আসে যায়।

—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। বলবার কোন দরকারও হয় না। লতিকার মা-র মতলব শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না কিন্তু তবু একটু সাবধান হওয়া ভাল।

—বুঝতে পারছি না মা।

—আমার মনে হয়, তোর এখন পাটনাতে থাকাই ভাল।

—এখন পাটনাতে গিয়ে লাভ কি? কলেজ খুলতে এখনও অনেকদিন বাকি আছে।

—তা জানি; কিন্তু নরেনের যে হঠাৎ মাঝে মাঝে পাটনাতে এসে পড়বার সম্ভাবনাও আছে।

—আসুক না।

—কি ছাই বলছিস? তুই এখানে বোবা হয়ে পড়ে থাকবি, কণিকা ওদিকে হাবা হয়ে পড়ে থাকবে; আর শীতাংশু ডাক্তার বার বার নরেনকে নেমন্তন্ন করে চা খাইয়ে, লতিকার গান শুনিয়ে··ছিঃ-ছিঃ···ওরা যে নরেনের একটা ভয়ানক ক্ষতি করে দেবে।

—কিন্তু আমি কি করতে পারি বল ?

—তুমি কালই পাটনাতে চলে যাও ; তারপর যা করবার কণিকা করবে।

—আমি পাটনা যেতে পারবো না।

যুথিকার কথা শুনে আশ্চর্য হন কুসুম ঘোষ। বরং একটু শঙ্কিতও হয়ে ওঠেন। যুথিকার চোখে-মুখের এই অবিচল প্রশান্তি, পাটনার উপর হঠাৎ এই তুচ্ছতা, এ যে যুথিকার মনের একটা অভিমানের বিদ্রোহ। খুবই ব্যথিত হয়েছে যুথিকা। মেয়েটার সম্মানে লেগেছে।

চলে যান কুসুম ঘোষ ; এবং একটু পরেই ফিরে আসেন ; সঙ্গে চারুবাবুও আছেন। যুথিকা ঘোষ ততক্ষণে একটা নতুন উপন্যাসের কুড়ি পাতা পড়ে ফেলেছে।

চারুবাবু বলেন—তোমার এখন পাটনা যাওয়া খুবই দরকার যুথি।

যুথিকার চোখে ছোট অথচ শক্ত একটা আপত্তির ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে।

চারুবাবু বলেন—দেরি করবারও দরকার নেই। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, কাল সকালে হিমু নামে সেই লোকটাকে একটা খবর দিয়ে আসবে···।

যুথিকা ঘোষের ভ্রূকুটিই যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে গলে যায় আর স্মিত বিস্ময়ের মত উথলে ওঠে। খোলা উপন্যাস বন্ধ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে যেন ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় যুথিকা—কালই রওনা হতে বলছো ?

চারুবাবু—হ্যাঁ। সকাল দশটার ট্রেনে।

যুথিকা—বেশ।

পাটনা যেতে হবে। আবার জগদীশপুর···মধুপুর···ঘশিডি—ট্রেনটা যেন দু'পাশের যত ছোট ছোট স্বপ্নলোকের কলরব গুঁড়িয়ে নিয়ে হুহু করে ছুটে চলে যাবে। ট্রেনের কামরার অচেনা ভিড়ের মুখরতা যেন একটা নীরবতা ; চুপ করে বসে শুধু নিজের মনের কথাগুলিকে বুকের ভিতরে শুনতে পাওয়া যায়। অচেনা ভিড়টাও যেন একটা নির্জনতা ; মনের কথা মুখ খুলে বলে ফেলতে একটুও অসুবিধা নেই, কোন বাধাও নেই ; কেউ শুনতেই পায় না বোধহয়। ট্রেনের ঘুম একটা জাগার স্বপ্ন, জেগে থাকাও একটা ঘুম-ঘুম আবেশ।

উদাসীনের বাগানে সকালবেলার আলো ছড়িয়ে পড়তেই উদাসীনের মেয়ে যুথিকা ঘোষের মনের ভিতরেও যেন আলো ছড়িয়ে পড়ে। যুথিকা ঘোষের জীবনের গন্তব্যটা পাটনা বটে ; সেই পাটনা যে পাটনাকে বেশ

ভাল লাগে কিন্তু পাটনা যাওয়ার ঝঞ্ঝাটও যে একটা উৎসবের আনন্দ হয়ে যুথিকা ঘোষের কল্পনায় দুলতে শুরু করে দিয়েছে। সকাল দশটা হতে আর বেশি দেরি নেই। তৈরী হয় যুথিকা ঘোষ।

তৈরী হওয়াও এমন কিছু ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার নয়। এবং তৈরী হবার ব্যাপারটাও সকাল ন'টা হতে না হতেই চুকে যায়। চামড়ার বড় একটা কেস, ছোট একটা বেডিং, খাবারের বাস্কেট, জলের ফ্লাস্ক আর ছোট হাত-ব্যাগটা উপরতলার ঘর থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে নীচের তলার বারান্দায় রেখে দেয় চাকর জানকীরাম।

সাজ করবারও-বিশেষ কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। নেকলেসটা গলা থেকে খুলে পড়ে যাবার ভয় আছে; না পরাই ভাল।

নেকলেসটাকে হাত-ব্যাগের ভিতরে রেখে দিয়েছে যুথিকা। আর···হ্যাঁ ভেলভেটের স্যাণ্ডেল পায়ে না দেওয়াই ভাল; ট্রেনে ওঠা-নামা করবার হুড়োহুড়ির মধ্যে স্যাণ্ডেলটা পা থেকে খসে পড়ে যায় আর বেচারা হিমাদ্রি সেই স্যাণ্ডেল আনতে গিয়ে ছিঃ, এক পাটি জুতো কুড়িয়ে আনবার জন্য মানুষ এমন বিপদের ঝুঁকিও নেয়? চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়ে আর···।

না, লাল ভেলভেটের স্যাণ্ডেল নয়, সবুজ রঙের চামড়ার সেই মেয়েলী শু জোড়া পায়ে দিয়ে তৈরী হয় যুথিকা। ড্রাইভারও গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে।

যাত্রালগ্নের এই ব্যস্ততার মধ্যেই এক ফাঁকে উপরতলার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটু একলা হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের ছবিটার দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে যেন নিজেকেই একটু মায়া করে নেয় যুথিকা। তারপরেই তরতর করে হেঁটে নীচে নেমে আসে। বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়ায়।

চারুবাবু বলেন—দশটা বাজতে আর পনর মিনিট বাকি।

কুসুম ঘোষ বলেন—চল, যুথি।

কিন্তু চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল যুথিকা। উদাসীনের মেয়ের একটা আশার স্বপ্ন যেন হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো বলাইবাবু। বলাইবাবুর এক হাতে তাঁর সেই লাল কম্বলটি, আর এক হাতে সেই ছোট ঝোলাটি এবং ঝোলায় মুখ ঠেলে সেই ছোট খেলো হুঁকোটার নলের মুখ উঁকি দিয়ে রয়েছে।

চারুবাবু বলেন—হিমু নামে সেই···ইয়ে—সেই রাফ স্বভাবের লোকটাকে

আর ডাকবার দরকার হলো না। মধুপুর থেকে বলাইবাবু হঠাৎ আজ সকালে এসে গিয়েছেন। কাজেই···

যুথিকার মুখের হাসি যেন মরা গোলাপের পাপড়ির মত একটা শুকনো বাতাসের আঘাত লেগে ঝরে পড়ে গিয়েছে। বিড়-বিড় করে যুথিকা—তাহলে—তাহলে বলাইবাবু আমার সঙ্গে যাচ্ছেন?

কুসুম—হ্যাঁ।

চারুবাবু খুশি হয়ে হাসেন—বলাইবাবুর কোমরের বাত যে এত শিগ্‌গির সেরে যাবে আমিও আশা করতে পারিনি।

হ্যাঁ, দেখতে পায় যুথিকা গাড়ির কাছে বেশ সোজা হয়ে আর কোমর টান করে দাঁড়িয়ে আছেন বলাইবাবু!

আর দেরী করে লাভ কি? দেরী করবার কোনও অর্থও হয় না। আস্তে আস্তে হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায় যুথিকা।

তারপর আর কোন ঘটনারই কোন দেরি সইতে হয় না। উদাসীনের গাড়ি একটানা ছুটে এসে স্টেশনের কাছে থামে। টিকিট কিনতে দেরি করেন না বলাইবাবু। মধুপুর যাবার ট্রেনের ইঞ্জিনটাও রওনা হবার উল্লাসের শিস বাজাতে আর গুমরে উঠতে দেরি করে না।

চারুবাবু বলেন—টেলিগ্রাম করে কণিকাকে জানিয়ে দিয়েছি।

কুসুম ঘোষ বলেন—তুমিও পাটনা পৌঁছেই একটা চিঠি দিতে ভুলে যেও না যেন।

মাথা নেড়ে একটা সাড়া দিতেও ভুলে যায় যুথিকা। একজোড়া উদাস চোখ নিয়ে আর নীরব হয়ে, ট্রেনের কামরার ভিতর ঢুকে অলস মূর্তির মত বসে থাকে। ছেড়ে যায় ট্রেন।

জগদীশপুরের নার্সারি পার হয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন তীব্র একটা শিস বাজিয়ে দু'পাশের মাঠের বাতাস শিউরে দিতেই যুথিকা ঘোষের এতক্ষণের নীরবতা যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে ভেঙ্গে যায়। বলাইবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে যুথিকা।—আপনার কোমরের বাত হঠাৎ সেরে গেল যে?

বলাইবাবুও যেন চমকে ওঠেন, এবং আস্তে আস্তে হাসেন—হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরের কৃপা। ওঃ, এই কটা মাস কি যে কষ্ট পেয়েছি, সে আর বলবার নয় দিদি।

যুথিকা—অসুখ হঠাৎ সেরে গেল ভালই হলো, কিন্তু আজ হঠাৎ আপনার গিরিডিতে যাবার এত দরকার হয়ে পড়লো কেন?

বলাইবাবু—দরকার বিশেষ কিছুর নয় দিদি। বাবুর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই।

যূথিকা—তাই, আর সময় পেলেন না? আজই হঠাৎ।

বলাইবাবু—কি বললে দিদি?

যূথিকা—দুদিন পরেও তো আসতে পারতেন?

বলাইবাবু—তা পারতুম কিন্তু আজ হঠাৎ গিরিডিতে এসে পড়েছিলুম বলেই না তোমাকে পাটনাতে পৌঁছে দেবার···।

যূথিকা—আমাকে পাটনা পৌঁছে দেবার মানুষ ছিল। আপনি না এলে কোন অসুবিধেই হতো না।

বলাইবাবু—অসুবিধে কেন হবে দিদি? বাবুর কি চাকর-বাকরের কোন অভাব আছে? কত মানুষ আছে।

যূথিকার গলার স্বর তপ্ত হয়ে ওঠে—আজ্ঞে না। আপনি না বুঝে-সুঝে এসব কথা বলবেন না।

বলাইবাবু হাসেন—বুড়ো মানুষের কথার এত ভুল ধরতে নেই দিদি।

যূথিকা—সেই জন্যেই তো বলছি।

বলাইবাবু—কি?

যূথিকা—আপনি বুড়ো মানুষ; ট্রেনে যাওয়া-আসা করবার সামর্থ্যই বা আপনার কতটুকু? মিছিমিছি নিজে কষ্ট পান আর আমাকেও অসুবিধায় ফেলেন।

বলাইবাবু ভীতভাবে বলেন—না না, আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও। তোমার যদি কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়, তবে আমাকে বললেই আমি তখুনি···।

যূথিকা—বলতে হবে কেন?

বলাইবাবু—অ্যাঁ! না বললে কেমন করে···।

যূথিকা—হ্যাঁ, না বললেও মানুষের অসুবিধে মানুষ বুঝতে পারে।

বলাইবাবু—আমিও কি পারি না? এতবার তোমাকে পাটনা নিয়ে গেলাম, বলতে পার দিদি, তোমার কোন অসুবিধে হতে দিয়েছি?

বুড়ো বলাইবাবুর প্রশ্নের একটা স্পষ্ট উত্তর হয়তো ঝোঁকের মাথায় শুনিয়েই দিত যূথিকা; কিন্তু বলাইবাবু হঠাৎ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে একটা প্রশ্ন করে ওঠেন।—তোমার হাত-ঘড়িটা দেখে একটু বল তো দিদি, ক'টা বাজল? এগারটা বেজে গিয়েছে?

যূথিকা হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ।

ওঃ, বড় ভুল হয়ে গেল। বলতে বলতে আরও ব্যস্ত হয়ে ঝোলা থেকে থার্মোমিটার বের করেন বলাইবাবু; আর বগলে চেপে বসে থাকেন। একটু পরেই প্রশ্ন করেন—দেড় মিনিট হলো কি দিদি?

যূথিকা—হ্যাঁ।

থার্মোমিটারটাকে যূথিকারই হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলাইবাবু বলেন—দেখে একটু বলে দাও তো দিদি, সাতানব্বই না আটনব্বই?

থার্মোমিটার হাতে তুলে নিয়ে যূথিকা বলে—সাতানব্বই।

যূথিকার হাত থেকে আবার থার্মোমিটারটা তুলে নিয়ে ঝোলার ভিতরে ভরতে ভরতে বলাইবাবু বলেন—তা হলে ভালই আছি বলতে হবে দিদি! নয় কি?

যূথিকা—হ্যাঁ।

নীরব হয় যূথিকা এবং বোধহয় চুপ করে বসে শুধু নিজের মনের সঙ্গে নীরবে কথা বলতে চায়। জানালা দিয়ে বাইরের মাঠের শোভা আর সাঁওতালী গাঁ-এর কুটিরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো আনমনা মানুষের চোখের মত অপলক হয়ে থাকে।

কিন্তু আবার বলাইবাবুর একটা প্রশ্নের শব্দ যূথিকার এই আনমনা নীরবতার শান্তিটাকেও যেন চমক দিয়ে নষ্ট করে দেয়।

—শুনছো দিদি?

যূথিকা বিরক্ত হয়ে বলে—কি?

—সাড়ে এগারটা বেজে গিয়েছে কি?

যূথিকা—হ্যাঁ।

—তা হলে আমার এখন কিছু আহারাদি দরকার দিদি।

যূথিকা আশ্চর্য হয়।—এখুনি খাবেন?

—হ্যাঁ, নিয়মভঙ্গ করতে চাই না দিদি। ডাক্তার বলেছেন, দিবাভাগের আহার সারতে যেন কোনমতেই বারটার বেশি না হয়ে যায়।

যূথিকা—মধুপুরে পৌঁছে তারপর খেলেইতো পারতেন!

—না দিদি, মধুপুরে পৌঁছতে ট্রেনটা আজ লেট করবে বলে মনে হচ্ছে।

খাবারের বাস্কেট হাতের কাছে টেনে নিয়ে, অয়েল পেপারের ঠোঙার মধ্যে দশটা লুচি, আলুভাজা, আর পাঁচটা সন্দেশ ভরে দিয়ে বলাইবাবুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় যূথিকা।

বলাইববু বলেন—জল ?

বাস্কেটের ভিতর থেকে গেলাস বের করে নিয়ে ফ্লাস্কের জল ঢালে যূথিকা।

বলাইবাবু লুচি ও আলুভাজা মুখে চিবোতে চিবোতে বলেন—গিরিডির কুয়োর জল আমার শরীরের পক্ষে একবারে মেডিসিন। ও জল খেতে পেলে আমি আধ সের মাংসের কারিকেও ডরাইনা।

আহারাদি সমাপ্ত হবার পর, ঝোলার হুঁকোর দিকে যখন হাতটাকে মাত্র বাড়িয়ে দিয়েছেন বলাইবাবু, ঠিক তখন ট্রেনের গতি হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যূথিকা বলে—মধুপুর এসে গিয়েছে। এখন আর হুঁকো-টুকো…।

বলাইবাবু বলেন—তাতে কি হয়েছে ? স্টেশন আসতে আসতে আমি টিকে ধরিয়ে ফেলবো।

ঝোলা থেকে হুকো, কলকে, তামাক আর টিকে বের করেন বলাইবাবু। এবং দেশলাই জ্বেলে টিকে তাতাতে শুরু করে দেন।

বলাইবাবুর ফু খেয়ে খেয়ে টিকের জলন্ত কোণা থেকে যখন ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে তখন ট্রেনটা থেমেই যায়। আর প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের কলরব ট্রেনের কামরার ভিতরে এসে লুটিয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি করে কুলির দলও ছুটে আসে।

একটা কুলি কামরার ভিতরে ঢুকে যূথিকা ঘোষের বাক্স বিছানা বাস্কেট আর ফ্ল্যাস্ক নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে। শুধু ছোট হাতব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় যূথিকা।

হুকোর নলের মুখে কলকেটা চেপে নিয়ে বলাইবাবু বলেন—আমার কম্বলটা আর ঝোলাটাকে ভুলে যেও না দিদি।

একহাতে হুকো নিয়ে, আর এক হাতে দরজার রড ধরে আস্তে আস্তে নেমে যান বলাইবাবু। বলাইবাবুর প্রকাণ্ড কম্বল আর ঝোলাটাকে একহাতে কোনমতে জড়িয়ে ধরে যূথিকাও প্ল্যাটফর্মে নামে।

বলাইবাবু হাফ ছাড়েন—আঃ, পাটনা এক্সপ্রেস আসতে এখন অনেক দেরি আছে দিদি।

হ্যাঁ, অনেক দেরি আছে। এখনও আধ ঘণ্টার বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবে, তারপর পাটনা যাবার ট্রেন ছুটে এসে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়াবে। হৈ-হৈ করে বেজে উঠবে সংসারের একটা ছুটন্ত ভিড়ের কর্কশ মুখরতা। এবং সেই মুখরতার একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে ঢুকে চুপ করে বসে থাকতে হবে। বিকেল

পার হয়ে যাবে, সন্ধ্যাটা আস্তে আস্তে মরে যাবে, আর গভীর হয়ে যাবে। তারপর, মাঝরাতেরও পরে একটি মুহূর্তে পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে শুধু দেখতে হবে মামীর ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে।

পাটনা যাবার ট্রেন একটা ট্রেন মাত্র। এমন ট্রেনযাত্রা একটা যন্ত্রণার অভিযান মাত্র ভাবতে একটুও ভাল লাগে না। যূথিকার কল্পনার ছবিটাকে মিথ্যে করে দিয়ে এ কি অদ্ভুত একটা অমধুর আর অকরুণ ট্রেনযাত্রা দেখা দিল।

হঠাৎ ছটফট করে শঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা—বলাইবাবু।

—কি দিদি?

যূথিকা—আমার বড় অসুবিধে হচ্ছে। আমি পাটনা যেতে পারবো না।

চমকে ওঠেন বলাইবাবু—অসুবিধে? কিসের অসুবিধে? আমি তো সর্ব্বক্ষণ তোমার সুবিধের জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছি দিদি।

যূথিকা—তবু আমার অসুবিধে হচ্ছে।

বলাইবাবু—কিন্তু, আমি তো···।

যূথিকা—আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। মোট কথা, আমার এখন পাটনা যেতে খুবই খারাপ লাগছে।

চোখ বড় করে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকেন বলাইবাবু—তাহলে সত্যিই কি গিরিডি ফিরে যেতে চাও?

যূথিকা—হ্যাঁ।

বলাইবাবু—কিন্তু বাবু যে আমার উপর ভয়ানক রাগ করবেন দিদি।

যূথিকা—আপনার ওপর রাগ করবেন কেন? আপনার দোষ কি?

বলাইবাবু—হ্যাঁ, সেটা বুঝে দেখ দিদি। আর সেটা বাবুকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে ভুলে যেও না।

যূথিকা—আপনি ভাবছেন কেন? আমি বলবো, আমিই ইচ্ছে করে ফিরে এসেছি।

যূথিকাই ব্যস্ত হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কুলিটাকে ডাকে। এবং কুলিটাও একটু আশ্চর্য হয়ে বাক্স বেডিং তুলে নিয়ে গিরিডি যাবার ট্রেনের কামরায় তুলে দিয়ে সেলাম জানায়—কুছ বকশিসভি দিজিয়ে দিদি।

হাত-ব্যাগ থেকে টাকা বের করে কুলির হাতে ফেলে দিয়ে আর বলাইবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।—চা খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো খেয়ে নিন বলাইবাবু। এই ট্রেন ছাড়তেও আর বেশি দেরি নেই।

বলাইবাবু বলেন—নিশ্চয় নিশ্চয়। একটা চা-ওয়ালাকে ডাক দিও দিদি।

জ্বর-টর হয়নি, শরীর ভালই আছে, তবু মধুপুর থেকে ফিরতি ট্রেনেই গিরিডি ফিরে এসেছে যুথিকা। একি কাণ্ড! কি বিশ্রী ব্যাপার। কুসুম ঘোষ তাঁর দু'চোখের বিস্ময় সামলাতে গিয়ে শেষে সন্দেহ করেন, মেয়েটার মাথায় সত্যি সত্যি পাগলামির ছিট দেখা দিল না তো?

চারু ঘোষ বলেন—আমি তো যুথির মতি-গতির কোন অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না।

এখন পাটনা যেতে একটুও ভাল লাগছে না; এই কথা ছাড়া আর কোন কথা বলতে পারেনি যুথিকা। কথাগুলি একটুও মিথ্যে নয়। এবং বিশ্বাসও করেন উদাসীনের পিতা আর মাতা। কিন্তু, কেন পাটনা যেতে একটুও ভাল লাগছে না? এ যে একটা অত্যন্ত অন্যায় ভাল-না-লাগা! অনেকবার আক্ষেপ করেন কুসুম ঘোষ।

কেন পাটনা যেতে ইচ্ছে করছে না? এ যে নিতান্ত বোকার মত ইচ্ছে না-করা! বারবার এবং বেশ একটু রূঢ় স্বরে অভিযোগ করেন চারু ঘোষ।

এবং মাত্র আর তিনটে দিন পার হবার পর, পাটনা থেকে কণিকা মামীর একটা মস্ত বড় চিঠি এসে উদাসীনের পিতা আর মাতার মনে আবার একটা কঠিন উদ্বেগের বেদনা ছড়িয়ে দেয়।

জানিয়েছেন কণিকা; আর তিন-চার দিনের মধ্যে নরেন পাটনাতে এসে পড়বে। এবং এইবার বেশ কিছুদিন পাটনাতেই থাকবে। নরেনের চিঠির ভাষা থেকে বুঝতে পেরেছে কণিকা, এবার পাটনাতে এসে মন স্থির করে একটা পাকা-কথা দিয়ে ফেলবে নরেন। নরেনের মা-র সঙ্গেও আলাপ করে তাই মনে হয়েছে কণিকার। তা না হলে দেড়-মাসের ছুটি নেবে কেন নরেন?

আরও কতগুলি কথা খুবই বিরক্ত হয়ে লিখেছে কণিকা;—কিন্তু আপনাদের প্রতিবেশী গণেশবাবুর বড় ছেলে, অর্থাৎ লতিকার ডাক্তার দাদা শীতাংশু যে কেন এত ঘন ঘন নরেনের মা-র সঙ্গে দেখা করছে, বুঝতে পারছেন কি? মাঝে একদিনের জন্যে আমি সাসারাম গিয়েছিলাম। ফিরে এসে জানলাম, নরেনও একদিনের জন্য পাটনা এসেছিল। যুথিকার সঙ্গে নরেনের ভাবসাব আছে, একথা তো ওরাও জানে। তবু দেখেন, কি কুৎসিৎ মনোবৃত্তি? নরেনের কাছে লতিকাকে গছাবার জন্য কী চক্রান্তই না করে চলেছে! লতিকার মা আপনাদেরই প্রতিবেশিনী সেই সাংঘাতিক মহিলাটি,

এর মধ্যে একবার পাটনা ঘুরে গিয়েছেন। নরেনকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে লতিকার গান শুনিয়েছেন। নরেনের মা-র কাছে লতিকার একখানা ফটো আর লতিকার লেখা এক গাদা কবিতার একটা খাতা রেখে গিয়েছেন। কিন্তু ওদের কোন মতলবই সফল হবে না, যদি এইসময় যূথিকা এসে পাটনাতে থাকে।

সব শেষে লিখেছে কণিকা—যূথিকার একটা বিশ্রী দোষ এবার দেখলাম. মেয়েটা কি যেন সন্দেহ করেছে আর হতাশের মত হাঁপিয়ে পড়েছে। ওরকম ভুল করলে চলবে না যূথিকার। ওকে একটু বুঝিয়ে দেবেন, নরেন যদি. ভগবান না করেন, কোন কারণে কিছু সন্দেহ করে ফেলে, তবে কি পরিণাম হবে কল্পনা করুন। যদি লতিকার সঙ্গে নরেনের বিয়ে হয়ে যায়, তবে যূথিকার কি আর কারও কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে?

--এই নে, কণিকার চিঠি পড়ে দেখ। কুসুম ঘোষ রাগ করে চিঠিটাকে যূথিকার হাতে কাছে তুলে দিয়ে যান।

পাটনার মামীর প্রকাণ্ড চিঠিটা পড়েই চমকে ওঠে যূথিকা। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে যূথিকার প্রাণ। অনেকক্ষণ চুপ করে যেন আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে যূথিকা। তারপরেই ছটফট করে ওঠে।

লতিকার মনের আশার ইতরতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে যূথিকা. লতিকার জীবনের জেদটাও কি ভয়ানক বেহায়া। তাইতো? কি হবে উপায়? নরেন সত্যিই যদি ভুল করে লতিকার মত মেয়েকে···ভাবতে গিয়ে উদাসীনের মেয়ে যূথিকার মনের ভিতরে একটা অস্বস্তি. বোধহয় একটা উদ্বেগের ছায়া ছটফট করতে থাকে।

নরেনের মনটা যদি এত উদার আর কোমল না হতো, তবে এক মুহূর্তের জন্যও উদ্বেগে বিচলিত হতো না যূথিকার মন। কিন্তু নরেন খুব বেশী ভদ্র বলেই বোধহয় শীতাংশু ডাক্তারের ইচ্ছা আর চেষ্টার বিরুদ্ধে স্পষ্ট ক'রে অভদ্রতা করতে পারে না! নইলে কবেই মাত্র একটি স্পষ্ট কথা বলে শীতাংশুদার উৎসাহ থামিয়ে দিতে পারতো নরেন।

বললেই তো পারতো নরেন; বললো না কেন? আমি যূথিকাকে ভালবাসি, সুতরাং, আপনি বৃথা আর লতিকার গান শোনাবার জন্য আমাকে ডাকবেন না; একথাটাও শীতাংশু ডাক্তারকে বলে দিলে এমন কিছু অভদ্রতা হতো না।

কল্পনা করতে পারে যূথিকা, নরেনের সঙ্গে যূথিকার বিয়ে হয়ে যাবার পর

শুধু লতিকা নয়, এই গিরিডির আরও অনেকে যূথিকার ভাগ্যকে হিংসে না করে পারবে না। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে একহাজার টাকা মাইনের সরকারী সার্ভিস করে যে নরেন, সে নরেনের পক্ষে যূথিকার চেয়ে ঢের ঢের বেশি শিক্ষিতা এবং সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করবার অসুবিধা ছিল না। কিন্তু শুধু ভালবাসার সৌভাগ্যে যূথিকা ঘোষই যে নরেনের জীবনের সঙ্গিনী হয়ে যাবে। যদি হিংসে করতে হয়, তবে যূথিকার এই ভালবাসাকেই হিংসে করুক না সবাই।

কিন্তু যূথিকা যদি পাটনা যেতে চায়, তবে নিয়ে যাবে কে? শুনতে পায় যূথিকা, বাবা আর মা বাইরের ঘরে বসে এই সমস্যার কথাও আলোচনা করছেন। বলাইবাবু বাতের ব্যথায় আবার পঙ্গু হয়ে গিয়ে উদাসীনের ভাবনাগুলিকে সমস্যায় ফেলেছেন।

—যূথি। চেঁচিয়ে ডাক দেন চারুবাবু।

বাইরের ঘরের দরজার কাছে যূথিকা এসে দাঁড়াতেই গম্ভীর স্বরে আদেশ করেন কুসুম ঘোষ—তোমাকে এখনই, আজ এই সন্ধ্যাতেই পাটনা রওনা হতে হবে।

চারুবাবু—আমি এখনি সেই লোকটাকে খবর পাঠাচ্ছি···কি যেন তার নাম?

হেসে ফেলে যূথিকা—হিমাদ্রিবাবু।

হ্যাঁ, ডাক শুনে চলে আসতে দেরি করেনি হিমু। এবং যূথিকাকে সঙ্গে নিয়ে পাটনা রওনা হয়ে যেতে একবিন্দু আপত্তিও করেনি।

গিডির স্টেশনের ভিড় আর হল্লা পিছনে ফেলে রেখে দিয়ে ট্রেনটা যখন আবার রাঙা মাটির মাঠের উপর দিয়ে, দু'পাশের যত সবুজ শোভার ভিতর দিয়ে হু হু করে ছুটে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন যূথিকা ঘোষের মুখে যেন একটা প্রাণখোলা হাসির এক ঝলক তরল আভা ছড়িয়ে পড়ে।—হিমাদ্রি যে আমাকে চিনতেই পারছো না!

হিমুও হাসে—তুমি জান, চিনতে পেরেছি কি না।

যূথিকা—তবে এ রকম না চেনবার ভঙ্গী ক'রে গম্ভীর হয়ে আছ কেন?

হিমু—তোমার গম্ভীরতা দেখে।

যূথিকা—আমি গম্ভীর?

হিমু—হ্যাঁ, এতক্ষণ খুব বেশি গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিলে।

যূথিকা—হ্যাঁ, সত্যি হিমাদ্রি ; মানুষের ইতরতার রকম দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি।

হিমু—ওসব কথা ছেড়ে দাও। ওসব কথা যত ভাববে, তত নিজেরই ক্ষতি হবে।

যূথিকা উৎফুল্ল হয়ে বলে—ঠিক কথা বলেছো হিমাদ্রি, এরকম পরামর্শের জন্যেই যে মানুষের একটা বন্ধুমানুষ দরকার।

কিন্তু আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে আনমনার মত চোখ নিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে যূথিকা ঘোষ। মানুষের ইতরতার কথা না হোক, অন্য কোন কথা নিশ্চয় ভাবছে। হিমু প্রশ্ন করে ; এই বোধহয় হিমু নিজের থেকে যেচে, কে জানে কোন্ সাহসের ছোঁয়া পেয়ে, প্রশ্ন করে হিমু—আবার কি ভাবতে আরম্ভ করলে ;

খিল খিল করে হেসে ওঠে যূথিকা।—যা ভাবছিলাম, সেকথা তোমাকে বলা উচিত কিনা তাই ভাবছি।

—ভেবে দেখ। হিমুও হেসে হেসে জবাব দেয়।

যূথিকা—কলেজ খোলেনি, তবু কেন পাটনা যাচ্ছি বলতে পার ?

হিমু—যদি বলতে পারতাম, তবে বলেই ফেলতাম। তোমাকে আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হতো না।

যূথিকা—অভিসারে যাচ্ছি।

হিমু মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকায়।

যূথিকা—শুনে লজ্জা পেলে তো হিমাদ্রি ?

হিমু—না। কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা এই যে, তোমার কথা শুনে আমি যেন লজ্জা পাই। আসলে কিন্তু নিজে লজ্জা পেয়েছ।

যূথিকা—লজ্জা পাওয়ারই কথা বটে। বোম্বাই থেকে নরেন আর দু'এক দিনের মধ্যে পাটনা পৌঁছে যাবে। নরেন হলো আমার…।

হিমু কি ?

যূথিকা—আঃ, যেন একেবারে খোকাটি! স্পষ্ট ক'রে না বললে কিছু বুঝতেই পারে না।

হিমু হেসে ফেলে—এসব কথা যে শুধু মেয়ে-বন্ধুর কাছে বলতে হয় যূথিকা।

যূথিকা—তোমার মত পুরুষ-বন্ধু মেয়ে-বন্ধুর চেয়েও বেশি মেয়ে।

হিমু—এরকম প্রশংসা আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।

যূথিকা—সত্যি হিমাদ্রি, নরেন মানুষটি সত্যি ভালো। তোমার চেয়ে

বয়স একটু বেশিই হবে, তবে ত্রিশের বেশি নয়; কিন্তু একহাজার টাকা মাইনের সরকারী সার্ভিসে আছে। কথাবার্তায় যদিও বেশ একটু অহঙ্কার আছে, কিন্তু সে অহঙ্কার মানিয়ে যায়। কেন মানাবে না বল? বেশ বড় অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, বেশ শিক্ষিত, তার ওপর চাকরিতেও এরকম ভাল কেরিয়ার। আমার মত মেয়ে ওর চোখেই পড়বার কথা নয়। কিন্তু…।

দুটি শান্ত-চোখের দৃষ্টি আরও অলস ক'রে দিয়ে, সুন্দর একটি গল্প শোনবার আনন্দে যেন কৃতার্থ হয়ে বসে থাকে হিমু দত্ত। নস্যির ডিবে ঠুকতেও ভুলে যায়।

যুথিকা- কিন্তু ভালবাসায় সাত খুন মাপ হয়। আমারও সেই সৌভাগ্য হয়েছে হিমাদ্রি। নরেন আমাকে বিয়ে করবার আশায় রয়েছে।

যুথিকার গল্পটা বোধহয় নিজের থেকেই থামতো না, যদি জগদীশপুরেতে এতগুলি ভদ্রলোক এবং তাঁদের সঙ্গে একটি নববর ও একটি নববধূ এই কামরাতে না উঠতো।

মধুপুরেতে গাড়ি বদল করতে অনেকখানি সময় হুড়োহুড়ি আর ছুটোছুটি করে পার হ'য়ে গেল। পাটনার ট্রেনে উঠে সীটের এক কোণে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে উপন্যাস পড়তে পড়তে অনেক রাত ক'রে দেবার পরও যখন যুথিকার চোখে ঘুমের আবেশ দেখা দিল না, তখন ডাক দেয় যুথিকা— হিমাদ্রি।

সামনের সীট থেকে উঠে এসে হিমাদ্রি বলে—বিছানাটা পেতে দিই?

যুথিকা—হ্যাঁ।

বিছানা পেতে দেয় হিমু।

যুথিকা বলে—নরেন আমার উপর মাঝে মাঝে রাগ করে মনে হয়।

হিমু—তুমি কি এখনও জেগে বসে থাকবে?

যুথিকা—আঃ, হ্যাঁ, তুমি একটু জেগে থাক না কেন? একটু সরে বসে হিমুকে পাশে বসবার জন্য জায়গা করে দেয় যুথিকা।

হিমুর বসবার রকম দেখে আবার বিরক্ত হয়ে বলে যুথিকা—গল্প চেঁচিয়ে বলা যায় না, এটুকুও বুঝতে পার না কেন? আর একটু কাছে সরে এস।

উপন্যাসটাকে হাতে তুলে নিয়ে হিমাদ্রির কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুথিকা হেসে ওঠে—এটাতে ধানাই পানাই ক'রে কত কিছুই না বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ছাই হয়েছে! ওসবের চেয়ে অনেক অনেক মিষ্টি ব্যাপার আমার আর নরেনের মধ্যে হয়ে গিয়েছে। নরেনের সঙ্গে একবার আমার তর্ক হয়েছিল, কে বেশি ভালবাসে। আমি জোর করে বলেছিলাম, আমি বেশি ভালবাসি।

হেরে গিয়েছিল নরেন, শেষে আমার কথাটাকেই সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

একটা স্টেশনে ট্রেনটা থেমেছে। স্টেশনে অন্ধকার বেশি, আলো কম, এবং মানুষের গলার আওয়াজের চেয়ে ঝিঁঝিঁর ডাকের জোর বেশি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যূথিকা বলে—এটা বোধহয় সেই স্টেশন, যেখানে চা আনবার নাম ক'রে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে।

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—আমার তাই মনে হয়েছিল। যাকগে,...নরেন এবার দেড় মাসের ছুটি নিয়েছে কেন বলতে পার?

—না, এটা সেই স্টেশনটা নয়। নস্যির ডিবে ঠুকে এক টিপ নস্যি বার করে হিমু। যূথিকার প্রশ্নের উত্তর দিতে বোধহয় ভুলে যায়।

যূথিকা বলে—এবার একেবারে তৈরী হয়েই আসছেন বলে মনে হচ্ছে। বিয়ের শাঁখের শব্দ না শুনে আর ছাড়বেন না। মামী চিঠিতে যা লিখেছেন, সেটাই ঠিক। মনে হচ্ছে এবার সাঙ্গ হলো ধুলোখেলা।

যূথিকার চোখের তারা ঝকঝক করে। এবং দেখে মনে হয়, হ্যাঁ, আর ধুলোখেলা নয়, যূথিকার জীবন এইবার মুক্তোখেলার আশ্বাস পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। কল্পনার তারই ছবি দেখছে যূথিকা।

যূথিকা বলে—কে জানে বোম্বাই শহরটা দেখতে কেমন? যেমনই হোক, নরেনের সঙ্গে যেখানে থাকবো সেখানেই তো আমার স্বর্গ।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারা যায় মাঠ জুড়ে সাদা কাশের বন ছড়িয়ে রয়েছে। খুব জোরে সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে ট্রেনটা বাতাস কাটছে। যূথিকা বলে—ক'টা বাজলো হিমাদ্রি? তোমার ঘুম পায়নি?

—তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় হিমাদ্রি, এবং সামনের সীটের উপর গিয়ে বসে।

পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুধু মামী দাঁড়িয়ে আছেন। যূথিকার চেনা মানুষ বলতে আর কেউ নেই। ট্রেন থেকে নেমে মামীর কাছে এগিয়ে যায় যূথিকা। কুলির মাথায় যূথিকার জিনিসপত্র চাপিয়ে দিয়ে এক দিকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে হিমাদ্রি।

মামী বলেন—সেই ছেলেটি আবার এসেছে দেখছি।

যূথিকা—হ্যাঁ, বলাইবাবু বাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছেন।

মামী—ছেলেটি বোধহয় কিছু বলতে চায়।

যুথিকা—ও হ্যাঁ।

হিমুর কাছে এগিয়ে এসে যুথিকা হাতের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে।

হিমু বলে—টাকা দরকার হবে না।

যুথিকা—তার মানে? তুমি গিরিডি ফিরে যাবে না?

হিমু হাসে—ফিরবো বৈকি; কিন্তু ট্রেনভাড়ার দরকার নেই।

যুথিকা—হেঁয়ালি করো না হিমাদ্রি, স্পষ্ট ক'রে বল।

হিমু—আজই ফিরবো। কথা আছে, এখান থেকে লতিকাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। লতিকার বাবা গণেশবাবু বলে দিয়েছেন, গিরিডি ফিরে যাবার খরচ তিনিই দেবেন।

মামীর কানে হিমুর কথাগুলি পৌঁছেছে। শুনেই প্রসন্ন হয়ে ওঠে মামীর মুখটা। লতিকা গিরিডি চলে যাচ্ছে, তার মানে পাটনাতে থাকবার সাহস আর হচ্ছে না। বুঝে ফেলেছে শীতাংশু ডাক্তার, নরেনকে নেমন্তন্ন ক'রে লাভ নেই। এতদিনে আক্কেলের উদয় হয়েছে, এবং হার মেনে হতাশ হয়ে নরেনকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার সব মতলব ছাড়তে হয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই মামীর। নরেন পাটনাতে আসছে জেনেও লতিকা যদি পাটনা থেকে চলে যায়, তবে তার কি অর্থ হতে পারে? হয় নরেন চিঠি দিয়ে নয় নরেনের মা নিজেই শীতাংশুকে ডেকে নিয়ে, লতিকার ফটো ফিরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, না, আমাদের রাজী হওয়া সম্ভব নয়।

এত তাড়াতাড়ি এরকম একটা সুসংবাদ শুনতে পাবেন, আশা করতে পারেননি মামী। আগে শুনতে পেলে যুথিকাকে এত তাড়াতাড়ি গিরিডি থেকে পাটনাতে চলে আসবার জন্য চিঠি দিতেন না।

শুনতে পেলেন মামী, ছেলেটিরই মুখের দিকে তাকিয়ে যুথিকা যেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করছে—লতিকার এখন গিরিডি যাবার দরকার হলো কেন?

একটা আকাট আহাম্মক মেয়ে! কাকে কি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তাও বুঝতে শিখলো না, অথচ বয়স তো-তেইশ পার হয়ে প্রায় চব্বিশে গিয়ে পৌঁছেছে। এ-কথা এই গোবেচারা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ কি? তা ছাড়া, এত আশ্চর্যই বা হয় কেন যুথিকা? লতিকা কেন গিরিডি চলে যাচ্ছে, এটুকু আন্দাজ করবার মত বুদ্ধি নেই কি মেয়েটার? খবরটা শুনে ওরই তো এখন সবচেয়ে বেশি হেসে ওঠা উচিত।

কি-যেন বলতে গিয়ে ব্যস্তভাবে যুথিকা আর হিমুর প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে

যেয়েই থমকে দাঁড়ান মামী। যুথিকার মুখের দিকে চোখ পড়তেই আশ্চর্য হয়ে যান। এ আবার কি রকমের কাণ্ড? মেয়েটার চোখ দু'টো জলছে যেন; ছেলেটার মুখের দিকে যেন বিষদৃষ্টি হেনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুথিকা। ছেলেটি যেন ভয়ানক একটা বিশ্বাসঘাতক, একটা নিষ্ঠুর অপরাধী, যুথিকার জীবনের একটা সুখ-স্বপ্নকে যেন আচম্‌কা আঘাত দিয়ে দিয়ে ধুলোর উপর লুটিয়ে মিথ্যে ক'রে দিয়ে···কি যেন ঐ ছেলেটার নাম, হ্যাঁ, হিমাদ্রি।

মামীর চোখে একটা সন্দেহের বেদনা থমথম করে। কে জানে কি ব্যাপার? যেখানে কোন সমস্যা আশঙ্কা করতে পারেনি কেউ, সেখানে সত্যিই বিশ্রী একটা সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠেনি তো? যুথিকার বোকা মনটা কোন ভুল ক'রে ফেলেনি তো? নইলে এত বড় একটা মেয়ের পক্ষে এত বড় একটা ছেলের মুখের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকবার আর কি অর্থ হতে পারে?

মামী যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, যেন দেখতেই পাচ্ছে না যুথিকা। হিমুর মুখের দিকে জ্বালাভরা দুটো অপলক চোখ তুলে যুথিকা বলে—তোমার লজ্জা করছে না?

হিমু হয়তো যুথিকার প্রশ্নের উত্তর দিত, কিন্তু মামীকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করে হিমু; এবং স্পষ্ট ক'রে উত্তর দিতে পারে না বলেই অস্পষ্ট স্বরের একটা প্রতিবাদ হিমুর ঠোঁটের কাঁপুনিতে শুধু বিড়বিড় করে।

যুথিকা বলে—তুমি এখন গিরিডি ফিরে যাও হিমাদ্রি। লতিকাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

হিমু হাসতে চেষ্টা করে—সে কি কথা? আমি যে গণেশবাবুকে কথা দিয়ে এসেছি।

যুথিকা—কথা দিতে লজ্জা করেনি একটুও?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন মামী; মামীর কপালের রেখা কুঁচকে ওঠে।

যুথিকা বলে—কি? কথা বলছো না কেন হিমাদ্রি?

হিমু—কি জানতে চাইছো, বল।

যুথিকা—তুমি লতিকাকে গিরিডি নিয়ে যাবে না, আমাকে স্পষ্ট ক'রে কথা দাও।

হিমু—অসম্ভব।

যুথিকা—কি ?

হিমু—লতিকাকে গিরিডি নিয়ে যেতেই হবে। মানুষকে কথা দিয়ে মিছিমিছি কথার খেলাপ করতে পারবো না।

প্ল্যাটফর্মের ভিড় শত শত মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে রয়েছে পৃথিবীর একটা ব্যবস্থা ; শুধু চলে যাবার টানে অস্থির ও চঞ্চল একটা সংসারের একটি টুকরো। এখানে থমকে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য কেউ আসে না। কিন্তু চারু ঘোষের মেয়ে যুথিকা ঘোষ সত্যিই যেন চিরকালের মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং সামনে বা পিছনে কোন দিকে এগিয়ে যাবার সাধ্যি নেই।

চেঁচিয়ে ওঠে যুথিকা—তাহলে আমিও গিরিডি ফিরে যাব। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

মামী ডাকেন—যুথিকা ?

চমকে ওঠে যুথিকা! আর, মামীকে কাছে দেখতে পেয়েই আতঙ্কিতের মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে, তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে।

মামী বলেন – অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, কুলিটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। চল এবার।

যুথিকা হাসে—হ্যাঁ, যাবই তো। এখানে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবো কে বলেছে ?

মামী—তোমার কাজ শেষ হয়েছে তো ?

যুথিকা—কাজ ? কিসের কাজ ?

মামী—ওকে যা বলবার ছিল, বলা হয়েছে ?

যুথিকা—ভ্রূকুটি করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—ওকে আবার কি বলবার ছিল ? কিছু না, চল।

পাটনাতে এসেছে নরেন ; এবং লতিকাও পাটনাতে নেই সুতরাং যুথিকার মনের ভাবনায় এক ফোঁটা উদ্বেগও নেই। তা ছাড়া, মামীও খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, এবার আর শীতাংশু ডাক্তার নরেনকে চা-এর নেমন্তন্ন করবার চেষ্টা করেনি। এবং একথাও সত্যি, নরেনের মা লতিকার ফটো ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে যে চিঠিটা দিয়েছেন, তাতে শুধু ফটো ফেরত পাঠালাম ছাড়া আর কোন কথা লেখেন নি। শীতাংশু ডাক্তারের পাশের বাড়ির সুব্রতবাবুর স্ত্রী একদিন বেড়াতে এসে মামীকে এই খবরও জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

গর্দানিবাগের মাঠের সেই পলাশে এখন আর ফোটা ফুলের শোভা রক্তময় হয়ে হাসে না। নতুন বর্ষার জলে মাঠের ঘাস সবুজ হয়ে উঠেছে। এই মাঠের সবুজের উপর নরেনের পাশে পাশে হেঁটে প্রায় রোজই সকালে আর সন্ধ্যায় বেড়িয়েছে যূথিকা। নরেনকে আর নিমন্ত্রণ ক'রে ডাকতে হয় না। নিজের প্রাণের আবেগে নরেন নিজেই রোজ এসে যূথিকার কাছে দাঁড়ায়। চা-এর জন্য নিজেই তাগিদ দেয় নরেন। আর মাঝে মাঝে, মামী কিংবা অন্য কেউ কাছে না থাকলে, যূথিকার কানের কাছে নরেনই হেসে হেসে ফিসফিস করে—তোমাকেই কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে হয়।

—কেন?

—তোমার ভালবাসারই জয় হলো।

—তা হলো বৈকি!

—অদ্ভুত?

—কি?

—তোমার ভালবাসার জেদ।

—হ্যাঁ, অদ্ভুত জেদ বৈকি! চার বছর ধরে বলতে গেলে তপস্যা করতে হয়েছে।

নরেন হাসে—তপস্যার সিদ্ধিও হয়েছে।

নরেনের দু'চোখের গর্বময় উৎফুল্লতার দিকে তাকিয়ে যূথিকা বলে—হ্যাঁ, চার বছর অপেক্ষায় থেকে থেকে তারপর যখন তুমি আমাকেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছো, তখন স্বীকার করতেই হয়।

—কি?

—সিদ্ধিলাভ করে'ছ। আমার ভালবাসাই জয়ী হয়েছে।

চার পাতা চিঠি লিখে কণিকা মামী গিরিডির উদাসীনের সব উদ্বেগ দূর করে দিয়েছেন। রাজি হয়েছে নরেন। বিয়ের দিন ঠিক করবার কথাও বলেছে। নরেনের মা বলেছেন, পয়লা অঘ্রান খুব ভাল শুভদিন।

মামীর প্রাণটাও যেন হাঁপ ছেড়ে অনুভব করে তাঁরও একটা জেদের তপস্যা সফল হয়েছে। নরেনের মত ছেলের সঙ্গে যূথিকার মত মেয়ে বিয়ে ঘটিয়ে দেওয়া চারটিখানি বুদ্ধি ও চেষ্টায় সম্ভব হয় না। গিরিডি থেকে যূথিকার মা তিন পাতা চিঠি লিখে মামীমাকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন, তোমার চেষ্টা আর বুদ্ধির জোরেই মেয়েটার ভাগ্য প্রসন্ন হতে পেরেছে কণিকা। নরেনের মাকে জানিয়ে দিও, আমরা পয়লা অঘ্রানেই রাজি।

মামীর চিন্তায় শুধু একটা অস্বস্তি মাঝে মাঝে ছটফট ক'রে ওঠে। যূথিকা এত বেশি ঘুমোয় কেন? জেগে থাকে যখন, তখনও যেন অদ্ভুত একটা কুঁড়েমির জ্বরে গুটিসুটি হয়ে এঘর কিংবা ওঘরের বিছনার এক কোণে বসে হাই তোলে আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়। যে-কথা কোনদিন যূথিকাকে বলতে হয়নি, সেই কথাই আজকাল বলতে হয়, একটু ভাল ক'রে সাজ করবার কথা। ভাল করে সাজবার নিয়মটাই যেন ভুলে গিয়েছে যূথিকা। কিন্তু খুব ভাল করেই জানে যূথিকা, সন্ধ্যা হবার আগেই নরেন এসে পড়বে। তবু, বিকেল হয়ে এলেও যূথিকার মনে পড়ে না যে, এইবার তাড়াতাড়ি সেজে নেওয়া উচিত। মামী মনে করিয়ে দেন, তবে বুঝতে পারে, এবং তারপরেই ব্যস্তভাবে সাত-তাড়াতাড়ি একটা এলোমেলো সাজ করে। আর, অরুণকে কোলে নিয়ে যত আজে-বাজে কথা বলতে থাকে। অরুণও টানা-ছেঁড়া ক'রে যূথিকার সাজ আর খোঁপাটাকে আরও এলোমেলো ক'রে দেয়!

নরেনের সঙ্গে বেড়িয়ে, বড় জোর এক মাইল পথ হেঁটে, আবার যখন ঘরে ফিরে আসে যূথিকা, তখন দেখে মনে হয়, যেন দু'দিন না খেয়ে একশো মাইল হেঁটে একেবারে ক্লান্ত ও আধমরা হয়ে গিয়েছে যূথিকার চেহারাটা। এ আবার কোন্ ধরনের মানসিক ব্যধি? মামীর চোখ দুটো আবার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

শুধু মামী কেন, যূথিকাও যে যূথিকাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। ধুলোখেলার পালা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, হাতের কাছে মুক্তা এসে গিয়েছে, তবে আবার জীবনের অহঙ্কারটা এমন ক'রে মুসড়ে পড়ে কেন? জিত হলো, তবুও হেরে গিয়েছি বলে একটা সন্দেহের অস্বস্তি মনের ভিতরে কাঁটার মত খচখচ করে কেন?

কে হারিয়ে দিল? লতিকা? ভাবতে গিয়ে কপালের দু'পাশে একটা জ্বালার কামড় জ্বলতে থাকে যেন। মামী বুঝবেন কি ছাই? মামী কল্পনাও করতে পারেন না. পাটনা থেকে লতিকার গিরিডি যাবার ট্রেনযাত্রা যে লতিকার জীবনের একটা জয়যাত্রা। হিমাদ্রি চা এনে দিয়েছে, সেই চা হেসে হেসে খেয়েছে লতিকা। লতিকার ঘুম পেয়েছে, আর ব্যস্ত হয়ে বাঙ্কের উপর থেকে বেডিং নামিয়ে লতিকার জন্য বিছানা পেতে দিয়েছে হিমাদ্রি। লতিকা চালাক; কি ভয়ানক চালাক, সেটা মামীর ধারণাতেই নেই। নিরালা কামরার সীটের উপর পাতা বিছানায় টান হয়ে শুয়েছে লতিকা, আর হিমাদ্রিকে মাথার কাছে বসিয়ে রেখে সারা রাত গল্প করেছে!

আর হিমাদ্রি? হ্যাঁ লতিকাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? হিমাদ্রিই যে যত নষ্টের মূল। কি-ভয়ানক চালাক বোকা! চট্ ক'রে কত তাড়াতাড়ি জীবনের ট্রেনযাত্রার এক নতুন বান্ধবী জোগাড় করে নিল। পয়লা অঘ্রানের পর আর ক'টা দিনই বা গিরিডি ও পাটনার মুখ দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে? বড় জোর দশটা দিন। নরেনের ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই নরেনের সঙ্গে যূথিকাকে বোম্বাই চলে যেতে হবে। তারপর? তারপর আর কি? লতিকা আর হিমাদ্রি অনন্তকাল ধরে পাটনা থেকে গিরিডি আর গিরিডি থেকে পাটনা যাওয়া-আসা ক'রে চমৎকার ট্রেনযাত্রার পুণ্যে ধন্য হয়ে থাকবে।

গিরিডি থেকে চিঠি আসে। কিন্তু সে চিঠিতে বিশ্বের যত খবর থাকুক না কেন, শুধু একটি খবরের কোন উল্লেখ থাকে না। হিমাদ্রি এখন কোথায়? লতিকা সত্যিই গিরিডি ফিরেছে তো? ফিরেছে নিশ্চয়। যাবে আর কোথায়? পাটনা ছেড়ে দিয়ে এখন গিরিডিতে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে লতিকা। এবং আশ্চর্য নয়, গনেশবাবুর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় চা খেতেও আসছে হিমাদ্রি।

পাটনা নয়, গিরিডিই যে যূথিকার জীবনের উদ্বেগ হয়ে উঠলো। কোনদিন কল্পনাতেও সন্দেহ করতে পারেনি, কোন মুহূর্তেও একটু সাবধান হয়ে কল্পনা করতে পারেনি যূথিকা, লতিকার মত মেয়ে যূথিকাকে এভাবে মিথ্যা জয়ের কাছে ফেলে রেখে দিয়ে নিজে একটা খাঁটি জয়ের কাছে চলে যেতে পারে। পয়লা অঘ্রান আসতে দেরি আছে। তবে এখন আর পাটনাতে থাকবারই বা কি দরকার? এখন গিরিডি চলে গেলেই তো হয়।

গিরিডির চিঠি আসতেও আর বেশি দেরি হয়নি। মা লিখেছেন, যূথিকার এখন গিরিডি চলে আসাই উচিত মনে করি ক থিকাকে আনবার জন্য বলাইবাবুকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি; তুমি একেবারে বরযাত্রী হয়েই এস। বর আনতে এখান থেকে যাবার লোক কেউ নেই। তোমার আর অরুণের বাবা দু'জনের ওপর বর আনবার সব দায়িত্ব রইল।

গিরিডির চিঠিটা যূথিকাকেও পড়তে দিলেন মামী। চিঠি পড়েই কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে যূথিকা তারপরেই বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—বলাইবাবুকে পাঠিয়ে লাভ কি? বাতে পঙ্গু একটা মানুষ।

মামী—তবে কি একাই গিরিডি যেতে চাও

যূথিকা—একা যাব কেন? হিমাদ্রি কি নেই?

অপলক চোখ তুলে যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবেন মামী

মামীর দু'চোখের মধ্যে যেন একটা ভয়ের ছায়া ছমছম করে! আস্তে আস্তে এবং ভয়ে ভয়ে বলেন মামী—বারবার হিমাদ্রিকে বিরক্ত করাটা ভাল দেখায় না।

যুথিকা চেঁচিয়ে ওঠে।—হিমাদ্রি যে বিরক্ত হয় না, সেটা মা খুব ভালই জানে।

মামী—আমার মনে হয়, হিমাদ্রিকে না পাঠালেই ভাল হয়।

যুথিকা—বেশ। তাহলে বলাইবাবুকেও আসতে বারণ করে দাও।

মামী—তার মানে?

যুথিকা হেসে ফেলে—আমি একাই গিরিডি যাব।

দুলে দুলে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢোকে ছোট অরুণ। অরুণের হাতে একটা চিঠি। অরুণ বলে—একটা লোক।

চিঠি খুলে দু'লাইন পড়তেই আশ্চর্য হয়ে যান মামী, এবং বাইরের বারান্দার দিকে উঁকি দিয়ে তাকান।

যুথিকা—কি ব্যাপার?

মামী বলেন—হিমাদ্রি এসেছে।

ঝক ক'রে হেসে ওঠে যুথিকার চোখ। শাড়ির আঁচলটাকে টেনে গায়ে জড়িয়ে ব্যস্তভাবে দাঁড়ায় যুথিকা।—তার মানে?

মামী বলেন-কুসুমাদি লিখেছেন, বলাইবাবুর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। হিমুকেই পাঠালাম।

মামীর দুশ্চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে মামা বলেন—না, আমার মনে হয়, সে রকম কোন ভয়ের কারণ নেই।

মামী—তবু, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

মামা—ভদ্রলোকের মেয়ে মাথা খারাপ ক'রে বাজে লোকের সঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে, এরকম কেস অবশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু বেচারা যুথিকাকে এরকম মাথা খারাপ মেয়ে মনে করতে পারছি না।

মামী—কিন্তু হিমাদ্রি নামে এই ছেলেটার মনে কি আছে, সেটা কি ক'রে বুঝবে বল?

মামা কিছুক্ষণ ভাবেন! তারপর বলেন—আচ্ছা, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

মামা—কি ব্যবস্থা?

মামা—আমি এখনি গিয়ে ভোলাকে···রেলওয়ে পুলিশের ডি-এস-পি ভোলাকে চেন তো ?

মামী—খুব চিনি।

মামা ভোলাকে বলে দিচ্ছি, যেন ট্রেনের গার্ডকে প্রাইভেটলি বলে রাখে ভোলা, ওদের দু'জনের উপর একটু ওয়াচ রাখবার জন্য। আমি চললাম··· ওদের তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দাও।

রওনা হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি ক'রয়ে দিলেন মামী, অর্থাৎ টেলিফোনে নরেনকে একটা খবর দিতে যতটুকু সময় লাগলো, তার বেশি নয়; এবং স্টেশনে পৌছবার পর খুশি হয়ে দেখলেন মামী, যাদের আসবার কথা ছিল, তারা সবাই এসেছে। মামা এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে নরেন। এবং, কি আশ্চর্য, শীতাংশু ডাক্তারও এসেছে।

সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য, শীতাংশু ডাক্তার হেসে হেসে নরেনের সঙ্গে গল্প করছে! এমন কি মামাকেও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলে শীতাংশু—পয়লা অঘ্রানই বোধহয় বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে ?

মামা গম্ভীর হয়ে বলেন—বোধহয়।

শীতাংশু বলে—বড় ভালো হলো।

শীতাংশুর কথা শুনে মামীর মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে যায়। কি রকম ঢং ক'রে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে শীতাংশু, যেন ছোট ভাইটির বিয়ের খবর শুনে আহ্লাদে মজে গিয়েছে। কিন্তু মামীই জানেন, এই শীতাংশুই এই কটা বছর এই বিয়ের সম্ভাবনাকে ভাংচি দিয়ে মিথ্যে ক'রে দেবার জন্য কি চেষ্টাই না ক'রে এসেছে। তবে আবার কিসের আশায়, কোন্ মতলবের উৎসাহে এখানে এসেছে শীতাংশু? মামী ডাকেন—এদিকে এসে একটা কথা শুনে যাও নরেন।

শীতাংশুর কপট শুভেচ্ছার স্পর্শ থেকে নরেনকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পাটনার প্রচণ্ড গরমের জন্য দুঃখ ক'রে অনেক কথা বললেন মামী —কার্তিক শেষ হতে চললো, তবু দেখছো, গরমের গুমোট ছাড়ছে না।

ট্রেনে উঠবার জন্য যূথিকার ব্যস্ততা দেখে মনে মনে রাগ করেন মামী। নরেনের কাছ থেকে অনেকক্ষণ হলো ইচ্ছে করেই সরে গিয়েছেন মামী। এই তো, এইবার একটা সুযোগ পেলি বোকা মেয়ে। নরেনের কাছে এসে একবার দাঁড়া, দু'টো কথা বল। কিন্তু কোথায় যূথিকা! কাণ্ডজ্ঞানহীন যূথিকা তখন ট্রেনের কামরার ভিতরে ঢুকে হিমাদ্রির সঙ্গে কী অদ্ভুত মুখরতা

আর হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু মনের অভিযোগ মনেই চেপে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন মামী।

—আমি কিন্তু জানালার ধারে বসবো হিমাদ্রি! হাত-ব্যাগটাকে সীটের নীচে রেখে দাও হিমাদ্রি।

বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আর কি বিশ্রী চেঁচিয়ে কথা বলছে মেয়েটা! যূথিকার কাছে এগিয়ে এসে মামী ফিসফিস ক'রে বলেন—আস্তে কথা বল যূথিকা।

ট্রেন ছাড়লো, এবং যূথিকা যেন এই ক্ষণের ব্যস্ততার ভুলের মধ্যে বিমনা হয়ে থাকা মনটাকে চিনতে পেরে চমকে ওঠে। ভুল হয়েছে, ভয়ানক বিশ্রী ভুল। নরেনের সঙ্গে সামান্য একটু চোখে চোখে কথা বলে নিতেও ভুলে গিয়েছে। এই ভুলটুকু শুধরে নেবার জন্য জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নরেনের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।

হাসিভরা মুখটাকে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে যূথিকা, কারণ প্ল্যাটফর্মের কোন মুখ আর চেনা যায় না! ঝাপসা হয়ে গিয়েছে পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম।

এইবার চোখের কাছে যাকে খুব স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায় যূথিকা, তারই শান্ত মুখের চেহারাটাকে সহ্য করতে গিয়ে ছটফট ক'রে ওঠে।

যূথিকা বলে—কেমন আছ হিমাদ্রি?

হিমু হাসে—ভাল আছি।

যূথিকা—লতিকা ভাল আছে?

হিমু—জানি না। ভাল থাকলেই ভাল।

যূথিকা—খোঁজ রাখ না?

হিমু—খোঁজ রাখা আমার অভ্যাস নয়।

যূথিকা—কিন্তু লতিকার তো সে অভ্যাসটি আছে।

হিমু—জানি না।

যূথিকা—কেন? লতিকা খোঁজ করেনি?

হিমু—কার খোঁজ?

যূথিকা—তোমার।

হিমু—না।

যূথিকা—আশ্চর্যের ব্যাপার।

হিমু—কিসের আশ্চর্য?

যুথিকা—এত গরজ ক'রে পাটনা থেকে গিরিডি নিয়ে গেলে যাকে, তার সঙ্গে সামান্য একটু বন্ধুত্বও হলো না।

হিমু—না।

যুথিকা—তোমার দুর্ভাগ্য।

হিমু—একটুও না।

যুথিকা—কেন? লতিকা দেখতে সুন্দর নয়?

হিমু—সুন্দর বৈকি!

যুথিকা—আমার চেয়েও সুন্দর নিশ্চয়?

হিমু—লোকে তো তাই বলে।

যুথিকা—কে বলে?

হিমু—তোমার মা বলছিলেন।

যুথিকা—কার কাছে?

হিমু—তোমার বাবার কাছে।

যুথিকা—তোমার সামনেই?

হিমু—হ্যাঁ।

যুথিকা—আর তুমিও বেশ দু'কান ভরে কথাটা শুনে নিলে?

হিমু—হ্যাঁ, কানে শুনতে পাই যখন, তখন না শুনে পারবো কেন?

যুথিকা—কিন্তু কথাটা এত মনে ক'রে রাখতে বলেছে কে? মনে হচ্ছে, কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পশেছে।

হিমু—না।

যুথিকা—জোর করে না বললে কি হবে?

হিমু—কত কথাই তো শুনতে পাই, কিন্তু মরমে পশে আর কোথায়?

যুথিকা—মরম নেই তাহলে।

হিমু—হবে।

যুথিকা—আমার তো তাই মনে হয়।

হিমু—বেশ ভাল মন তোমার।

হিমু দত্তের শান্ত চোখ দুটোও যেন উদাসীনের মেয়ে যুথিকার মুখের দিকে অনর্থক বাচালতায় বিরক্ত হয়ে, এবং একটু তপ্ত হয়ে যুথিকার মুখের দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে হিমু দত্তের চোখ। বিনা দোষের আসামী ফাঁসির হুকুম শুনেও বোধহয় এমন ভয় পাবে না। দেখতে পেয়েছ হিমু, চারু ঘোষের মেয়ের চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে।

এমন ভয়ানক বিপন্নতা, এত কঠোর শাস্তি, জীবনে কোনদিন সহ্য করবার দুর্ভাগ্য হয়নি হিমু দত্তের ; এর চেয়ে যুথিকা ঘোষের চোখের সেই সব ভয়ানক অবহেলার আর কৌতুকের হাসিতে যে অনেক বেশি করুণা ছিল।

হিমু বলে—আমাকে মাপ কর যুথিকা, কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার কি অপরাধ হলো।

চোখ দুটোকে এক মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে শুকনো ক'রে ফেলেছে যুথিকা।

যুথিকা বলে—যাক গে, তুমি কিছু মনে করো না হিমাদ্রি। তোমাকে সত্যিই অপরাধী বলছি না।

হাঁপ ছাড়ে, বুকের ভিতরের একটা ভয়াতুর বেদনার গুমোট যেন নিঃশ্বাসের জোরে ভেঙে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে হিমু। নিশ্চিন্ত ভিবে ঠুকে ঠুকে হাসতে চেষ্টা করে। গিরিডিতে এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সকালবেলা রোদ ওঠবার পরেও উশ্রীর উপর কুয়াশা একেবারে জমাট হয়ে থাকে।

যুথিকাও হাসে—সত্যি কথা বলবে ?

হিমু—তোমার কি সন্দেহ আছে, আমি সত্যি কথা বলি না ?

যুথিকা—না, তুমি সে বিষয়ে একেবারে খাঁটি শুভবয়। তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হিমু—বল।

যুথিকা—লতিকা তোমাকে আমার মত বিরক্ত করেনি ?

হিমু—একটুও না।

যুথিকা—চা এনে দাও, বিছানা পেতে দাও, হেন তেন কোন হুকুমই করেনি ?

হিমু—না। বরং লতিকাই ওসব কাণ্ড করেছে। আমি আপত্তি করেছি তবুও শোনেনি।

যুথিকার চোখের দৃষ্টি আবার কঠোর হয়ে ওঠে।—তার মানে, লতিকা তোমার খুব সেবাযত্ন করেছে ?

হিমু—একটু বাড়াবাড়ি করেছে বলতে হবে। নিজেই হাঁক দিয়ে চা-ওয়ালাকে ডেকে এনে আমাকে চা খাইয়েছে। বিছানাটাকেও আমার জন্ম ছেড়ে দিয়ে, নিজে সারারাত জেগে উলের টুপি বুনেছে। একটু বেশি ভদ্রতা করেছে লতিকা।

যুথিকা ভ্রূকুটি ক'রে মুখ ফেরায়—কিন্তু তাই বলে লতিকা তোমাকে বিয়ে করতে পারে না।

হিমু—আমি লতিকাকে বিয়ে করতে পারি না।

যুথিকা—কেন?

হিমু—আমার মত মানুষকে লতিকার বিয়ে করা উচিত নয় বলে।

যুথিকা—নিজেকে কি তুমি এতই ছোট মনে কর?

হিমু—একটুও ছোট মনে করি না।

যুথিকা—তবে?

হিমু—লোকে তো ছোট মনে করে।

যুথিকা—আমিও মনে করি কি?

হিমু—তোমার মন জানে।

আবার হিমু দত্তের দু'চোখের দৃষ্টি উত্ত্যক্ত হয়ে, আর যুথিকার এই অকারণ বাচালতার উপর বেশ কুপিত হয়ে যুথিকার মুখের উপর পড়তেই চমকে ওঠে আর ভয় পায় হিমু। যুথিকা ঘোষের চোখের পাতা আবার ভিজে ভারি হয়ে গিয়েছে।

হিমু দত্ত ভয়ে ভয়ে অনুরোধ করে।—গল্প করবার এত জিনিস থাকতে তুমি আজ কেন মিছিমিছি এসব কথা তুলে ট্রেনযাত্রার আনন্দটা মাটি করছো যুথিকা।

হিমুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় যুথিকা। নিজেই হাত বাড়িয়ে সীটের তলা থেকে একটা ছোট বাস্কেট বের করে। বাস্কেট খুলে খাবারের প্যাকেট ও একটা ডিস বের করে। আর ডিসের উপর খাবার সাজিয়ে দিয়েই বলে—খাও হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি অপ্রস্তুতের মত বলে—এ কি? তোমার খাবার কোথায়?

যুথিকা হাসে—এই তো। একই ডিসে দু'জনে খেতে পারা যায় না কি?

সত্যিই হাত বাড়িয়ে ডিসের উপর সন্দেশ ভাঙে যুথিকা। এবং খেতেও কোন দ্বিধা করে না।

খাবার খেতে গিয়ে হেসে ফেলে হিমু—একটা কাণ্ডই করলে তুমি!

যুথিকা মুখ টিপে হাসে—কেন করলাম, বুঝতে পারলে কিছু?

হিমু—না।

যুথিকা—লতিকাকে হারিয়ে দিলাম। কেমন? ঠিক কিনা? লতিকা নিশ্চয় এটা করতে পারেনি?

—না। কথাটাকে কেমন উদাসভাবে, যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে

মিশিয়ে দিয়ে চুপ করে খাবার খেতে খেতে হিমু আবার আনমনার মত হঠাৎ বলে ওঠে। —এই তো আমাদের শেষ ট্রেন-যাত্রা!

—অ্যাঁ, কি বললে? হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে যেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে ঢুলে পড়ে যুথিকা ঘোষের চোখের চাহনি। শেষ ট্রেন-যাত্রা? তা মানে কি? হিমাদ্রির সঙ্গিনী হয়ে একই ট্রেনে পাটনা থেকে গিরিডি আসা-যাওয়ার পালা চিরকাল চলতে থাকবে, এইরকম একটা জীবন কি সত্যিই কল্পনায় কামনা ক'রে রেখেছিল যুথিকা? নইলে এত আশ্চর্য হয়ে যায় কেন যুথিকা? এবং হিমুর এত সহজ ও সরল কথাটা বুঝতে এত দেরি করে কেন?

বুঝতে দেরি হয়নি যুথিকার। চোখের সামনে একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, হ্যাঁ, হিমাদ্রির সঙ্গে এই শেষ ট্রেন-যাত্রা। ধুলোখেলার মহোৎসব এই শেষ। শেষ হলো, খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

যুথিকা বলে—খবরটা তাহলে তুমিও শুনেছ হিমাদ্রি?

হিমু—কিসের খবর?

যুথিকা—আমার বিয়ের।

হিমু—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো বললাম।

যুথিকা—কি?

হিমু—এই আমাদের শেষ ট্রেন-যাত্রা। তাই মিছে আর তর্ক-টর্ক ক'রে কেন শেষ দিনের আনন্দটা নষ্ট করো?

যুথিকা—আনন্দ?

হিমু—আনন্দ বৈকি। তুমি যা চেয়েছিলে, তাই পেলে, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে?

যুথিকা—সত্যি ক'রে বল হিমাদ্রি। শুনে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

হিমু—হ্যাঁ।

যুথিকা—আনন্দের মধ্যে কি এতটুকু···

হিমু—কি?

যুথিকা—কষ্ট হচ্ছে না।

চমকে মুখ ফিরিয়ে নেয় হিমু দত্ত। নইলে হিমুর জীবনের একটা দুঃসহ বেদনার নিঃশ্বাস বোধহয় এখনি চারু ঘোষের মেয়ের উপর ছড়িয়ে পড়বে আর ধরা পড়ে যাবে হিমু! মাথা হেঁট করে, চোখ-মুখ একেবারে বিবর্ণ ক'রে আর ধরা পড়ে যাবে হিমু!

হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে যুথিকা হাসে—তোমার উপর আমার আর রাগ নেই হিমাদ্রি।

হিমু—কেন বল তো?

যুথিকা—লতিকার কাছে হার মানতে হলো না। আমারই জিত হয়েছে।

ট্রেনটা থেমেছে। খুব আলোয় ভরা জমজমাট একটা স্টেশন। যেমন লোকের ভিড়, তেমনিই কোলাহল। ট্রেনের কামরার একই জানালার ভিতর দিয়ে পাশাপাশি দু'টি মুখ উঁকি দিয়ে যেন চঞ্চলতা আর মুখরতার একটা আলোকিত উৎসবের মত একটা দৃশ্যকে দেখতে থাকে। যেন চিরকালের বন্ধু ও বান্ধবীর দু'টি হর্ষোৎফুল্ল মুখ। এবং দু'জনেই জানে না, কখন কোন্ মায়ার আবেশে দু'জনের দুটি হাতের ছোঁয়াছুঁয়ি মুঠোবাঁধা হয়ে এক হয়ে গিয়েছে।

ট্রেনটা ছেড়ে দেয়। যুথিকা বলে—আমি সত্যিই কিছু বুঝে উঠতে পারছি না হিমাদ্রি।

হিমু—কি?

যুথিকা—সত্যিই কি সোনা ফেলে দিয়ে আঁচলে গেরো দিলাম।

হিমু—তার মানে?

যুথিকা—মানে জিজ্ঞাসা করো না হিমাদ্রি। বুঝতে না পার যদি, তবে চুপ করে থাকো।

চুপ করে হিমাদ্রি। যুথিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—বড় ক্লান্ত লাগছে শরীরটা, বুকের ভিতরেও যে হাঁপ ধরছে হিমাদ্রি; আমি এভাবেই জানালায় মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন?

হিমু—নিশ্চয়। তুমি চুপ করে ঘুমোও।

যুথিকা—তুমি সরে যেও না কিন্তু।

হিমু—না, কখ্খনো না।

কিন্তু ঘুমোতে পারে না যুথিকা। ঘুমটাই যেন থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ওঠে, আর হিমু দত্তের হাতটাকে আরও শক্ত ক'রে খিমচে ধরে রাখে যুথিকা।

সামনের সীটের এক ভদ্রলোক বলেন—ওর কোন অসুখ আছে বলে মনে হচ্ছে।

হিমু বলে—না। হঠাৎ কাহিল হয়ে পড়েছেন।

ভদ্রলোক আক্ষেপ করেন—তাইতো বড় দুঃখের বিষয় হলো! আপনিও বড় নার্ভাস হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোকের কথায় জবাব না দিলেও হিমু বোধহয় নিজের মুখটাকে কল্পনায় দেখতে পায়। যেন একটা ক্ষেপা হাওয়ার মাতামাতির মাঝখানে, রাতের নদীর বুকের উপর ভাঙা নৌকাতে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদের শোভা দেখছে হিমু দত্ত। এই নৌকা ডুবে যাবে, অথই জলে তলিয়ে যেতে হবে, সবই জানে হিমু; কিন্তু তবু পূর্ণিমার চাঁদ দেখবার লোভ যেন ছাড়তে পারছে না। হাসিটা কেঁদে ওঠেনি, হিমু দত্তের জীবনের কান্নাটাই যেন ওর মুখের ওপর হেসে রয়েছে।

হিমু দত্তের বুকের কত কাছে চারু ঘোষের মেয়ের মাথাটা! হাতের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যূথিকা। যূথিকার খোঁপার সুগন্ধও হিমু দত্তের নাকের কত কাছে মাতামাতি করছে!

হঠাৎ বাইরে থেকে গুঁড়ো বৃষ্টির একটা ঝাপটা এসে যূথিকার মাথাটাকে ভিজিয়ে দেয়। রুমাল দিয়ে যূথিকার মাথা মুছে দিতে হিমু দত্তের হাতটা আজ আর কোন লজ্জায় আর কোন ভয়ে কাঁপে না।

মুখ তোলে যূথিকা—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।

হিমাদ্রি—বল।

যূথিকা—দরকার হলে তুমি কি আমাকে বোম্বাই থেকে গিরিডিতে আনতে পারবে না।

হিমাদ্রি—দরকার কেন হবে?

যূথিকা—আমি বলছি দরকার হবে।

—না। দরকার হলেও না।

যূথিকা—ঠিকই ভেবেছিলাম আমি, তুমি একথা বলবে। তুমি ভয়ানক চালাক।

হিমু—তোমার বোকামির জন্যেই চালাক হতে হচ্ছে।

যূথিকা আবার জানালার কাঠের উপর হাত রেখে আর মাথা পেতে ঘুমোতে চেষ্টা করে। তন্দ্রাটা মাঝে মাঝে নিবিড় হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু অদ্ভুত কতকগুলি ঠাট্টার ভাষা যেন মাথার ভিতরে একঘেয়ে সুরে বাজতে থাকে। পাটনাতে মামীর সঙ্গে একবার হীরালালবাবুর বাড়ীতে কীর্তন শুনতে গিয়ে যে গানের ন্যাকামি সহ্য করতে না পেরে দু-মিনিট পরেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিল যূথিকা, সেই গানের ভাষা যূথিকার এই ক্লান্ত মাথার ভিতরে প্রচণ্ড উৎপাতের শব্দের মত বেজে চলেছে। পীরিতিক রীতি শুন বরনারী!

আজ যূথিকাকে বাগে পেয়ে সেদিনের গানটা যেন যূথিকার অহঙ্কারের

উপর প্রতিশোধ তুলছে। পীরিতের রীতিতে ভুল হলে কি দশা হয়, সেটাও ইনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল গানটা। তুহারি ভরম ফান্দে, তুহারি করম কান্দে। বাঃ চমৎকার।

চান্দ কিরণ ছোড়ি, দাবানল পরশিলি। অব কাহে ফুকারে হুতাশা। কিসের ছাই হুতাশা? এত ভয় করবার কি আছে?

ধড়ফড় ক'রে জেগে আর মুখ তুলে হিমুর কানের কাছে যেন স্বপ্নের ঘোরে একটা প্রলাপ ফিসফিস করে যূথিকা—আমি যদি বোম্বাই না যাই হিমাদ্রি?

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—তার মানে নরেনের সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না হয়?

—ছিঃ, মাথা খারাপের আর কিছু বাকি নেই তোমার? রুক্ষস্বরে, প্রায় ধমকের মত একটা ভঙ্গী ক'রে উত্তর দেয় হিমু।

হেসে ফেলে যূথিকা—তার মানে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সাহস তোমার নেই।

হিমু—না নেই।

যূথিকা—কেন?

যূথিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীব্র তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাক্ত একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থেকে হিমু বলে—তোমাকে ভালবাসি বলে।

চমকে ওঠে যূথিকার চোখ আর মুখ। হঠাৎ সূর্যোদয়ের আভা ঘুমন্ত চোখ আর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লে যে রকম চমক লাগে, সেইরকম চমক। যেন যূথিকার জীবনের একটা আশার স্বপ্নালু আবেশ হঠাৎ আলোকের ছোঁয়া লেগে জ্বলে উঠেছে। হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; দুই চোখে নিবিড় তৃপ্তির স্নিগ্ধতা জ্বল জ্বল করে।

থেমে গেল ট্রেনটা। রাত প্রায় ভোর-ভোর হয়েছে। প্রায় নির্জন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে মচ মচ ক'রে জুতোর শব্দ বাজাতে বাজাতে জানালার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন ট্রেনের গার্ড।—আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

হিমু একটু আশ্চর্য হয়ে বলে—না।

চলে গেলেন গার্ড। এবং ট্রেনটাও আবার চলতে শুরু করে। যূথিকা চোখ মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—তুমি এত স্পষ্ট ক'রে একি কথা বলে ফেললে হিমাদ্রি?

যূথিকা—কিন্তু শুধু আমার কাছেই বলতে পারলে। আর কারও কাছে বলবার সাহস আছে কি?

হিমু—সাহস খুব আছে; কিন্তু বলবার দরকার হবে না।

যূথিকা—যদি দরকার হয়?

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—যদি নরেন তোমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, তবে? সত্যি কথাটা বলতে পারবে তো?

হিমু বলে—না।

যূথিকা—এই তো তোমার সাহস! এই রকমই সত্যবাদী তুমি!

হিমু—যা ইচ্ছে হয় বল, আমি তোমার ক্ষতি করতে পারবো না। দরকার হলে হাজারটা মিথ্যে কথা বলে দেব।

যূথিকা—তাই বল। পথে এসো এবার।

হিমু—কিন্তু তুমি কি পারবে?

যূথিকা—কি?

হিমু—নরেনবাবুর কাছে সত্যি কথা বলে দিতে?

যূথিকা—কোন্ সত্যি কথা?

উত্তর দেয় না হিমু। যূথিকার কথার জালে জড়িয়ে পড়ে হিমুর মনের সবচেয়ে লোভনীয় একটা লোভ এইবার ধরা পড়ে গিয়েছে। কি জানতে চায় হিমু?

যূথিকা হাসে—বল হিমাদ্রি, কোন্ সত্যি কথা জানতে চাইছো?

যূথিকার এই হাসিটা কি চারু ঘোষের মেয়ের মনের সেই শুকনো কৌতূহলের হাসি? তাই যদি হয়, তবে হিমু দত্তের জীবনের চরম কৌতূহল এই মুহূর্তে হিমু দত্তের বুকের ভিতরে শেষ আর্তনাদ তুলে ফুরিয়ে যাবে। ভালই হবে। আর দুঃখ করবার, এবং সারা জীবন মনের মধ্যে গোপন রত্নের মত লুকিয়ে রাখবার কিছু থাকবে না।

যূথিকা বলে—হ্যাঁ হিমাদ্রি, আমি অনায়াসে নরেনকে বলে দিতে পারি যে, আমি হিমাদ্রিকে ভালবাসি।

ভালবাসে যূথিকা! শুধু এইটুকু জানবার সাধ যে হিমুর জীবনের চরম সাধ হয়ে আর স্বপ্ন হয়ে হিমুর বুকের ভিতর জমা হয়েছিল; সে সত্য ধরা পড়িয়ে দিলো হিমুর চোখ দুটো। ভিজে গিয়ে চিকচিক করে হিমু দত্তের সেই শান্ত ও নির্বিকার চোখ, যে চোখ, কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে

মুগ্ধ হয় না বলে বিশ্বাস করেন কৃষ্ণার মা, অতসীর কাকীমা, কল্যাণীর মামা, নিভার বাবা, সরমার দাদা, আর প্রমীলার মা।

যুথিকা—এ কি করলে হিমাদ্রি? এর পরেও চাও, নরেনের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক?

হিমু—নিশ্চয়।

যুথিকা—নিশ্চয় না।

হিমু—তাহলে নিশ্চয় কি? আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কোনদিন?

যুথিকা—হলে মন্দ কি?

হিমু—অসম্ভব নয় কি?

যুথিকা—একটুও অসম্ভব নয়। শুধু তুমি রাজি হলেই হয়।

উত্তর দেয় না হিমু।

যুথিকা—বল, শিগ্‌গির বল, আমাকে যদি বিশ্বাস করে থাক, তবে এখুনি বলে দাও লক্ষ্মীটি!

—কি বিশ্বাস করবো? কি বলবো? প্রশ্ন করতে গিয়ে যেন দম বন্ধ ক'রে ছটফট করে হিমু।

যুথিকা—বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলছি না; আমি তোমাকে ভালবাসি।

হিমু—বিশ্বাস করি।

যুথিকা—বিশ্বাস কর, তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে সুখী হতে পারবো না।

হিমু—বিশ্বাস করি।

যুথিকা—তবে আমাকে বিয়ে করতে তোমার বাধা কোথায়? রাজি হয়ে যাও হিমাদ্রি।

হিমু দত্তের মুখে যেন একটা করুণ ও খিন্ন হাসির আভা ফুটে ওঠে। যেন বুকভরা একটা হাসির সুন্দর জ্বালা বুকের ভিতরেই দমিয়ে দিতে চেষ্টা করে হিমু। যুথিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে হিমু। কে জানে কি ফুটে উঠেছে হিমুর চোখে। আশা আনন্দ মায়া আর বিস্ময়? না, ভয় সন্দেহ কৌতুক আর ফাঁকি?

হিমু বলে—বেশ আমি রাজি আছি যুথিকা।

যুথিকা—তাহলে গিরিডি পৌঁছেই মামীকে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিই, এ বিয়ে হবে না।

হিমু—জানিয়ে দাও।

যূথিকা—কিংবা নরেনকেই একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে পারি, কেন এ বিয়ে হতে পারে না।

হিমু—জানিয়ে দিতে পার।

যূথিকা—হিমাদ্রি?

হিমু—বল।

যূথিকা—বড় ঘুম পাচ্ছে হিমাদ্রি।

হিমু—ঘুমোও।

ট্রেনের কামরা নয়। উদাসীনের দোতলার একটি ঘর। উদাসীনের চারদিকে উঁচু পাঁচিল; সেই পাঁচিলের উপর আবার সারি সারি লোহার স্থচীমুখ স্পাইক। একটি পাখিও সে পাঁচিলের উপর উড়ে এসে বসবার মত ঠাঁই পায় না। বসতে এলেই ডানাতে স্পাইকের খোঁচা খেয়ে ছটফট করে সেই মুহূর্তে উড়ে পালিয়ে যায়।

উদাসীনের দোতলার ঘরের ভিতরে সোফা চেয়ার আর পালঙ্কের উপর গড়াগড়ি দিয়েও যূথিকা ঘোষের মন থেকে ট্রেনযাত্রার ক্লান্তির ঘোর সহজে কেটে যায়নি। কিন্তু কেটে যেতে খুব বেশি সময়ও লাগেনি। সারা সকাল দুপুর আর বিকেল বেলাটা; বাস্‌, তারপরেই যেন হঠাৎ চোখ মেলে জেগে উঠলো যূথিকা। উশ্রীর বালুতে বিকালের আলো লুটিয়ে রয়েছে এবং মনেও পড়ে যূথিকার, পৃথিবীর একজনের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে এসেছে যূথিকা, পাটনার মামীকে আজই টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে হবে, এ বিয়ে হবে না।

টেলিগ্রামের ফরম নিয়ে কথাগুলি লিখতে গিয়ে বার বার হাত কাঁপে, বার বার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে যূথিকা! তারপরেই নীচের তলায় নেমে গিয়ে কুসুম ঘোষের কাছে এসে বলে—মামীকে এখুনি একটা টেলিগ্রাম করতে চাই, মা।

কুসুম ঘোষ—কেন?

উত্তর দিতে গিয়ে বিড়বিড় করে যূথিকা। তারপরেই যেন একটা ভয়ের চমক লেগে কেঁপে ওঠে। এবং তার পরেই কে জানে কার উপর রাগ করে আর প্রায় দৌড় দিয়ে আবার উপর তলায় চলে যায়।

সত্যিই একটা রাগ, সে রাগে গজগজ করে বুকটা, আর ঘেমে ওঠে কপালটা।

টেলিগ্রাম করা হলো না! কিন্তু মনে পড়ে যুথিকার, নরেনের কাছে অনায়াসে একটা চিঠি লিখে সত্য কথা জানিয়ে দিতে পারা যায়। পৃথিবীর একজনের কাছে এইরকম একটা প্রতিজ্ঞার কথা বলে রেখেছি যুথিকা।

চিঠি লিখতে দেরি করে না যুথিকা। অনায়াসে অনেক কথা লেখে এবং তারপরেই হঠাৎ ভয়ের চমক লেগে ছটফট ক'রে ওঠে; এবং সেই মুহূর্তে অনায়াসে চিঠিটাকে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে।

ট্রেনের কামরার ভিতরে যেন স্বপ্নের ঘোরে মিথ্যে কথা বলে একটা অদ্ভুত অসম্ভব ও ভয়ানক অঙ্গীকার ক'রে হিমাদ্রির মনের ভিতরে একটা আশার স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে যুথিকা; মনে পড়ে সবই। এবং মনে পড়তেই বুকটা কেঁপে ওঠে, লজ্জাও পায় যুথিকা, একটা অসার দুঃসাহসের লজ্জা। হিমাদ্রির সঙ্গে যুথিকা ঘোষের কোনদিন বিয়ে হতে পারে, একথা হিমাদ্রি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছে?

বিশ্বাস করতে তো চায়নি মানুষটা। কি ঝোঁকের মাথায় কি-ভয়ানক ভুল ক'রে ফেললো যুথিকারই একটা অবুঝ বেদনা! বেচারাকে জোর ক'রে বিশ্বাস করানো হলো। রাজি হয়ে গেল হিমাদ্রি।

কে জানে এই শহরের কোন্ গলির কোন্ ঘরের নিভৃতে কেমন অন্ধকারের মধ্যে বসে এখন চারু ঘোষের মেয়ের অঙ্গীকারের কথাগুলিকে জীবনের এক নতুন সঙ্গীতের মত মনে মনে সাধছে হিমাদ্রি? ছি ছি, কী ভয়ানক বোকা হিমাদ্রি বেচারার মন! সন্দেহ করেও শেষ পর্যন্ত নিজেই অদ্ভুত এক আশার হাসি হেসে সেই সন্দেহের জোর ভেঙ্গে দিল। উদাসীনের মত বাড়ির মেয়ের ট্রেনযাত্রার সাথী হতে পারে হিমাদ্রি; মনের কথা বলাবলি করবার বন্ধু হতে পারে হিমাদ্রি; আর একই ডিসে সাজানো খাবার খাওয়ার সঙ্গী হতে পারে হিমাদ্রি; কিন্তু উদাসীনের মেয়ে যুথিকা ঘোষের স্বামী হতে পারে না হিমাদ্রি। তাই যদি সম্ভব হতো, তবে যুথিকা ঘোষ সত্যি যুথিকা ঘোষ হবে কেন, আর হিমাদ্রিই বা হিমাদ্রি হবে কেন?

ছি ছি, শুধু কয়েকটা কথার ভুলে কি অদ্ভুত এক কাণ্ড বাধিয়ে একটা মানুষের সাদা মনের উপর মিছিমিছি রং ছিটিয়ে দিয়ে এখন ভয় ক'রে আর লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। হিমাদ্রি এখন কোন দুঃস্বপ্নেও এমন সন্দেহ করতে পারছে না যে, পয়লা অঘ্রান নরেনকে নিয়ে হাসতে হাসতে আর উৎসবের বাঁশি বাজাতে বাজাতে এই উদাসীনের মেয়ের জীবনের কাছে হু হু করে ছুটে আসছে। টেলিগ্রাম করে কিংবা চিঠি লিখে পয়লা অঘ্রানের

ইচ্ছাটাকে কোনই বাধা দেবার ক্ষমতা হয়নি যুথিকার। যুথিকা ঘোষ যে সত্যিই পয়লা অঘ্রানের উৎসবে সাজবার জন্য এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। শর্মা ব্রাদার্সের স্টোর থেকে নানা ডিজাইনের ও নানা রং-এর একশো শাড়ি এসেছে। তার ভিতর থেকে দশটা শাড়ি এখনই পছন্দ ক'রে ফেলতে হবে!

একটি চিঠি লিখে এখনি হিমাদ্রির বিশ্বাসের ভুল ভেঙ্গে দিতে পারা যায়। সত্যি তোমার কোন অপরাধ নয় হিমাদ্রি, অপরাধ আমার; আমিই মনের একটা মুখর খেয়ালের ঝোঁকে, একটা স্বপ্নের ঘোরে কয়েকটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছি। বড় কষ্ট হচ্ছিল হিমাদ্রি; তাই প্রলাপ বকেছিলাম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে কেন? সত্যিই বিশ্বাস করেছ কি?

হিমুর ঠিকানা জানা নেই, তাই চিঠি লেখা সম্ভব হবে না। কিন্তু ঠিকানাটা জানা থাকলেই বা কি হ'তো? অস্বীকার করে না যুথিকা, হিমাদ্রির মত মানুষের সঙ্গে এক ট্রেনের এক কামরায় একই সীটের উপর পাশাপাশি বসে গল্প করতে গিয়ে যা মন চায় তাই অনায়াসে বলে দিতে পারে উদাসীনের মত বাড়ির মেয়ে; কিন্তু উদাসীনের দোতলায় এই ঘরে বসে কাগজ কলম নিয়ে হিমাদ্রিকে একটা চিঠি লেখাও যে নিতান্তই অসম্ভব।

হিমাদ্রি যদি হঠাৎ এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় আর প্রশ্ন করে, সব কথা মনে আছে তো যুথিকা? কল্পনা করতেও ভয় পেয়ে থরথর ক'রে, ওঠে যুথিকা ঘোষের নিঃশ্বাস। হিমাদ্রি যদি ঝোঁকের মাথায় এরকম একটা কাণ্ড ক'রে বসে, তবে কি উপায় হবে? বাবা ছুটে আসবে, মা ছুটে আসবে। হিমাদ্রির মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তার পর যুথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে, এ লোকটা কোন্ সাহসে এসব কথা বলছে যুথিকা? এ লোকটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

না, কোন সম্পর্ক নেই। জানি না, লোকটা কোন্ সাহসে এমন কথা বলে। ভয় পেয়ে, কেঁদে আর চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড করতে পারবে যুথিকা, কিন্তু বলতে পারবে না যে, আমিই ওকে একথা বলবার সাহস দিয়েছি। হয়তো পুলিশ ডাকবে উদাসীন, এবং উদাসীনের মেয়ের মিথ্যা কথা প্রমাণ করবার সাধ্যি হবে না হিমাদ্রির। কোনও প্রমাণ নেই, কেউ সাক্ষী নেই।

এমন অপমানের মধ্যে এগিয়ে আসবার মত সাহস হবে কি হিমাদ্রির? ভয়ানক ভুল করবে, যদি সাহস করে। দু'হাতে মাথাটাকে শক্ত করে টিপে ধরে মনে মনে যেন প্রার্থনা করে যুথিকা; এমন সাহস যেন না করে হিমাদ্রি। যেন চুপ করে নিজের ঘরের ভিতরে বসে দিন আর রাতগুলিকে

পার করে দেয় ; এবং একদিন হঠাৎ চমকে উঠে যেন বুঝতে পারে হিমাদ্রি ; পয়লা অঘ্রান পার হয়ে গিয়েছে ; বোম্বাই চলে গিয়েছে যূথিকা।

বড় বেশি আশ্চর্য হবে, হতভম্ব হয়ে যাবে, আর কষ্ট পাবে বেচারা। যূথিকা ঘোষের একটা কথা বিশ্বাস ক'রে যে এত শাস্তি পেতে হবে, কল্পনাও করতে পারছে না হিমাদ্রি। তার চেয়ে ভাল, আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে গিরিডি ছেড়েই চলে যাক না, পালিয়ে যাক না হিমাদ্রি ; তাহলে তো আর এই শাস্তি পাওয়ার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে না। কিন্তু সেটুকু বুদ্ধি আছে কি হিমাদ্রির ? মানুষটা যে বোকা হবার ভুলেই জীবনে শুধু মানুষের যত তুচ্ছতা আর তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে হিমাদ্রি বলেও কেউ ডাকে না। চলে যাক, চলে যাক হিমাদ্রি।

ফুঁপিয়ে উঠলেও, আর বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেও যূথিকা ঘোষের মনের প্রার্থনাটা যেন হিমাদ্রি নামে একটা মানুষকে এই মুহূর্তে গিরিডি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য নিষ্ঠুর চাবুকের মত ছটফট করতে থাকে। পয়লা অঘ্রানের উৎসব বন্ধ করবার সাধ্যি নেই যার, যূথিকা ঘোষকে ভয় পাইয়ে দেবার কিংবা জব্দ করবার মত একটা ভ্রূকুটি করবারও শক্তি নেই যার, সে-মানুষ মানে মানে এখনও সরে পড়ে না কেন ?

পয়লা অঘ্রানের আগের দিনেই হঠাৎ গিরিডিতে এসে পড়লেন পাটনার মামী। কুসুম ঘোষ আশ্চর্য হন—এ কি কণিকা ? রওনা হবার কথা একটা টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে হয় !

মামী বলেন—টেলিগ্রাম করবারও সময় ছিল না কুসুমদি।

কুসুম ঘোষ—নরেন আর বরযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আসবে কে ?

মামী—অরুণের বাবাই আসবেন। উনিই সব ব্যবস্থা করেছেন। আমি একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে, বাধ্য হয়ে আগেই চলে এলাম।

—দুশ্চিন্তা ? আতঙ্কিত হয়ে ভীরু চোখে তাকিয়ে থাকেন কুসুম ঘোষ।

—হ্যাঁ, যূথিকা কোথায় ?

—মেয়ে তো গিরিডি পৌঁছবার পর থেকে ওপরতলার ঘরটিতে সেই যে ঢুকেছে, সহজে আর নড়তে চায় না।

—কি বলে যূথিকা ?

—কিছু না।

—একেবারে কিছু না ?

—মাঝে একবার তোমাকে একটা টেলিগ্রাম করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

—কিসের জন্য ?

—তা জানি না। কিছুক্ষণ এঘর-ওঘর ক'রে, আর গজ গজ ক'রে তারপর নিজেই চুপ হয়ে গেল।

—আর কোন কাণ্ড করেনি ?

—কাণ্ড ? না, কাণ্ড আর কি করবে বল ? হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে একটা চিঠি লিখেছিল, বোধহয় নরেনের কাছে। কিন্তু হঠাৎ নিজেই আবার চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা লম্বা ঘুম দিলো। কাণ্ড বলতে এই তো কাণ্ড।

—বিয়ে করতে কোন আপত্তির কথা বলেছে কি ?

—কোন আপত্তির কথা বলেনি, বরং নিজেই তো বেশ দেখে-শুনে দশটা শাড়ি বাছাই করেছে, শর্মা ব্রাদার্সের দোকান থেকে একশ'টা শাড়ি এসেছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণের ব্যাপার নিয়েও নিজের থেকে যেচে দু'চারটে ভাল ভাল কথা বলেছে।

—কি কথা ?

—যূথিকার ইচ্ছে, বিয়েতে যেন হিমু-টিমুর মত লোককে নিমন্ত্রণ না করা হয়।

স্বামী খুশি হয়ে হেসে ফেলেন—যাক্, নিশ্চিত হলাম। এইবার মেয়ের কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে। কিন্তু ওদিকে একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।

—অ্যাঁ ?

—নরেন আমাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে, হিমাদ্রি নামে লোকটার সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক ?

চেঁচিয়ে ওঠেন কুসুম ঘোষ—কোন সম্পর্ক নেই। হিমাদ্রি একটা চাকর গোছের লোক। মাথায় ছিট আছে। লোকটাকে কোন কাজ ক'রে দিতে বললেই তেড়েমেড়ে এসে কাজ ক'রে দিয়ে চলে যায়।

—কিন্তু হিমাদ্রির সঙ্গে যূথিকার সম্পর্কটা কি দাঁড়িয়েছে ?

—ছি ছি ; তুমি কি বিশ্রী বাজে কথা বলছো কণিকা ?

—একটুও বাজে কথা নয় কুসুমদি।

—খুব বাজে কথা।

—না, নরেনও নিজের চোখে কিছু কিছু দেখেছে। আমি অনেক কিছুই দেখেছি।

—কি দেখেছো তুমি?

—হিমাদ্রির সঙ্গে বিশ্রী রকমের বন্ধুত্ব করেছে যুথিকা।

—কি আশ্চর্য, এমন অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হয়?

—সম্ভব তো হলো, আশ্চর্য হয়ে লাভ নেই।

—দুশ্চিন্তা করেও লাভ নেই। চেঁচিয়ে ওঠেন কুসুম ঘোষ।

—কেন? একটু আশ্চর্য হন কণিকা।

কুসুম ঘোষ—ভয়টা কিসের? চুলোয় যাক্ হিমাদ্রি।

কণিকা—কিন্তু নরেনকে তো আর চুলোয় ঠেলে দিতে পারেন না কুসুমদি?

—কখ্খনো না। কিন্তু নরেনের কথা তুলছো কেন?

—নরেনের মন বড় অহঙ্কারী মন। এসব ব্যাপারের সামান্য আভাসও জানতে পেরেছে কি বেঁকে বসবে। যুথিকাকে বিয়ে করতে কোনমতেই রাজি হবে না।

—কিন্তু নরেন জানবে কি ক'রে?

—জানিয়ে দেবে হিমাদ্রি।

—সে ছোটলোকের এত সাহস হবে?

— আপনাদের মেয়ে যদি ছোটলোককে সাহস দিয়ে থাকে তবে···?

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন কুসুম ঘোষ। চারু ঘোষও সব শুনলেন; সির-সির ক'রে কাঁপতে থাকেন চারু ঘোষ। চারু ঘোষের জীবনের নিরেট অহঙ্কারটাই যেন ভয়ে সির-সির ক'রে উঠেছে। হিমু দত্ত নামে একটা লোক, যে লোকটা বলতে গেলে একটা মানুষই নয়, তারই অহঙ্কারের কাছে যেন মাথা হেঁট ক'রে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে আর ধুলো হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তিনতলা উদাসীন!

কণিকা বলেন—নরেন বলেছে, গিরিডিতে এসেই প্রথমে হিমাদ্রি নামে লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

চারু ঘোষ হতভম্বের মত তাকিয়ে বলেন—এটা তো নরেনের মনের একটা ভয়ানক সন্দেহের কথা হলো।

কণিকা বলেন—সেই জন্যেই তো আমি আগে-ভাগে চলে এলাম। একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। হিমাদ্রিকে সরিয়ে না দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারা যাবে না।

চারু ঘোষ—কি ক'রে সরানো যায়? ওকে টাকা সাধলেও সরে যেতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেন কণিকা। তাঁরও চার বছরের চেষ্টার ইতিহাস এমন করে ভুয়ো হয়ে যাবে, এ দুঃখ যে কণিকারও এতদিনের জেদের একটা ভয়ানক পরাজয়ের দুঃখ। শীতাংশু ডাক্তার যে হেসে হেসে আটখানা হয়ে যাবে, নরেনের মা অভিশাপ দেবেন, এবং গর্দানিবাগে কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবেন না কণিকা, যদি এই বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে উপরতলায় উঠে যুথিকার ঘরের দিকে এগিয়ে যান এবং দরজার কাছে এসেই হেসে ওঠেন কণিকা মামী :—চুপটি করে বসে কি করছো যুথিকা?

চমকে উঠে যুথিকা—কিছু না। তুমি কখন এলে?

মামী—এই তো সকাল নটার গাড়িতে পৌঁছেচি। শুনলাম, তুমি নাকি আমাকে একটা টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলে?

যুথিকা—হ্যাঁ। কিন্তু করিনি তো? এত ভয় পাচ্ছ কেন?

মামী—নরেনের কাছে কি একটা চিঠি লিখতে চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—তবে লিখলে না কেন?

—লেখবার দরকার আর হলো না।

—ওরা সবাই কাল সকাল নটার গাড়িতে এখানে পৌঁছে যাবে।

যুথিকা হাসে—তুমিও বরযাত্রিনী হয়ে ওদের সঙ্গেই এলে পারতে; একদিন আগে এসে লাভটা কি হলো?

মামী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান।—আসতে বাধ্য হয়েছি।

—কেন?

—বিয়ে ভেঙ্গে যাবার ভয় আছে।

ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে যুথিকা। মুখ কালো ক'রে আস্তে আস্তে বলে—কেন মামী? কি ব্যাপার হলো?

—হিমাদ্রিকে বিশ্বাস নেই।

যুথিকার হৃৎপিণ্ডের সাড়া বোধহয় এই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জোরে শ্বাস টানতে চেষ্টা ক'রে যুথিকা। প্রশ্ন করে—কি করেছে হিমাদ্রি?

—কিছু করেনি এখনো, কিন্তু কিছু একটা করবে বলে বুঝতে পেরেছি।

—কি ?

—নরেনের কাছে ভয়ানক কোন কথা বলে দেবে।

—বলুক না, নরেন বিশ্বাস করবে কেন সে কথা ?

—নরেন বিশ্বাস ক'রে ফেলবে বলে ভয় হচ্ছে।

—কেন ?

—নরেনের মনে একটা খট্‌কা আছে বলে মনে হচ্ছে।

—অকারণে একটা খট্‌কা। বেশ মজার খট্‌কা তো !

—অকারণে নয়! পাটনাতে ট্রেনে ওঠবার সময় তুমিই নরেনের চোখের সামনে হিমাদ্রি হিমাদ্রি ক'রে চেঁচিয়ে আর উতলা হয়ে যে কাণ্ড করেছিলে, তাতে নরেনের মনে কোন খট্‌কা লাগলে সেটা কি দোষের হবে ?

—এ সবই তো তোমার অনুমান। নরেনকে ছোট ক'রে ভাবতে তোমার ইচ্ছে করছে।

—নরেন নিজেই সন্দেহের কথা বলে আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছে।

—কি বলেছে নরেন ?

—গিরিডিতে এলেই প্রথমে হিমাদ্রির সঙ্গে আলাপ করবে।

ছু'চোখ অপলক ক'রে তাকিয়ে থাকে আর বিড়বিড় করে যূথিকা।— নরেনের মত মানুষ হিমাদ্রির মত একটা লোকের সঙ্গে আলাপ করবে কেন ?

—সেটা বুঝতে চেষ্টা কর।

—কি জানতে চায় নরেন।

—সেটা বুঝে দেখ।

—হিমাদ্রিই বা কি এমন অদ্ভুত কথা বলে দেবে ?

—তুমি জান।

যূথিকা ঘোষের মাথাটা এবার অলস হয়ে ঝুঁকে পড়ে। যূথিকা ঘোষের জীবনের পয়লা অঘ্রানের উৎসবকে ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে দেবার শক্তি আছে হিমাদ্রির। নরেনের মনের এই খট্‌কা যে হিমাদ্রির জীবনে একটা সৌভাগ্য। চারু ঘোষের মেয়ের ছলনার জ্বালায় শুধু চুপ ক'রে পুড়ে মরে যাবে না হিমাদ্রি। বিনা দোষের শাস্তি অপমান মাথা পেতে সহ্য করবে না, যতই মাটির মানুষ হোক না কেন হিমাদ্রি। নরেনকে অনায়াসে বলে দিতে পারবে হিমাদ্রি, হ্যাঁ, চারু ঘোষের মেয়ে আমারই হাত ধরে আমাকে বলেছিল, বোম্বাই যেতে চাই না।

মামী বলেন—ছোটলোকের রাগের কোন বিশ্বাস নেই যূথিকা।

যূথিকা ঘোষের মাথাটা আরও ঝুঁকে পড়ে। বিশ্বাস করা যায় না ঠিকই কিন্তু ছোটলোকের মত রাগ করেছে কে? হিমাদ্রির মনের প্রতিহিংসাটা, না নরেনের এই খট্‌কাটা?

মামী বলেন—এখনই সাবধান হয়ে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা উচিত যূথিকা।

ঝুঁকে পড়া মাথাটাকে আরও নামিয়ে দিয়ে আর হাত তুলে যেন লুকিয়ে চোখ ঘষে যূথিকা। হ্যাঁ, সাবধাণ হওয়া উচিত, একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলা উচিত, নইলে পয়লা অঘ্রানের সন্ধ্যায় উৎসবহীন উদাসীনের অন্ধকারে ঢাকা চেহারার দিকে তাকিয়ে হাততালি দেবে গণেশবাবুর বাড়ির লোকগুলি। হো হো করে হেসে উঠবে হিমাদ্রি। ছি ছি, হিমাদ্রিও স্বপ্নের ঘোরে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল। সত্যি ভালবেসে থাকলে কি এরকম ভয়ানক প্রতিশোধ কেউ নিতে পারে?

এক গাদা টাকা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলা যায়, চলে যাও হিমাদ্রি। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে কি?

ভ্রূকুটি করে বলা যায়, কিন্তু তাতেও কোন ফল হবে না মনে হয়। ভ্রূকুটিকে ভয় করবে কেন হিমাদ্রি?

ক্ষমা চেয়ে বলা যায়, চলে যাও, হিমাদ্রি। কিন্তু তাতে কি চলে যেতে রাজি হবে? ক্ষমা করবে কেন?

যদি একটা সুন্দর নকল হাসি হেসে ওর কানের কাছে একটা সুন্দর কথা ঘুষ দেওয়া যায়, আমি তো মনে মনে তোমারই চিরকালের জিনিস; তাতেও কি কোন ফল হবে?

চলে যেতে রাজি হবে না, চারু ঘোষের মেয়ের কথা বিশ্বাসই করবে না হিমাদ্রি।

—যদি ভালবেসে থাক, তবে চলে যাও হিমাদ্রি! যূথিকা ঘোষের নীরব ঠোঁট দুটো যেন হঠাৎ মনে পড়া একটা মন্ত্রকে ধরতে পেরে ফিসফিস করে ওঠে। যূথিকার বন্ধ চোখ, ভেজা চোখ দুটোও যেন দেখতে পায়, যূথিকার কথা শোনা মাত্র গিরিডি ছেড়ে ছুটে চলে গেল হিমাদ্রি। আর একবারও ফিরে তাকালো না। যূথিকাকে বিশ্বাস না করুক, নিজেকে যে বিশ্বাস করে হিমাদ্রি। এইবার এই কথা শোনবার পর না চলে গিয়ে পারবে কেন?

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে যূথিকা বলে—আমি একবার বাইরে ঘুরে আসছি মামী; তোমরা ভয়-টয় পেও না।

মামী উদ্বিগ্নভাবে বলেন—বেশ তো, আমিও না হয় তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

যূথিকা হাসে—চল।

লোহার পুল পার হয়েই বাঁ দিকের সরু সড়ক। পথের দু'পাশের সরু ড্রেনের শেওলা খুঁটে খায় পোষা হাঁসের দল। মাঝে মাঝে ছাই-এর গাদা। তারই পাশে ছড়ানো এঁটো কাঁটা নিয়ে কাকে কুকুরে ঝগড়া করে।

বড় রাস্তার উপর গাড়ি থামিয়ে এই সরু সড়কের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দেয় ড্রাইভার গিরিধারি—ওই যে দিয়ালকে উপর লকড়িকা ছোটা সাইন বোর্ড দিখাচ্ছে, বাস, ওহি আছে হিমুকা ঘর।

এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় যূথিকা। মামীও যূথিকার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন। হ্যাঁ, এই তো হিমাদ্রির ঘর। দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে এক টুকরো কাঠের উপর বড় বড় হরফে লেখা, ডাক্তার হিমাদ্রি শেখর দত্ত, হোমিও।

—কাকে চাই ?

হিমুর ঘরের মাথার উপরে একটা ছোট ঘরের ঘুলঘুলির কাছে একজোড়া চোখ ভাসিয়ে প্রশ্ন করে একটা লোক।

যূথিকা · হিমাদ্রিবাবুকে চাই।

—সে ইখানে নাই ; গিরিডি ছোড়কে চলিয়ে গিয়েছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।—হিমা দ্র নিজেই চলে গিয়েছে মামী।

একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে ছটফট ক'রে আরও উৎফুল্ল হয়ে, চোখের তারা দুটো আরও ঝিকমিকিয়ে, আরও জোরে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা—হিমাদ্রি আমাকেই বিশ্বাস ক'রে পালিয়ে গিয়েছে মামী।

হাসি থামাতে গিয়ে যূথিকার শরীরটা কাঁপতে থাকে ; শরীরের কাঁপুনিটা থামাতে গিয়ে আস্তে হাত তুলে দেওয়ালটাকে ধরতে চেষ্টা করে যূথিকা। আর দেয়ালটা ধরতে গিয়ে সেই ছোট কাঠের ফলকটা ছুঁয়ে ফেলে। এবং কাঠের ফলকটাকে ছুঁতে গিয়ে বড় বড় হরফে লেখা সেই নামটাকেই যেন আঁকড়ে ধরে যূথিকা।

একটা নাম মাত্র। কে জানে কবে কাঠের ঘুণে এই নামটাকেও কুরে কুরে খেয়ে প্রায় মুছে ফেলবে। দেখলেও বুঝতে পারা যাবে না, কার নাম আর কি নাম ?

মামী বলেন—চল যূথিকা।

সুজাতা

শালবনে ঘেরা এই ছোট শহরের কিনারায় ঐ শান্ত বাংলো বাড়িটার নীরব বাতাস আজকাল যখন তখন গুনগুন ক'রে ওঠে। গুনগুন করে একটা দোলনা-দোলানো আর ঘুম-পাড়ানো গান। কখনো আয়া, আর কখনো বা স্বয়ং চারুই গান করে।

প্রায় এক বছর হলো, একটি দোলনা দুলছে এই বাড়ির ভিতরে। চারুর মনের এতদিনের একটা স্বপ্নই যেন সত্য হয়েছে।

বিয়ের পর প্রায় দশটা বছর ধরে শুধু বই পড়ে পড়ে, কাঁটা-কুরুশ নেড়েচেড়ে, সিল্কের আর উলের ফুল তুলে তুলে, আর বাংলোর লনে মরশুমি ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল জীবন। তার পরেই এক নূতন বেদনায় চারুর চোখ দুটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেদিন একটা নূতন প্রাণের কান্না বেজে উঠলো চারুর বুকের কাছে, সেদিন যেন নূতন ক'রে হেসে উঠলো চারুর ঐ হাঁপিয়ে-পড়া।

যে চারু যখন-তখন এই বাংলো বাড়ির নিভৃতে যে-কোন একটা সোফায় ঘুমিয়ে পড়তো, ঘুমোতে এত ভালবাসতো যে চারু, সেই চারুই এখন যেন সারাটা রাত জেগে থাকতে ভালবাসে। কারণে অকারণে আর যখন-তখন ছোট্ট একটি এক বছরের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালই লাগে চারুর। ব্যাপার দেখে হেসে ফেলে উপেন। ঘুম ভাঙালে এত রাগ করতো যে ঘুম-কাতুরে চারু, সে আজ কেমন জব্দ হয়েছে।

চারুও বলতে ছাড়ে না।—মশাই বা কি কম জব্দ হয়েছেন!

উপেন বলে—আমার জব্দের কি দেখলে?

চারু—অফিস থেকে আর ক্যাম্প থেকে এখন সন্ধ্যের আগেই ঘরে ফিরতে হচ্ছে কি না?

উপেন আর প্রতিবাদ করে না। করতে ইচ্ছাও করে না। চারুই আবার একটা পুরনো অভিমানের জের টেনে হেসে হেসে কথা শোনায়।—যাক্, তবু যে মেয়ের টানে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছো, এটাও কি আমার কম ভাগ্যির কথা।

উপেন—শুধু কি মেয়ের টানে?

চারু—রাখুন মশাই, আর কথা বাড়াবেন না। সে-সব কথা কিছুই ভুলি নি। রাত ন'টা পর্যন্ত অফিসের ফাইল না ঘাঁটলে ঘুম আসতো না যার চোখে,

ঘরে যে একটা মানুষ আছে সে কথা ভুলেও একবার ভাবতে পারতো না যে মানুষ······।

উপেন—কিন্তু ন'টা বছর ধরে অফিস যেতে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন আমাকে লেট হতে হয়েছে কেন, কিসের টানে ?

চারুর একটা হাত টেনে ধরতেই উপেনের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে চারু, কিন্তু পারে না। হেসে ফেলে চারু। আজকাল এই বাংলো বাড়ির ভিতরে প্রতি সন্ধ্যাতেই এই রকমই হাসির ঝঙ্কার বেজে ওঠে। দোলনার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে দুজনেই তাকিয়ে থাকে।

এখনো এক বছর বয়স হয় নি, কিন্তু উপেন ও চারুর ভালবাসার জীবনে যে স্বপ্ন আজ স্নিগ্ধ সুন্দর ও কোমল একটি ফুলের মতো রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে আর দোলনায় দুলছে, তার একটা নামও দিয়ে ফেলেছে চারু। ওর নাম রমা।

উপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যের কথা বলতে গিয়ে ঝক্ ক'রে হেসে উঠে চারুর চোখ।—স্বপ্নের মধ্যেই হঠাৎ ঐ নাম ধরে মেয়েটাকে ডেকে ফেলেছিলাম, তাই।

যখন-তখন দোলনার কাছে এসে ঘুমন্ত রমাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে বসে থাকে চারু। রমার গালে গাল ঠেকিয়ে দুর্নিবার এক আদরের আবেশে যেন মুগ্ধ হয়ে ডাকতে থাকে চারু—রমা রম্ রম্। রমা, এই ডাকটা যেন চারুর বুকের ভিতর থেকেই মধুরতার বিহ্বল শোনিতের শিহর হয়ে আপনা থেকেই ভাষা হয়ে ফুটে উঠেছে।

আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখতে থাকে উপেন। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে হিংসুকের মতো একটা আগ্রহ নিয়ে।

—দাও, দাও; ওকে আমার কাছে দাও। তুমি ঐ সোফায় বসে এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

চারুর হাত থেকে রমাকে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি ক'রে বেড়ায় উপেন।

বৃথাই একটা আয়াকে রাখা হয়েছে। নানা কথার মাঝখানে উপেন হঠাৎ আক্ষেপ করে—তুমিই যদি দিনরাত এটাকে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, তবে পয়সা খরচ ক'রে আয়া রাখার দরকার কি ?

চারু বলে—ওসব স্টাইল আমার সহ্য হবে না। আয়া রাখবার দরকার নেই। আয়া-ফায়ার হাতে মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারবো না।

ঠিক কথা। এক বছরের মধ্যে শুধু মাঝে মাঝে দোলনা দোলানো ছাড়া

আয়াকে আর কোন কাজ করতে দেয় নি চারু। আয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে চারুর অন্তরাত্মা।

উপেন অনুযোগ করলে চারু প্রতিবাদ করে—না, না, এ কাজ পরকে দিয়ে হয় না।

—কেন ?

—কেন আবার কি ? নিজের মনের আনন্দকে যেমন পরকে দিয়ে হাসিয়ে নেওয়া যায় না। তোমার পয়সা বাঁচাবার ইচ্ছে থাকলে আয়াকে বিদায় ক'রে দিতে পার।

এই ভাবে রমা নামে মাত্র এক বছর বয়সের শিশু ঐ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে এই বাংলো বাড়ির হাসি গান অভিযোগ আর ঝগড়া সবই যেন মিষ্টি সুরে বাজে। ঐ রমারই জন্মদিন দেখা দিল একদিন। শালবনে ঘেরা ছোট শহরের কিনারায় রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনের বাংলো বাড়ির লনের উপর উৎসবের আয়োজন রঙীন হয়ে উঠলো।

মাইল পাঁচেক দূরে এক পাহাড়ী নদীর স্রোতের উপর রেলওয়ের জন্য ব্রিজ নির্মাণের পর্ব চলছে এখন। বিকাল হবার আগেই ঘরে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো উপেন। ক্যাম্পের অফিসের খাতাপত্র সই করে বাইরে এসে দাঁড়ায় উপেন। ওভারশিয়ার এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

ওভারশিয়ার খুশি মনে জানায়—সংবাদ আছে স্যার।

সুসংবাদ এই যে, কাজ ছেড়ে দিয়ে আর কোন কুলি পালিয়ে যায় নি। কলেরার ভয় কমে গিয়েছে। ডাক্তার এসে পড়েছে। ওষুধ-পত্রও দেওয়া হয়েছে। জল ফিলটার করার ব্যবস্থা হয়েছে। মাত্র দুটো মৃত্যু হয়েছে কাল রাত্রে। আর নতুন করে কোন কেসও হয় নি, মৃত্যুও হয় নি।

খুশি মনে ট্রলির উপর উঠে বসে উপেন। পা চালায় ট্রলিম্যান। ছাতার ছায়ায় বসে উপেন দু'পাশে ফোটা-পলাশের শোভা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পরেই নিজের হাতের ফাইলের ভিতর থেকে ছোট একটি ফটো বের ক'রে মুগ্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে এক বছর বয়সের একটি মেয়ের মুখের ছবি। হেসে ওঠে উপেনের সারা মুখ।

বাংলোর বারান্দায় যখন উপেনের পায়ের শব্দ বেজে উঠলো তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লনের উপর টেবিল সাজাতে আরম্ভ করেছে বয় আর বেয়ারা। আর, ঘরের ভিতর আয়ার সঙ্গে চারুর তর্ক চলছে।

আয়া বলে—বেবিকে আমার কাছে এখন দাও মেমসাব। তুমি তোমার কাজ কর।

চারু বলে—আমার আবার কাজ কি এখন?

আয়া বাইরের বারান্দার দিকে চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—শুনতে পাচ্ছ না, সাহেব এসে পড়েছেন।

হ্যাঁ, শুনতে পায় চারু, বারান্দায় দিক থেকে উপেনের পায়ের শব্দ ধীরে এই ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। রমাকে নিয়ে আয়া চলে যেতেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করে উপেন।

গলার টাই-কলার খুলতে খুলতে উপেন একটা ধূর্ত দৃষ্টি তুলে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—আজ তাহলে তোমার মেয়ের জন্মদিন।

চারু—আজ তোমার মেয়ের জন্মদিন।

উপেন—তার পর?

চারু—তার পর মানে?

উপেন—তার মানে আর এক বছর পর?

চারু—আবার জন্মদিন হবে রমার।

উপেন—আমি জানতে চাই, প্রত্যেক বছর কি শুধু রমারই জন্মদিন হবে?

চারু ভ্রূকুটি করে—সাবধান।

উপেন—কি?

চারু—আর নয়। একটিকে নিয়েই মায়ার জ্বালায় মরছি, চোখের ঘুম পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এই একটিই ভাল। রক্ষে করুন ভগবান, আর চাই না।

গায়ের শার্ট খুলে হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে চারুর মুখের দিকে তাকাতেই চারুর চোখে পড়ে একটি জিনিস। উপেনের কনুইয়ের কাছে সুতো দিয়ে একটি মাদুলি।

চমকে ওঠে চারুর চোখ—সর্বনাশ! ওটা তুমি এখনো পরে রয়েছো?

ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে এবং মাদুলিটাকে খুলে ফেলবার জন্য হাত বাড়ায় চারু, কিন্তু উপেন সরে যায়।—থাক না, তাতে কি হয়েছে?

চারু—না আর নয়।

উপেন—কি যে বল? পিসিমার দেওয়া এমন একটা পয়া জিনিস, গুরু-জনের ইচ্ছের অমান্যি করতে নেই। একদিন তুমিই না রাগ করেছিলে, এই মাদুলি পরতে চাইনি বলে?

চারু—আর রাগ করবো না।

উপেন—কেন ?

চারু—মাদুলির কাজ তো হয়েই গিয়েছে।

উপেন সরে যায়, কিন্তু চারু ছাড়ে না। স্বামী-স্ত্রীতে একটা ধস্তাধস্তির মতই ব্যাপার বেধে ওঠে এই বাংলো বাড়ির এক কক্ষের নিভৃতে।

—না, আর নয়, রক্ষে করুন ভগবান। বলতে বলতে সজোরে উপেনের হাতটা চেপে ধরে মাদুলিটা এক টান দিয়ে খুলে ফেলে চারু, আর ব্লাউজের গলার ফাঁক দিয়ে টুপ ক'রে ফেলে দেয়। সরে যায় চারু।—বেঁচে থাক আমার ঐ একটিই, আর চাই না।

যেন পাল্টা একটা মিষ্টি প্রতিশোধ নেবার জন্য চারুর কাছে এগিয়ে আসতে থাকে উপেন। অকস্মাৎ বাইরের বারান্দায় ধ্বনিত হয় একটা কণ্ঠস্বর। হুজুর!

বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায় উপেন। উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

আবার ডাক শোনা যায়।—হুজুর!

জানলার কাছে এগিয়ে এসে কৌতূহলের চক্ষু নিয়ে বাইরের বারান্দার দিকে তাকায় উপেন, চারু প্রশ্ন করে—কি ?

উপেন—একটা মেয়ে।

চারু বিস্মিত হয়—মেয়ে ?

উপেন—হ্যাঁ, রমার মতনই।

চারু—তার মানে ?

উপেন—এই এক বছর বয়স, সামান্য কিছু বেশিও হতে পারে, এইটুকু একটা মেয়ে।

বারান্দার প্রান্তে এক কোণে একজন চৌকিদার আর দুজন দীন দরিদ্র চেহারার কুলি শ্রেণীর মানুষ দাঁড়িয়েছিল। আর, বারান্দায় মেজের ওপর শোয়ানো ছিল এক টুকরো ছেঁড়া কম্বল জড়ানো দেড় বছর বয়সের একটা ঘুমন্ত মেয়ে।

ধমকের মত কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে উপেন।—কি চাও ?

চৌকিদার—এই মেয়েটার কি হবে হুজুর ?

উপেন—তা আমি কি জানি। ওটা কার মেয়ে ?

একজন কুলি—আপনার ট্রলি-কুলি বুধনের মেয়ে।

উপেন—বুধন ? সেই ভল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা লোকটা ?

কুলি—হ্যাঁ হুজুর।

উপেন—লোকটা কি পালিয়েছে ?

চৌকিদার—মরেছে।

উপেন—অ্যাঁ

চৌকিদার—লোকটা মরেছে, লোকটার বউটাও মরেছে।

উপেন—কেমন ক'রে?

চৌকিদার—কলেরাতে।

উপেন—কিন্তু, আমার অপরাধটা কি হলো? এখানে ওদের মেয়েকে নিয়ে এসেছ কেন?

চৌকিদার—কোথায় কার কাছে থাকবে মেয়েটা?

ধমক দেন উপেন—আমি কি জানি।···যাও যাও; সরে পড়।

মোটর গাড়ির হর্ন শোনা যায়। রমার জন্ম দিনের উৎসবে নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসতে আরম্ভ করেছে। উপেন আরও ব্যস্ত হয়ে হাঁক দেয়—যাও যাও, চলে যাও। এখানে এসে গোলমাল করো না।

ব্যস্তভাবে একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় উপেন, উৎসবের আসরে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করার জন্য। চৌকিদার আর কুলি দুজনে কম্বলে জড়ানো শিশুকে নিয়ে লনের আর এক প্রান্তের শেষ কোণে এক গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকে।

এতক্ষণ ধরে অপলক চোখ নিয়ে আগন্তুক মেয়েটার দিকে দেখছিল চারু। মাঝে মাঝে ছটফট করছিল চোখ দুটো। উপেন চলে যেতেই, কেন যেন ব্যস্তভাবে একবার ডাক দিল চারু—আয়া, আয়া।

আয়া আসতেই আবার বারান্দায় এসে দেখতে পায় চারু, চলে গিয়েছে লোকগুলি।

আয়া প্রশ্ন করে—কি?

চারু—কিছু না।

আয়ার হাত থেকে রমাকে কোলে নিয়ে লনের উপর সাজানো আসরের দিকে এগিয়ে যায় চারু।

চায়ের আসর। অভ্যাগতরা রমাকে আদর করলেন। একটা টেবিলের উপর নানা উপহারের এক স্তূপ তৈরি হয়ে গেল। বয় চা পরিবেশন করে। অভ্যাগতেরা আলাপ করেন।

মাত্র দশ বার জন অভ্যাগত। কতিপয় মহিলাও আছেন। সকলেই সম্পন্ন সমাজের মানুষ। কেউ অফিসার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ জমিদার। একটা

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, বেশির ভাগ অভ্যাগতেরই সঙ্গে একটি ক'রে কুকুর। কারও কোলের উপর সুন্দর একটি তিব্বতী পুড্‌ল। কেউ শিকল ধরে কাছে টেনে রেখেছেন তাঁর প্রিয় হাউণ্ড আর টেরিয়ারকে। কারও স্প্যানিয়েল সামনের দু'পা দিয়ে প্রভুরই গলা জড়িয়ে অনবরত কান দোলায়।

নিজের নিজের কুকুরের প্রতি কার কত মায়া তাই নিয়ে একটা আলোচনার কলরব জাগে আসরে। কার কুকুর কি খেতে ভালবাসে আর কত বুদ্ধিমান, ব্যাখ্যা ক'রে বলতে থাকেন অভ্যাগতেরা। সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রীতির কাহিনী বর্ণনা করে এস-ডি-ও চক্রবর্তী। কুকুরের মুখের কাছে একটি বিস্কুট এগিয়ে দেন চক্রবর্তী। কুকুরটা কামড় দিয়ে বিস্কুট ভাঙে। সেই ভাঙা বিস্কুট নিজের মুখেই ফেলে দিয়ে চক্রবর্তী বলেন—আমার টম সারা রাত আমার বুকের উপরেই শুয়ে থাকে। এযে কি মায়া, সেটা আর বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আশ্চর্য, কোথা থেকে এরকম মায়া আসে মানুষের মনে!

আসরের চায়ের টেবিলের কাছে কখনো বসে, আর কখনো ঘুরে বেড়াতে থাকে উপেন আর চারু। এরই মধ্যে হঠাৎ মাঝে মাঝে দুজনেরই চোখের দৃষ্টি ছুটে যায় লনের প্রান্তে একটা গাছতলার দিকে, যেখানে তখনো চুপ ক'রে বসে আছে চৌকিদার, সেই দুজন কুলি, আর ঘাসের উপর শোয়ানো ও কম্বলে জড়ানো সেই শিশু।

মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায় উপেন আর চারু। একটা অস্বস্তির ভাব হঠাৎ বিচলিত করে চোখের দৃষ্টি। তারপর আবার প্রসন্ন হাস্যে অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ করে।

বেয়ারাকে কাছে ডেকে উপেন দূরের গাছতলার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেয়—ওদের চলে যেতে বল।

চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন—কে ওরা?

উপেন—কোথা থেকে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে বলছে...।

সাগ্রহে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান চক্রবর্তী—লেপার্ডের বাচ্চা?

উপেন—না।

চক্রবর্তী—হরিণের? আমি জীবজন্তুর বাচ্চা বড় ভালবাসি মিস্টার রায়।

উপেন হাসে—না, না, হরিণের বাচ্চা নয়।

গাছতলার দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ব্যস্তভাবে চক্রবর্তী বলেন—ভালুকের বাচ্চা বোধ হয়?

উপেন বাধা দিয়ে বলেন—মানুষের বাচ্চা।

—মানুষের বাচ্চা! হতাশ হয়ে আর যেন ক্ষুদ্র একটি তুচ্ছতার ধিক্কার ধ্বনিত ক'রে বসে পড়েন চক্রবর্তী!

উৎসবের আসর ভাঙতেই লনের প্রান্তে গাছতলায় বেয়ারার গর্জন শুনে এগিয়ে যায় উপেন আর চারু। উপেন বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে চৌকিদারকে বলে—এই নাও, আর এই মুহূর্তে ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যাও!

চৌকিদার বলে—যাব কোথায় হুজুর? এই মেয়েকে এই তল্লাটের কেউ ঘরে রাখতে রাজী হবে না।

—কেন?

—খুব ছোট জাতের মেয়ে। কাছাকাছি দশ গাঁয়েও ঐ জাতের কোন লোক নেই।

—অন্য গাঁয়ে খোঁজ কর।

—করবো হুজুর, কিন্তু সেই কটা দিন কোথায় থাকবে মেয়েটা?

একজন কুলি বলে—মেয়েটাকে তো শেয়ালে নিয়েই যাচ্ছিল, ভাগ্যিস আমরা হঠাৎ পৌঁছে গেলাম।

চারুর চোখ আতঙ্কে ও বেদনায় শিউরে ওঠে। উপেনও যেন অস্বস্তি আর অপ্রস্তুত অবস্থায় বার বার চারুর মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

উপেন আমতা আমতা ক'রে চারুকে উদ্দেশ্য ক'রেই বলে, যেন একটা পরামর্শ খুঁজছে—তাহলে···যাকৃগে···এসব ঝঞ্ঝাট ··কি বল···নিয়েই যাক।

চারু—কিন্তু কি বলছো তুমি? শেয়ালে নিয়ে যাবে মেয়েটাকে?

উপেন—না, তা বলছি না! কিন্তু···।

চারু ডাক দেয়—আয়া।

উপেন যেন এতক্ষণে সাহস পেয়ে আরও জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—আয়া। আয়া আসতেই চারু বলে—মেয়েটাকে কটা দিন পুষতে পারবে?

আয়া—পারবো না কেন, আমার কাজই তো তাই।

চারু—তাহলে নিয়ে চল মেয়েটাকে···গরম জল দিয়ে চান করিয়ে একটা গরম জামা কাপড় পরিয়ে দাও এখনই।

চৌকিদার ও কুলিরা খুশি হয়ে আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম জানায়—সেলাম সাব, সেলাম মেমসাব।

উপেন আর চারু, দুজনেই যদি নিজের নিজের মনটাকে চিনতে পারতো,

তবে বোধ হয় দুজনে আজই সাবধান হয়ে যেত, এবং অরণ্য শ্বাপদের শাবকের মত অতি ছোট জাতের একটা মেয়েকে এই বাংলো বাড়ির এক নিভৃতে প্রাণ-বাঁচানো একটা আশ্রয় দিত না। উপেন জানে চারুও বিশ্বাস করে, এই ঝঞ্ঝাট মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য। তারপর, নিকটে বা দূরের গাঁয়ের ঐ জাতের কোন লোক খুঁজে বের ক'রে মেয়েটাকে তার হাতে গছিয়ে দিতে হবে। তার জন্য হয়তো কিছু টাকা চাইবে লোকটা। নিক না, একশো বা দুশো টাকা নিয়ে কোন জাতের লোক যদি মেয়েটাকে পুষতে নিয়ে যায়, তবে ভালই তো। চৌকিদার বলে গিয়েছে, জাতের লোক খুঁজে আনবে। উপেন বলে দিয়েছে—যত শিগগির পার নিয়ে এসো।

এই বাংলো বাড়ির সীমার মধ্যে একটা মানুষের মেয়ের আবির্ভাবকেও অতি সাধারণ একটা ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে চারু আর উপেন। বাড়ির দেওয়ালের খোপের মধ্যে যেমন কদিনের জন্য নতুন শালিক এসে ঠাঁই নেয়, আবার কদিন পরেই উধাও হয়ে যায়, তেমনি একটা ঘটনা মাত্র। মেয়েটা আছে কদিন পরে কেউ এসে নিয়ে যাবে, বাস্, এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করার ব্যাপার এর মধ্যে নেই।

ক্লাবের ঘড়িতে যখন রাত নটার ইঙ্গিত ঢং ক'রে বেজে ওঠে, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি থামায় উপেন, আর ঘরে ফিরে যাবার কথা মনে পড়ে।

বাংলো বাড়ির দুই কক্ষে তখন দুটি শিশু-জীবনের ঘুমন্ত রূপ নিঃশব্দে ফুটে রয়েছে। একটি ঘরে চারুর বুকের কাছে ঘুমন্ত রমা, পীযুষভারে কোমল একটি উত্তাপের নীড়ের মধ্যে সুখসুপ্ত হয়ে রয়েছে একটি শিশু মেয়ে। আর, অন্য একটি ঘরে আর একটি শিশু মেয়ে, নতুন বিছানায় একা একা ঘুমোয়, তার তৃষ্ণার্ত অধরের কাছে দুধের বোতল শিথিলভাবে পড়ে রয়েছে। একটি শিশু হলো এই বাড়ির এক দম্পতির শোণিতস্নেহের সৃষ্টি। আর একটি শিশু—দেখে মনে হয়, এই পৃথিবীতে যেন একা একা হঠাৎ চলে এসেছে, এখনো মানুষের কোল পায়নি। বাংলো বাড়ির দেয়ালঘড়িতে একতারার সুরের টোকার মত রিম-রিম ক'রে সময়ের সঙ্কেত বাজে। চমকে ওঠে চারু, তন্দ্রা ভেঙে যায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গী করে, আর আপন মনেই আক্ষেপ করে—ইস, ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান আর কোন দিন হবে না! ন'টা বাজলো, এখনো ঘরে ফেরার নাম নেই।

কি যেন মনে পড়ে যায় চারুর। ধীরে ধীরে ওঠে। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। এই বারান্দা আর ও-বারান্দা পার হয়ে ছোট একটি ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় ঠেলা দেয়। দেখতে পায়, মেজের উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে আয়া। তারপরেই ঘরের আর এক প্রান্তে দৃষ্টি ছুটে যায়। দেখতে পায়, সদ্য ফোটা ফুলের কুঁড়ির মত একটা ঘুমন্ত মেয়ের মুখ, তার ঠোঁটের কাছ থেকে সরে গিয়েছে দুধের বোতল। একটা স্নেহশীল ও কঠিন জড় পদার্থ ঐ বোতলটা।

যেন মনের ভুলেই হঠাৎ দুধের বোতলটাকে মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে দেবার জন্য হাত তুলে এগিয়ে যায় চারু। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়ায়। থাক, এতটা বাড়াবাড়ির দরকার নেই। তাছাড়া একটা ছোট জাতের বাচ্চাকে ছোঁয়াছুঁয়ি করারও দরকার মনে পড়ে না। আয়াকেই ডাক দেয় চারু। ঘুম থেকে উঠে আয়াই নিজের হাতে দুধের বোতলটাকে মেয়েটার মুখে ছুঁইয়ে দেয়।

পায়ের শব্দ বাজে বাইরের বারান্দায়। ফিরে এসেছে উপেন। সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে হাঁক দেয় উপেন—সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি এরই মধ্যে!

চারু এসে বলে—কি বললে?

উপেন—মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

চারু—রমাও ইঞ্জিনিয়ারিং করে নাকি, যে রাত ন'টা পর্যন্ত জেগে থাকবে?

উপেন—আমি তোমার মেয়েটার কথা জিজ্ঞাসা করছি না। ঐ যে, নতুন একটি অম্বালিকা এসেছে···সেই মেয়েটা।

চমকে ওঠে চারু—বেশ তো, মুখে মুখে সুন্দর একটা নামও দিয়ে ফেললে দেখছি।

উপেন—হ্যাঁ, নামটা হঠাৎ মুখে এসে গেল, কি করবো বল? রমার নামটাও তো তুমি হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে বলে ফেলেছিলে, না?

গম্ভীর হয় চারু—হ্যাঁ।

উপেন—কি করছে অম্বালিকা?

চারু—আয়ার ঘরে ঘুমোচ্ছে।

যে পিসিমার দেওয়া মাদুলি নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হাসাহাসির ব্যাপার হয়ে গেল, তিনি হলেন উপেনের দূর সম্পর্কের পিসিমা। শ্যামবাজারে এখনো

সেকেলে ঢঙের চক-মিলান যে-সব দালান বাড়ি দেখা যায়, এবং তারই মধ্যে যে-বাড়িটা আজও পুরনো সৌষ্ঠব নিয়ে অটুট রয়েছে, সেই বাড়িটা হলো পিসিমার বাড়ি। পিসিমারই সম্পত্তি। সংসারে একটি মাত্র স্নেহের দায় আছে পিসিমার, তার নাম অধীর। পিসিমার নাতি। পিসিমার একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে। মেয়ে মারা যাবার পর এই নাতিকে কোলে নিয়ে শোক ভুলেছিলেন পিসিমা।

অসুস্থ শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য, অর্থাৎ চিকিৎসকের নির্দেশে হাওয়া বদল করতে মাঝে মাঝে ছোটনাগপুরের শালবনের কোলে ছোট পাহাড়ের গা-ঘেঁষা, সুবর্ণরেখার এক স্রোতের ধারে এই ছোট রেল-টাউনে এসে আত্মীয় উপেনেরই এই বাংলো বাড়িতে থেকে যেতেন পিসিমা, এখানে এসেও নাতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে মাঝে মাঝে সংসারের মায়ার তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতেন। চারুর ছেলে-পিলে হয় না, চারুর সংসারটাকেই তাই বড় মায়াহীন আর শূন্য বলে মনে হয়েছিল পিসিমার। কিন্তু এইবার খুশি হয়েছেন, ততদিনে এই বাড়ির বুকে এক শিশুর কান্নায় সংসারের মায়া জেগে উঠেছে। সার্থক হয়েছে তাঁর মাদুলি।

সেই কবে, মাত্র দু'মাস বয়সের রমাকে আদর ক'রে একদিন চলে গেলেন পিসিমা। যাবার আগে অনেক কথাই বলে গেলেন পিসিমা। কলকাতায় কবে বাড়ি করবে উপেন, কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন। সমাজের কথা বলেন, এইটুকু শিশু রমারও ভবিষ্যতের অর্থাৎ বিয়ের কথা বলেন। নিজের বংশগর্বের উল্লেখ ক'রে উপেনকে স্মরণ করিয়ে দেন, রমাকে বড় বংশের ঘরে দিতে হবে। বংশে বড়, বিষয়ে বড়, শিক্ষায় বড়, এমনই একটি ঘরে। পিসিমার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যেন একটা উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং মনে হয়, বড় বলতে তিনি তাঁরই ঘরের কথা বলছেন। উপেনের টাকাকড়ি বেশ আছে, পিসিমা ভুলতে পারেন না সেই সত্যও।

কলকাতা থেকে এক বিখ্যাত কথকঠাকুরকে নিয়ে এসে এইখানেই এক বছর বয়সে রমার জন্মমাসের সারা মাসটাই বেশ ঘটা ক'রে চণ্ডীপাঠ করাবেন, এই আনন্দের একটা ইচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়েছেন পিসিমা। কিন্তু আজও আসতে পারেন নি। মাসটা যে শেষ হতে চললো? কেন এলেন না পিসিমা? তিনি কি আবার বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছেন? চিঠি দেওয়া হয়েছে পিসিমাকে, কিন্তু সে চিঠির উত্তর আজও এল না কেন?

উপেন আর চারুর চিন্তার প্রশ্নগুলিকে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়ে সেদিনই কলকাতা থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে উপস্থিত হলেন সেই বিখ্যাত কথকঠাকুর। গঙ্গা

জল ভরা প্রকাণ্ড একটা তামার কলসী নিজের হাতেই বহন করে স্টেশন থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন পিসিমার চিঠি। নাতি অধীরের পরীক্ষা, তাই আসতে পারলেন না পিসিমা।

কথকঠাকুর বললেন—কথকতা আমার পেশা নয়। আমি সত্যিই কথক নই। বলতে পারেন, ধর্মপ্রবক্তা। আমি ইংরাজীর অধ্যাপক। চণ্ডীপাঠ করি নিজের মনের তৃপ্তির জন্য, এবং যারা ধর্মের তত্ত্ব একটু করে বুঝতে চায়, তাদের জন্য।

শুনে একটু যেন ঘাবড়েই যায় উপেন, এবং সত্যিই বোকা ছাত্রের মত একটু ভয় পেয়ে বলে ফেলে—নিশ্চয় কষ্ট করে বুঝতে চাই স্যার। থাকুন আপনি, আর যতদিন ইচ্ছে চণ্ডীপাঠ করুন।

অধ্যাপক বলেন—শুনেছি জায়গাটার হাওয়া বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ, অন্তত পনরটা দিন থেকে দেখি শরীরটা একটু···অর্থাৎ চণ্ডীর অন্তত দুটো অধ্যায় সমাপ্ত করার পর···

কিন্তু কি আশ্চর্য, মাত্র আর একটা ঘণ্টা পরেই দেখতে পায় উপেন ও চারু, ইংরাজীর অধ্যাপক গঙ্গাজলের সেই প্রকাণ্ড কলসীটা হাতে নিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। উপেন ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—সে কি? আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

অধ্যাপক তাঁর কপালে টোকা দিয়ে বলেন—যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেতে হলো। আপনার আয়ার কাছে শুনলাম এবং স্বচক্ষেও দেখলাম। আপনি একটা অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসে লালন করছেন।

উপেন—আশ্চর্য!

অধ্যাপক—আশ্চর্য হতে নেই উপেনবাবু। ধর্ম-বিধিতে বলে, অন্ত্যজের স্পর্শই শুধু দোষাবহ নয়, তার সান্নিধ্যও দোষাবহ। শুধু ছোঁয়াছুঁয়ি নয়, ওসব বস্তু নিকটে রাখাও চলে না। আপনি শিক্ষিত বিদ্বান্ মানুষ, নিশ্চয় জানেন যে, সায়েন্সেও এই ভয়ের কথা লেখা আছে।

উপেন—কি কথা?

অধ্যাপক—অন্ত্যজ মানুষের শরীর থেকে এক রকমের গ্যাস বহির্গত হয়, সে গ্যাস সদ্বংশীয়ের দেহ মন ও আত্মার ক্ষতি সাধন করে।

উপেন—এরকম গ্যাস কি কখনও দেখতে পাওয়া গেছে?

অধ্যাপক—না। আপনি কি কখনো ভাইটামিন দেখেছেন? ভাইটামিন চক্ষে দেখতে পাওয়া যায় কি?

উপেন—না।

অধ্যাপক হাসেন—তাহলে ভাইটামিন কি মিথ্যা ?…আচ্ছা, আসি, বিদায় নিতে আজ্ঞা দিন তাহলে।

চলে গেলেন ধর্মপ্রবক্তা অধ্যাপক। চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে গিয়েই হেসে ফেলে উপেন। কিন্তু চারু হাসতে পারে না। চারু বলে—আমার সত্যিই কেমন ভয় করছে।

উপেন—কিসের ভয় ? অস্থির শরীর থেকে যে ভয়ানক গ্যাস বের হয়ে আমাদের দেহ মন ও আত্মার একেবারে।…

চারু—ঠাট্টা ছেড়ে দাও। ভদ্রলোক একটি বেলাও না থেকে, মুখে একটু জলও না দিয়ে চলে গেলেন, এটা কি ভালো হলো ?

উপেন—আমাকে যদি জিজ্ঞেসা কর তবে বলবো, খুব ভাল হলো। এই সব গোবর মাখানো সায়েন্সকে যারা বিশ্বাস করে তাদেরই অকল্যাণ হয়। ঐরকম লোকের কাছ থেকে চণ্ডীর ব্যাখ্যা শুনেও কোন কল্যাণ হয় না।

হ্যাঁ, একটা কথা ভাবতে খারাপ লাগছে উপেনের। পিসিমা দুঃখিত হবেন। পিসিমা খুব বেশি রাগ করেও ফেলতে পারেন। যাই হোক, পিসিমার পক্ষে বেশি দিন রাগ ক'রে থাকা সম্ভব হবে না। কারণ যাকে নিয়ে এই সমস্যা, সে আর এখানে কতদিন ?

স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা হয়। একটা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা। এই আলোচনা শুনলে মনে হয় দুটি মানুষ যেন নিজের মনটাকে সন্দেহ করতে পারছে।

উপেন বলে—সমস্যাটা কি জান ? কুকুর বেড়ালও দশটা দিন কাছে থাকলে মায়া পড়ে যায়। আর এটা তো হলো মানুষের মেয়ে। ছোট জাতের হোক, আর যারই হোক, একটা মানুষের বাচ্চা তো বটে ! বেশিদিন কাছে রাখা উচিত নয়।

চারু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে—ঠিক বলেছো। আমি আয়াকে বলে দিয়েছি। মেয়েটাকে দূরে দূরে রাখবে।

উপেন—হ্যাঁ, ওসব জিনিসের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি ছোঁয়াছুঁয়ি না হওয়াই ভাল।

চারু—জাতটাও তো ভাল নয়।

উপেন—আসল কথা হলো, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই একটা মায়া পড়ে যেতে পারে।

এই আলোচনা শুনলে মনে হয়, নিজের নিজের মনকে চিনতে পেরেছে দুজনেই, তাই আগে থেকেই সাবধান হবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করছে দু'জনে।

আবার স্মরণ করিয়ে দেয় চারু—চৌকিদারকে তাড়া দাও, যেন তাড়াতাড়ি জাতের লোক নিয়ে আসে আর মেয়েটাকে নিয়ে যায়।

ক'দিন পরের ঘটনাতেই কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যায়, নিজের নিজের মনকে চিনতে ভুল করেছে দুজনেই। একটা পরের মেয়ে তাকে ছোঁয়াও উচিত নয়, কারণ ছোঁয়াছুঁয়ি হলে মায়া পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এই মায়া এড়াবার শক্তি দুজনের কার কতখানি আছে, সেটা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারে নি দুজনের একজনও। এত যুক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করলো দুজনে, সেই প্রতিজ্ঞাটাই ঠুনকো কাচের মত ছোট একটি ঘটনায় ভেঙে গেল, আর তার ফল এই হলো, যে, দুজনেই দুজনের উপর রাগ ক'রে আর অভিযোগ ক'রে আর একটা সমস্যা সৃষ্টি ক'রে বসলো।

সাতদিনের জন্য দূরের একটা লাইন দেখার জন্য সফরে বের হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার উপেন। ফিরে এসে যখন বাংলো বাড়ির ফটকে প্রবেশ করে উপেন, তখন দেখতে পায়, আয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আয়ার কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে।

চেঁচিয়ে ডাক দেয় উপেন—রমা, রমু, রমু। আয়া কাছে আসছে না দেখে হাত তুলে ইঙ্গিতে কাছে আসতে বলে। আয়া কাছে আসতেই উপেনের দুই চক্ষু যেন একটা স্পর্শে হেসে ওঠে···এঁ্যা, এটা কে রে? এটা সেই অম্বালিকাটা না?

আয়া হাসে। উপেন বলে—ভয়ানক দুষ্টু হবে এই মেয়েটা, দেখছো না কি-রকমের চোখ?

বলতে বলতে মেয়েটার গাল টিপে আদর ক'রে ফেলে উপেন—অম্বি·· টাট্‌ টাট্‌।

জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে ভ্রূকুটি করে চারু। উপেন ঘরে প্রবেশ করতেই চারু প্রায় একটা ঝগড়ার মত ব্যাপার বাধিয়ে তোলে—তুমি ছুঁলে কেন মেয়েটাকে?

—তাতে কি হয়েছে? আমার জাত গিয়েছে?

—জাত যাবে কেন, কিন্তু নিজের কথাই তো রাখতে পারলে না। আদর করার জন্য তোমার নিজের মেয়ে ঘরে নেই?

সেই সন্ধ্যাতেই প্রতিশোধ নিল উপেন। হঠাৎ চারুর কাছে ব্যস্তভাবে ছুটে এসে প্রশ্ন করে থার্মোমিটার আছে?

—আছে। কেন?

—মেয়েটার জ্বর এসেছে বোধ হয়।

—কোন্ মেয়েটার ?

—অম্বির। নিশ্চয় সাংঘাতিক জ্বর, বোধ হয় গা পুড়ে যাচ্ছে।

চমকে ওঠে, বিচলিত হয় চারু।—জ্বর কেন হলো ? কি আশ্চর্য, ইস, পুড়ে যাবে কেন ? কি যে বলছো, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

উপেন বলে—মেয়েটার মুখটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

আয়ার ঘরের ভিতর এসে ঢোকে চারু। সঙ্গে সঙ্গে উপেনও আসে। কিন্তু হঠাৎ ভুল করলো চারু। অম্বির কপালে হাত দিয়ে বার বার যেন একটা শিশুর অসহায় জীবনে কোমল স্পর্শ অনুভব করে চারু। আশ্চর্য হয়ে বলে—কই, জ্বর বলে তো মনে হচ্ছে না।

সেই মুহূর্তে দেখতে পায় চারু, মুখ টিপে হাসি লুকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে উপেন।

উপেন বলে—নিজের কথাই তো রাখতে পারলে না, মেয়েটাকে ছুঁয়ে ফেললে কেন ?

রাগ ক'রে উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেলে চারু। তারপর আবার শান্ত চিত্তে আর শান্ত স্বরে দুজনের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে।—আসল কথা কি জান, কাছে রাখলে এরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হবেই, আর··।

উপেন—আর মায়া-টায়া পড়বেই।

চারু—কাজেই ··

উপেন—কাজেই তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া ভাল। নিজের মেয়ে নিয়েই উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার তাল সামলাতে পারে না মানুষ, তার ওপর যদি একটা পরের মেয়েকে নিয়ে···না, আর দেরি করা উচিত না আর দু'একমাসের মধ্যে মধুপুরে বদলি হতে হবে। তার আগেই মেয়েটাকে ওর একটা জাতের লোকের কাছে।···

পিসিমার চিঠি এসেছে।—সকল ব্যাপার শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তুমি জান তুমি কত উচ্চ সদ্বংশের সন্তান। তোমাদের সাতপুরুষে কেহ কুলীন ব্যতীত অন্য কোন নীচ ঘরের সহিত কুটুম্বিতা পর্যন্ত করে নাই। ভাবিয়া পাই না, তুমি কি করিয়া তোমার জাতের উচ্চতা ও শুচিতা ভুলিয়া একটি অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে স্থান দিতে পার। আশা করি, পত্রপাঠ উহাকে বিদায় করিয়া দিবে।

পিসিমার চিঠি পড়ে ক্ষুব্ধ হয় উপেন, কিন্তু পিসিমার উপর ক্ষুব্ধ হতে পারে না। পিসিমা ঐ জাতের বড়াই নিয়েই তাঁর সারা জীবন ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। কলকাতায় যখন কলেজে পড়তো উপেন, তখন প্রতি রবিবার এই পিসিমারই বাড়িতে এসে খেয়ে যেতে হতো। পোলাও থেকে পায়েস বিশ রকমের খাবার নিজের হাতে রান্না করে উপেনকে খাওয়াতেন এবং খাইয়ে খুশি হতেন পিসিমা। —আমার সব কুটুম্বের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বড় বংশের ছেলে উপেন। তাই তো তোমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করি। পিসিমার স্নেহের কারণটা যাই হোক, স্নেহটা তো আর মিথ্যে নয়। পিসিমার সম্পর্কে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার টান অনুভব করে উপেন। এমন পিসিমা দুঃখিত না হলেই ভাল।

অম্বির কথাটা বার বার ভাবতে হচ্ছে। পিসিমা যাই বলুন, উপেন আর চারু ঠিক জাত বাঁচাবার সমস্যা নিয়ে মনটাকে দুশ্চিন্তায় বিব্রত করছে না। অম্বি নামে ঐ মেয়েটারও যে একটা ভবিষ্যৎ আছে।

মেয়েটার ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে গিয়েই সমস্যটা অনুমান করতে পারে উপেন আর চারু। এই মেয়েকে তো চিরকাল কাছে রাখা যাবে না। ভিন জাতের আর ছোট জাতের একটা মেয়েকে বড় ক'রে তুললেই আপনজন হয়ে যাবে না মেয়েটা। সমাজ আছে, সমাজের নিয়ম আছে। মেয়েটাকেও ভবিষ্যতে একটা সমস্যায় পড়তে হবে।

কিছুদিন মাত্র কাছে রাখতে হবে, কিন্তু এই কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটার উপর যেন মায়া পড়ে না যায়। মাত্র এইটুকু হলো উপেন আর চারুর মনের দাবি।

বদলি হবার দিন যতই এগিয়ে আসে, ততই চৌকিদারকে তাড়া দেয় উপেন। শেষে একদিন বদলি হবার দুদিন আগে সমস্যা থেকে একেবারে মুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে গেল উপেন আর চারু।

বাংলোর বারান্দায় বসে বই পড়ছিল উপেন। দূরে লনের বেড়ার গা ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আয়া, কোলে অম্বি। হঠাৎ ফটকের কাছে আগন্তুক কয়েকটা মূর্তিকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে উপেন। আসছে চৌকিদার, সঙ্গে আরও তিনজন লোক।

চৌকিদারকে দেখতে পেয়েই বিচলিত হয়, আর ছটফট ক'রে বারান্দায় এসে ডাকতে থাকে উপেন।—আয়া আয়া! শিগগির এদিকে চলে এস।

আয়া নিকটে আসে। চৌকিদার এগিয়ে আসছে। উপেন রাগ ক'রে ধমক দেয় আয়াকে—ওখানে ঘুরঘুর করছো কেন? শিগগির ঘরের ভেতর চলে যাও।

আয়া ঘরের ভিতর চলে যাবার পর-মুহূর্তে উপেন যেন সন্ত্রস্তের মত একলাফে বারান্দা থেকে সরে গিয়ে অন্য ঘরের ভিতর লুকিয়ে পড়ে। বারান্দায় চিৎকারের মত কর্কশ কতগুলি আহ্বানের স্বর বাজতে থাকে—হুজুর, হুজুর!

যেন এই আহ্বানের শব্দগুলি সহ্য করতে গিয়ে আরও বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে উপেন। আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে জানালার কাছে এসে একবার বাইরে উঁকি দেয়, তারপর জানালা বন্ধ ক'রে দেয়।

চারু বিস্মিত হয়—এ কি হচ্ছে?

উপেন—ওরা এসে গেছে।

চারু—কারা?

উপেন—ঐ ওরা, অস্থির জাতের লোক।

থরথর ক'রে হঠাৎ কেঁপে ওঠে চারুর দুই চোখের দৃষ্টি। ··কই দেখি।

স্বামী আর স্ত্রী একসঙ্গে দৃষ্টি তুলে আবার খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বারান্দার দিকে তাকায়।

চৌকিদার বলে—পঞ্চাশ টাকা আর কিছু কাপড় চোপড়·· আর এক-আধটা কম্বল···এই পেলেই ওরা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে পুষতে রাজী আছে হুজুর।

উপেন হতভম্বের মত চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে · খুব কম টাকাই তো দাবি করেছে, কিন্তু লোকগুলি ভাল কি মন্দ বুঝতে পারছি না।

চারু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে···ঝাঁটা মার ··দূর দূর দূর!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে মারমূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে উপেন···ভাগো ভাগো ভাগো। আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর পরের মেয়েকে মানুষ করতে এসো। যত সব ইডিয়ট হামবাগ্!

চৌকিদার ভীতভাবে বলতে থাকে··সেলাম হুজুর, যাচ্ছি, হুজুর, ঠিকই বলেছেন হুজুর।

অমানুষগুলিকে তো বিদায় ক'রে দেওয়া হলো, আর হাঁপও ছাড়লো উপেন আর চারু। কিন্তু সমস্যার কথাটা দুজনেই চিন্তা না করে পারে না। এইভাবে যদি মেয়েটাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা আর চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়, তবে কি হবে উপায়?

তাহলে মেয়েটা এই বাড়িরই মেয়ের মত হয়ে উঠবে যে! তখন? তখন যে মেয়েটাই এই বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে মনে ক'রে বসবে।

কী জটিল সমস্যা। মেয়েটাকে তখন এই বাড়ি থেকে বিদায় দিলে

মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন ক'রে সেই বিদায়? এখনো কথা বলতে শেখে নি, বোঝেও না কিছু, মাত্র আয়ার কোলই চিনতে পেরেছে। কিন্তু আর একটু যখন বড় হবে, তখন উপেন আর চারুকেও যে আপন জন বলে মনে ক'রে ফেলবে! এইটুকু একটা শিশুর সেই মনের টানকে ছিঁড়ে দিতে পারা যাবে তো?

অনেক আলোচনা আর গবেষণা ক'রে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে আর একবার একটা প্রতিজ্ঞা করেন। না, আর বেশি দেরি করলে চলবে না। মধুপুরে গিয়েই, খোঁজ খবর ক'রে কোন সাধারণ ··এই ধর কোন চাপরাশি বা বেয়ারার ঘরে মেয়েটাকে যদি সঁপে দেওয়া যায়, তবে মন্দ হয় না। ছোট জাতের মেয়েদের তো এই বয়সেই বিয়ে হয়। কিছু টাকা দিলে পাত্র পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

নিশ্চয়, আর কোন সন্দেহ থাকে না উপেন আর চারুর মনে। কিন্তু— এইবার থেকে আর একটা বিষয়ে সাবধান হতে হবে। চারু বলে—মেয়েটা যেন কখনই ভাবতে না শেখে যে আমরা ওর আপন জন। আমাদের জন্য যেন কোন মায়া না জেগে বসে মেয়েটার মনে। তাহলেই কিন্তু সমস্যা জটিল হবে।

অর্থাৎ, এইবার থেকে একটু নির্মম হতে হবে, এই ধরনেরই একটা সিদ্ধান্ত করে উপেন আর চারু।

কাঁদছে অস্থি। অস্থির একটানা একঘেয়ে কান্নার স্বর শোনা যায়। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় চারু। বারান্দার আর এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে আয়াকে ধমক দেয় চারু—মেয়েটা এরকম বিশ্রীভাবে কাঁদছে কেন আয়া? দোলনা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আয়াও চেঁচিয়ে উত্তর দেয়।··দোলনা অনেক দুলিয়েছি।

চারু—তবে কাঁদছে কেন মেয়েটা?

আয়া আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে থাকে—তুমি তো এক মেয়ের মা হয়েছ, তুমি কি জানো না, বাচ্চা মেয়ে কিসকে লিয়ে এমন করে কাঁদে।

যেন এক ছলক করুণ রক্তের আভা হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে চারুর মুখের উপর। চুপ ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে চারু। মনে হয়, যেন অনেক কষ্টে আর ইচ্ছা ক'রে শরীরটাকে কাঠ ক'রে রাখতে চাইছে। উপেন গম্ভীরভাবে বলে—শক্ত হতে চেষ্টা করছো বুঝি?

চারু খেঁকিয়ে ওঠে—তুমি অসভ্যতা করো না।

হাসি লুকোতে গিয়ে অন্ত দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় উপেন।

মধুপুরের তিন বছরের জীবন দেখতে দেখতে কেটে গেল। আবার নতুন জায়গায় বদলি হবার সময় এগিয়ে এল: দুজনের মনে হঠাৎ সমস্যাটা আবার দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তোলে।

এতদিন যেন মনের ভুলে ভুলেই গিয়েছিল দুজনে; একটা পরের মেয়ে এই ঘরেরই বাতাসে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু এত দেরি করা উচিত ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। দুজনেই দুজনের উপর দোষারোপ করে। কথা কাটাকাটির পর আবার দুজনেই শান্তভাবে আলোচনা করে।—মেয়েটারই ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। আর দেরি করলে বাড়ির মেয়ের মত হয়ে উঠবে যে! তখন কি হবে উপায়? বিয়ের বয়স যখন হবে, তখন বিয়েই বা হবে কার সঙ্গে? মেয়েটার মন এই বাড়ির মেয়ের মত হয়ে উঠবে, অথচ বিয়ে দিতে হবে একটা ছোট ঘরে। কেমন ক'রে সেই ঘরকে সহ্য করবে মেয়েটা? তার চেয়ে, এখান থেকে যাবার আগে একটা পাত্র-টাত্র খুঁজে বের করে মেয়েটার গতি ক'রে দেওয়া যায় তো ভাল।

ঘরের জানালায় একটা ছোট্ট মেয়ের হাসি হাসি মুখ ভেসে ওঠে। রমার মুখ বাইরের ফুলের টবের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দেয় আর ডাক দেয় রমা—বাবা!

তার পরেই ডাক দেয়—মা।

চারু বলে—দুষ্টুমি করোনা রমা, যাও পুতুল নিয়ে খেলা কর।

ঘরের অন্য একটা জানালায় আর একটা ছোট মেয়ের হাসি হাসি মুখ হঠাৎ ভেসে ওঠে। বাইরের ফুলের টবের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েছে অম্বি। উঁকি দিয়েই উপেনের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আপ্পি!

তারপর চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আম্মি! দৌড়ে চলে গেল অম্বি।

উপেন আর চারু আলাপ করে—এই ডাকগুলি কি অম্বি আপনা আপনি শিখলো?

চারু—না, আয়া শিখিয়েছে।

উপেন—যাক্, তবু ভাল, রমার মত বাবা-মা আরম্ভ করলেই হয়েছিল আর কি?

কি আশ্চর্য, এই ধরনেরই এক একটা প্রাচীর তুলে নিজের মেয়ের কাছ থেকে পরের মেয়েকে দূরে সরিয়ে রেখেছে উপেন আর চারু। অম্বির কাছে তারা হলো আপ্পি আর আম্মি, বাবা আর মা নয়।

কিন্তু যখন রমা আর অম্বির ঝগড়ার ভাষা শুনতে পায়, তখন দুজনেই আবার আশ্চর্য হয়, আর, মনের এলোমেলো চিন্তার মধ্যে বুঝতে পারে, এই ব্যবধান যে ব্যবধানই নয়। পৃথিবীতে এক আপ্পি আর এক আম্মিকে পেয়েই ধন্য হয়ে গিয়েছে অম্বি।

রমা অম্বিকে তুচ্ছ করে মুখ বেঁকিয়ে বলে—তোর তো মা নেই।

অম্বি—তোর তো আম্মি নেই।

রমা—তোর তো বাবা নেই।

অম্বি—তোর তো আপ্পি নেই।

উপেন আর চারু দুজনেই একসঙ্গে ধমক দেয়—ওকি হচ্ছে!

ধমক দিয়েই যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে দুজনেই। এত সতর্কতা তবু কোথা থেকে যেন একটা কঠিন বিদ্রূপ চক্রান্ত ক'রে বার বার ভেঙে দিচ্ছে আর ভুয়ো করে দিচ্ছে তাঁদের এই সতর্কতার প্রাচীরকে। অম্বি নামে ঐ পাঁচ বছর বয়সের একটা ভিন্ন রক্তের মেয়ে যেন নিজ মনের অহংকারেই রমার সঙ্গে সমান তাল রেখে এই বাড়ির স্নেহের আঙিনায় ছুটোছুটি করার শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাধা দিতে হবে। বাধা দিচ্ছেও উপেন আর চারুবালা। বেশ ভেবে চিন্তে আর ইচ্ছে করে নির্মম হবার চেষ্টা করছে। রমা আর অম্বির মধ্যে আরও শক্ত পাথরের প্রাচীর তৈরী করতে হবে। যেন বুঝতে পারে অম্বি, আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁষে থাকবার অধিকার অম্বির নেই। রমা যা অম্বি তা নয়। এখন থেকেই ঐটুকু মেয়েকে ওর জীবনের এই কঠোর সত্য বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে সমস্যা বাড়বে।

এরই মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অপিসের দারোয়ানের সাহায্যে এক পাত্রের সন্ধান পেলে উপেন। রেলের কুলি সর্দারের এক ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারা যায় অম্বির। পাত্রের বাপের কিছু খেত-খামার আছে। ছোট জাত। পাত্রের খুড়ো সেই কুলি সর্দারই এসে একদিন উপেনের বাড়ির বারান্দায় উঠলো।

কিন্তু সেইরকম ঘটনা ঘটে গেল আবার। চারুবালা ব্যাপার দেখে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল চারু—দূর কর, যত সব আপদ!

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে উপেন। বেচারা কুলি সর্দারকেই ধমক দেয়—যাও যাও, যাও।

মুখ ভার ক'রে চুপ করে বসে রইল চারুবালা। যেন দুর্বোধ্য একটা বেদনা বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে, এবং নিজেরই অদৃষ্টের বিড়ম্বনার দিকে তাকিয়ে ছলছল ক'রে উঠছে তার চোখ। সান্ত্বনার ভঙ্গীতে চারুবালার হাত ধরে উপেন—অকারণে আমার ওপর রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

জানলার কাছে ভেসে ওঠে এক জোড়া কৌতূহলী হাসি-হাসি শিশু মুখ! রমা আর অম্বি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কি-যেন শোনে আর কি-যেন ভাবে। তার পরেই জানালা থেকে নেমে চলে যায়!

উপেন বলে—এখন বুঝতে পারছি, এভাবে কিছুই হবে না।

চারু—কি?

উপেন—বাজে লোকের হাতে মেয়েটাকে দিতে পারা যাবে না। আমিও পারবো না, তুমিও পারবে না।

চেঁচিয়ে ওঠে চারু—তাহলে মেয়েটা কি বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠবে না কি?

—না, তা বলছি না। বলছি, যদি, ভাল একটা অনাথ আশ্রমে ওকে দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে।

—তাহলে কি?

—তাহলে আমাদেরও মনে দুঃখ থাকবে না যে মেয়েটার ওপর অন্যায় করা হলো। কারণ, ভাল অনাথ আশ্রমে থাকলে মেয়েটা লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে একটা ভাল মানুষের সংসার পেয়েই যাবে।

—আছে এরকম আশ্রম?

—আছে নিশ্চয়, খোঁজ নিতে হবে।

—আশ্রম খুঁজতে আবার কতদিন লাগবে কে জানে?

—না আর দেরি করলে চলবে না। মেয়েটা এরই মধ্যে অনেক ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে।

—কি করেছে?

—মায়াই বলে, দিনরাত রমার সঙ্গে হিংসেহিংসি করছে, রমাকে মারধরও করে অম্বি।

—রমাও তো অম্বিকে মারে।

—কিন্তু রমা তো কোন সমস্যা নয়। রমার ওপর আমাদের যতই মায়া

বাড়ুক আর আমাদের ওপর রমার যতই মায়া বাড়ুক না কেন, তাতে তো কোন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু অম্বি যদি আমাদের দুজনকে আপনজন ভেবে বসে···।

—ভেবে বসেছে, তোমারই জন্য এসব কাণ্ড হচ্ছে।

রাগ করে উপেন—আমাকে দোষ দিও না, তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত মন আমার। আমি আজ পর্যন্ত একটা পুতুলও অম্বির জন্য কিনে আনি নি। তুমিই স্টাইল ক'রে ওর জামার ছাঁট ছেটেছ আর সেলাই করেছ।

হেসে ফেলে চারুবালা—তুমি যত পুতুল রমাকে এনে দিয়েছ, অম্বি সবই কেড়ে নিয়েছে।

—অ্যাঁ, কোন সাহসে কাড়ে?

—ভগবান জানেন।

দূরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় উপেন আর চারুবালা, আয়া একটা নতুন ডল রমার হাতে তুলে দিচ্ছে। অম্বি বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে আয়ার উপর উপদ্রব করছে।

উপেন রাগ ক'রে অম্বির হাত থেকে ডল কাড়বার জন্য যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়। চারুও সঙ্গে সঙ্গে উপেনের পিছনে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসতে থাকে। চারু বার বার বাধা দেয়—এটা আবার কিরকম পাগলামি করছো তুমি!

—না আমার কাছে ওসব আবদা নেই, আমি শক্ত মানুষ। তুমিই লাই দিয়ে দিয়ে সমস্যা বাড়িয়েছ।

চারুবালা মুখ টিপে হাসে—ইস।

থামতে হয় উপেনকে। চারুই উপেনের হাত ধরে উপেনকে থামতে বাধ্য করে। ছেলেমানুষে এরকম ঝগড়া ঝগড়া খেলা খেলেই থাকে, কিন্তু তুমি তার জন্য সত্যিই মাথা খারাপ করছো কেন?

উপেনের রাগটা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয় এবং চারুর দিকে ভ্রূকুটি ক'রে বলে—না, মোটেই খেলা নয়। অম্বির মনে মতলব আছে।

চারু হাসে—বেশ তো, ঐটুকু একটা মেয়ে না হয় একটু মতলবের খেলাই খেললো।

উপেন বলে—ঐ দেখ, আবার কেমন ঝগড়া শুরু করেছে অম্বি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে চারু আর উপেন, সত্যিই আবার চেঁচাতে শুরু করেছে অম্বি—আমার ডল কই আয়া? আমার ডল?

অম্বি বলে—আমার ডল কই ?

আয়া—তোমার ডল নেই।

অম্বি—ইস ? সঙ্গে সঙ্গে রমার হাত থেকে ডল কেড়ে নেয় অম্বি। রমা কাড়বার চেষ্টা করতেই রমাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। মুখ ভার করে বসে থাকে রমা। আড়ি করে—তোমার সঙ্গে খেলব না।

অম্বি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রমার একটা হাত ধরে অনুরোধ করে—আমার ওপর অকারণে রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

চারুবালার বিদ্রূপই সত্য হয়ে উঠলো। অম্বির মুখের মান-ভাঙানো কথাগুলি শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে উপেন. তারপর অপ্রস্তুতভাবে হাসতে হাসতে চলে যায়।

কিন্তু এই ধরনের ক্ষণিক মধুরতার দৃশ্য দেখে খুশি হয়েও পরমুহূর্তে উদ্বিগ্নভাবে ভাবতে থাকে উপেন আর চারুবালা। অম্বি যেন ধীরে ধীরে একটা ছলনা বিস্তার করছে। সাবধান হতে হবে। অম্বিরই কল্যাণের জন্য, আর নিজেদের জীবনকে একটা ভুল মায়ার জাল থেকে বাঁচাবার জন্যে।

রমার জন্য মাস্টার ঠিক করা হয়েছিল। পড়াতে এলো মাস্টার। রমার দেখাদেখি অম্বিও একটা বই নিয়ে মাস্টারের কাছে এসে বসে। আয়া এসে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বিদ্রোহ করে অম্বি, চেঁচিয়ে আয়াকে খিমচে একটা অস্বস্তিকর দৃশ্য সৃষ্টি করে। মাস্টার অবাক হয়। উপেন এসে বলে—থাকুক, থাকুক।

চারুবালা অনুযোগ করে—থাকুক তো বললে, কিন্তু আর কতদিন ?

—যতদিন অনাথ আশ্রমে না যায়, ততদিন এসব সহ্য করতেই হবে।

সহ্য করতে হলো আরও একটা দুঃসহ ঘটনা। প্রতিদিনের মত খাবার ঘরের টেবিলের কাছে বসে আদরের স্বরে ডাক দিলো উপেন—রমা ! রমা !

সেই মুহূর্তে ছুটে আসে রমা। একটা পুড়িং ভেঙে চামচে দিয়ে রমাকে খাইয়ে দেন উপেন। চারুবালা সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে সে দৃশ্য দেখে। রমার নানা রকমের দুষ্টুমির কথা আলোচনা করে স্বামী আর স্ত্রী। উপেন হাসতে হাসতে বলে—এরই মধ্যে এটার মুখটা একেবারে তোমার মুখের মত হয়ে উঠেছে। দেখা মাত্র যে কেউ বলে দেবে তোমার মেয়ে।

—কিন্তু মিসেস চক্রবর্তী যে বললেন, তোমার মুখের আদল পেয়েছে।

—আমি তো ও রকম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

চারু রাগ করে—এ আবার কেমন কথা !

—আরে, আমার নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছি না যে মিলিয়ে দেখবো।

অকস্মাৎ দু'জনেই চমকে ওঠে, নিকটেই যেন একটা শিশুকণ্ঠের কান্নাভরা চিৎকার ছটফট করছে। হ্যাঁ, অম্বিরই চিৎকার।

খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, অম্বিকে শক্ত করে ধরে রয়েছে আয়া; অম্বি দেখতে পেয়েছে, উপেন চামচ দিয়ে পুডিং খাইয়ে দিচ্ছে রমাকে। ছটফট করছে অম্বি, পাঁচ বৎসরের একটা পরের মেয়ে উপেনের হাত থেকে আদুরে পুডিং খাবার জন্য লুব্ধ হয়ে ছটফট করছে। আয়াকে চড় ঘুঁষি মেরে ব্যতিব্যস্ত করছে অম্বি। আয়া শেষে হার মেনে আর রাগ করে অম্বির হাত ছেড়েই দেয়—যাঃ! আর সহ্য করতে পারে না।

এক দৌড়ে ছুটে এসে অম্বি উপেনের খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। পুডিং-এর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি লুব্ধ মুখের ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

উপেনের হাত থরথর করে কাঁপতে থাকে। ছোট্ট একটা মেয়ের সামান্য একটা লুব্ধ দাবি, কিন্তু কী প্রচণ্ড এই দাবির শক্তি। চারুর মুখের দিকে বার বার ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় উপেন। চারু মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

অম্বি বলে—আমার পুডিং আপ্পি ?

বিষণ্ণ ও করুণ হয়ে ওঠে উপেনের মুখ। ধীরে ধীরে চামচ তোলে, পুডিং ভাঙে উপেন, দ্বিধাগ্রস্ত হাতটা কাঁপতে থাকে। একবার চামচ নামিয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মোছে উপেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অম্বি ডাকে—আমার পুডিং আপ্পি।

চামচ তুলে অম্বির মুখে পুডিং তুলে দেয় উপেন।

চমকে ওঠে চারুবালা।

চলে যায় অম্বি, চলে যায় রমা। সেই চামচ দিয়েই নিজের খাবার খেতে যাচ্ছিল উপেন, চারু উত্তপ্তস্বরে বাধা দেয়—ও চামচ রেখে দাও।

উপেন শক্ত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করে—কেন ?

জবাব দেয় না চারু। উপেন চেঁচিয়ে ওঠে—বল, তুমি আপত্তি করছো কেন ?

চারু নিরুত্তর।

উপেন—ছোট জাতের মেয়ে চামচে মুখ দিয়েছে বলে চামচ অশুদ্ধ হয়েছে,

এই তো। খানিকটা গোবর খেয়ে ফেললেই শুদ্ধ হতে পারা যাবে তো, তবে এত ভয় কিসের?

উত্তর দেয় না চারু।

উপেন—বল, কিসের ভয়? জাতের ভয় না মায়ার ভয়?

চারু ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে—মায়ার ভয়।

—কেন?

—ভুল করছো তুমি। দুদিনের জন্য একটা পরের মেয়ে ঘরে রয়েছে, এই মাত্র তাকে নিয়ে এত আদরের বাড়াবাড়ি কেন?

—তুমি করছো না?

—না, আমি তোমার চেয়ে ঢের শক্ত, ঢের সাবধান।

—ও।

চামচটাকে সশব্দে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অন্য একটা চামচ হাতে তুলে নেয় উপেন। তাড়াতাড়ি খেতে থাকে। কিন্তু খাওয়া সমাপ্ত করে না। হঠাৎ খাবার ছেড়ে হাত ধুয়ে উঠে যায়।

সেদিন ছিল রমার জন্মদিন।

অমি বায়না ধরলো, আমিও ঠিক রমার মত ফুলের মালা গলায় দিয়ে, চন্দনের টিপ পরে, আম্মির কোলে বসে পায়েস খাব।

চারুবালা বলে—না।

চারুবালার আচল ধরে ঘুরঘুর করতে থাকে অমি। নাকি কান্নার সুরে সেই একই আবদার—আমার জন্মদিন চাই।

চারুবালা চেঁচিয়ে আয়াকে ডাক দিয়ে বলে—ওকে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।

অমিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা ঘরে বন্ধ করে রাখে আয়া। চিৎকার শোনা যায়, ঘরের দরজায় লাথি মেরে সেই প্রচণ্ড আবদার একটানা এক সুরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে—আমার জন্মদিন, আমার জন্মদিন। আম্মি, আমার জন্মদিন।

ঘরের ভিতর ছটফট ক'রে আর রাগ ক'রে ঘুরতে থাকে উপেন। যেন একটা ধিক্কার দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—হুঁঃ, জন্মদিন, সেদিন কোন্ সর্বনেশে তারা ছিল আকাশে।

অন্য ঘরে চুপ করে বসে শুনতে থাকে চারুবালা, অমির চিৎকার। তারপর

চোখ মোছে, তারপরেই ক্ষুব্ধভাবে উপেনের কাছে এসে বলে—আমি অন্ধ হলে খুশি হবে তো? এসো, দেখে খুশি হয়ে যাও।

এগিয়ে গিয়ে ঘরের বন্ধ কপাট খুলে অম্বিকে হিড়হিড় করে টেনে আনে চারুবালা। মালা পরিয়ে দেয়, চন্দনও পরিয়ে দেয়। গম্ভীর মুখে যেন বিনা আগ্রহের একটা কলের মত কাজ করে যায়। কোলের উপর অম্বিকে বসিয়ে পায়েস খাইয়ে দেয়। হেসে ওঠে অম্বির জল-ভেজা চোখ।

শেষ হয় অম্বির জন্মদিনের অনুষ্ঠান। অম্বিকে কোল থেকে নামিয়ে, সেই রকমই গম্ভীর মুখে কলের মত ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে চারুবালা।

শ্যামবাজারের পিসিমার চিঠি মাঝে মাঝে আসে।

পিসিমার চিঠিতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। একটি হলো বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে, কি রকম জমালে উপেন, আর কবে বাড়ি করছে উপেন? আর একটি হলো, রমার বিয়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যতের একটা আগ্রহের কথা। আর, একটা বিক্ষোভের কথা—সেই অজ্ঞাত মেয়েটা বাড়িতে আছে কেন?

সমাজের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন পিসিমা। ভুল করলে, রমার বিয়ে নিয়েই ভবিষ্যতে মুশকিলে পড়তে হবে।—বুঝিলাম, তোমরা সেই অন্ত্যজা মেয়েটাকে ঘরে পুষিয়া রাখিয়াছ। এখন না হয় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু একদিন দেশের দিকে ফিরিয়া আসিয়া সমাজের মধ্যে থাকিতে হইবে। বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ না যে, অজ্ঞাত-কুজাতের ঐ মেয়ে ঘরে থাকিলে সমাজে তোমাদের যে নিন্দা রটিবে, তাহার ফলে রমার জন্য সদ্বংশীয় পাত্র সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে।

পিসিমার উপদেশগুলি যেন নিষ্ঠুর সত্যের মত চিন্তিত ক'রে তোলে চারুবালাকে। চারুবালার কাছে এসে দাঁড়ায় উপেন। সান্ত্বনার সুরে আর শান্তভাবে বলতে থাকে।—ভুল যদি বলো, তবে আমার ভুল, তোমার ভুল, আর অম্বি নামে ঐ অতটুকু একটা মেয়েরও ভুল। আমরা সবাই না জেনে ভুল করছি। পিসিমা ঠিকই বলেছেন।

চারু—কিন্তু কিসের ভুল?

উপেন—আমার তো মনে হয়, আমরা কেউ ভুল করছি না। আমি ভুল করি নি, তুমিও ভুল করছো না, অম্বিও ভুল করছে না। শত হোক, একটা মানুষের মেয়ে তো! কাছে থাকলেই এরকম ভুল সবারই হবে।

—কাছে রাখাই যে ভুল হচ্ছে।

—হ্যাঁ, এটাই হলো কথা। কিন্তু এবার বোধ হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কি ?

—দার্জিলিং-এ একটা অরফ্যানেজ আছে। বেশ ভাল ব্যবস্থা। অতি সুন্দর ব্যবস্থা। হাজার পাঁচেক টাকা থোক দিতে হবে। ব্যস্, আর কোন দায় নেই।

—তবে, ওখানেই একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল।

—ক'রে ফেলতেই হবে, এখান থেকে চলে যাবার দিনও তো আর বেশি বাকি নেই। এবার অনেক দূরে, একেবারে, সেই দেরাদুনের কাছে।

—চিরকালটা কি ঘুরে ঘুরেই কাটবে ?

—অন্তত আর পনরটা বছর তো বটেই।

—তারপর ?

—তারপর কলকাতা।

পনর বছর পরের কথা ছেড়ে দাও, এখনকার কথাই ভাব। আয়াটাও জেদ ধরেছে, এইবার দেশে চলে যাবে। বুড়ো বয়সে আর বিদেশে থাকতে চায় না। চাকরিও করতে চায় না।

—কেন ?

—রমা আর অম্বি ওকে বড় মারধোর করে।

দরজার কাছেই আয়ার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়।—হামি আর থাকতে পারবে না সাব।

উপেন—কেন ?

আয়া—এ নোকরি আচ্ছা নেহি সাব, মায়াভি হোবে, আর মারভি খাইবে।

উপেন বলে—না, আর বেশি দিন নয়। শিগগিরই তোমাকে ছেড়ে দেব।

আয়া চলে গেলে যেন একটু আতঙ্কিতের মতোই বিষণ্ণ স্বরে উপেন বলে —দেখলে তো, আয়া কেমন সাবধান হয়ে গিয়েছে। মায়াভি হোবে, মারভি খাইবে, আমাদেরও এই দশা হবে, যদি সাবধান না হই।

শেষ কথায় চারুবালাকে একটু উৎসাহিত করে চলে যায় উপেন— দার্জিলিং-এর অরফ্যানেজে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, মনে হচ্ছে দু'এক দিনের মধ্যেই উত্তর এসে পড়বে।

ভুল হয় নি উপেনের অনুমানে। উত্তর এল দুদিন পরেই।

ব্যস্, এখন শুধু পাঁচ হাজার টাকার চেক, আর সেই সঙ্গে অম্বিকে

নিয়ে একদিন মাস্টারকে দার্জিলিং রওনা করিয়ে দিতে হবে, আর কোন সমস্যা নেই।

এক গাদা রঙীন খেলনা জামা-কাপড়, ছবি, টফি, চকোলেট আর লজেন্স কিনে এনে টেবিলের উপর ঢেলে দিলো উপেন। অম্বিকে ডাক দিয়ে বলে—অম্বি, এই সব তোমার।

—আমার?

—হ্যাঁ, কিন্তু মাস্টার মশাই-এর কথা শুনতে হবে, তবে এসব পাবে।

মাস্টারের কানের কাছে ফিস ফিস ক'রে বলে যায় উপেন—বাস্, আমাকে নিয়ে আর কোন কাজ করবার চেষ্টা করবেন না। এইবার সব দায় আপনার। ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হয়ে যান, আমাকে কিন্তু আর কোন পরামর্শ করতে ডাকবেন না। চললাম।

মুখ কালো ক'রে, দুপ-দাপ ক'রে হাঁটতে-হাঁটতে, যেন নিজেরই মনের ভিতরের একটা আহ্লাদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করতে করতে চলে যায় উপেন। চারুবালার কাছে গিয়ে বলে, আমি আজ টুরে চললাম, কাল ফিরবো।

চারুবালার কোন আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে বের হয়ে গেল উপেন।

মাস্টার মশাই চারুবালাকে আশ্বস্ত করেন—কোন চিন্তা করবেন না, এ আর কি এমন কঠিন কাজ?

অম্বির শিশু-মনকে প্রলুব্ধ করার জন্য গল্পের ফাঁদ পাতেন মাষ্টার।—নতুন দেশের কথা। বরফের দেশ, চাঁদের দেশ, সোনার সূর্য ভাসে সেই দেশের আকাশে।—যাবে অম্বি? প্রশ্ন করেন মাষ্টার। মুগ্ধ শিশুচক্ষের বিস্ময় নিয়ে উত্তর দেয় অম্বি—যাব।

সমস্ত বাড়িটাই যেন ভয়ে অভিভূত হয়ে রইল। রওনা হবার জন্য তোড়জোড় করছেন মাষ্টার মশাই। রমাকে নিয়ে আয়া চলে গেল। অম্বির পাঁচ বছর বয়সের একটা মেয়ের চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভাষার শব্দকে ভয় পেয়ে এই বাড়ির আত্মা যেন মুখ লুকিয়ে ফেলছে। চারুবালাও একটা ঘরের ভিতর নিজেকে বন্ধ ক'রে রাখলো, যেন এই দৃশ্য দেখতে না হয়।

মাষ্টারের কাছে কতবার জিজ্ঞাসা করেছে চারু।—আশ্রমে কোন কষ্ট দেয় না তো। মাষ্টার বলেছেন—আপনি বিশ্বাস করুন যে অরফ্যানেজে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানকার খাওয়া-পরা-থাকা সাজপোশাক আপনার এই এখানকার তুলনায় অনেক ভাল। খুব সুখে থাকবে মেয়েটা। লেখাপড়া, গান সব শিখবে। বড় হয়ে ডাক্তারী পড়তে পারবে। আপনি বৃথা ভাবছেন।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছে চারুবালা। সুখেই থাকবে মেয়েটা, এই বাড়ির সুখের চেয়ে সেখানে অনেক বেশি সুখ। কিন্তু তবু কেন স্বস্তি পায় না মন? মনে হয় ছোট একটা অবুঝ মেয়েকে লোভ দেখিয়ে বনবাসে পাঠানো হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি রাগ হয় নিজেরই উপর। এতদিন ধরে যাকে ছেড়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিল মন, আজ ছেড়ে দেবার এত ভাল সুযোগ পেয়েও এরকম দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হয় কেন?

বন্ধ ঘরের নিভৃতে বসে শুনতে পায় চারুবালা, মাস্টারের পায়ের শব্দের পিছু পিছু দুটি ছোট ছোট জুতোর শব্দ নিকটে এগিয়ে আসছে। রওনা হয়েছেন মাস্টার। চলে যাচ্ছে অম্বি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অম্বি। প্রশ্ন করে মাস্টারকে—রমা যাবে না?

—না।

—আপ্পি?

—না।

—আম্মি?

—না।

—তবে আমিও যাব না।

এইবার মাস্টার বাধ্য হয়েই কৌশলের সাহায্য নেন। হেসে হেসে প্রচণ্ড একটা মিথ্যা কথা বলেন—আপ্পি, আম্মি, রমা সবাই সেখানে আগেই চলে গেয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে অম্বি—অ্যাঁ, আমিও যাব!

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র চাপানো আছে। মাস্টার আগে আগে চলে যাচ্ছেন। পিছনে অম্বি। ট্যাক্সির কাছে পৌঁছতেই মাস্টার হঠাৎ একটা আর্তনাদের প্রতিধ্বনি শুনে পিছন ফিরে তাকান। দেখতে পান, বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে চারুবালা।

সেই মুহূর্তে, চারুবালাকে লক্ষ্য ক'রে পিছনে ছুটতে থাকে অম্বি—ঐ যে আম্মি, আম্মি, আম্মি।

মাস্টার তারস্বরে চেঁচিয়ে নানা প্রলোভনের কথা ঘোষণা করতে থাকেন—এই যে, এখানে কত লজেন্স, পুতুল, আর ছবি আছে অম্বি, কত গনেশ আর সিংহ। চল যাই সেখানে, যেখানে চাঁদের দেশ, বরফের পাহাড়, ঝর্ণার গান, বনের পরী।

কিন্তু বৃথা, আম্মি নামে একটি মায়াভরা মূর্তির কাছে চাঁদের দেশের

আহ্বানও মিথ্যে হয়ে যায়।—না, আমি যাব না। কখ্খনো যাব না। বলতে বলতে চারুবালার দিকে ছুটে চলেছে অম্বি।

অম্বি এসে চারুবালার স্তব্ধ মূর্তিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু চারুবালার হাত দু'টো, আর সেই সঙ্গে বুকের ভিতরটাও যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অম্বিকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত দুটো একবার ছট্‌ফট করে ওঠে। তবু যেন অনেক কষ্টে হাত দুটোকে শক্ত ক'রে রাখে চারুবালা। অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হাসতে থাকে। অম্বি বলে—মাস্টার বড় দুষ্টু, মিথ্যুক।

চারু প্রশ্ন করে—কেন? কি করেছেন মাস্টার মশাই?

অম্বি বলে—তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিল।

চোখ ছলছল করে, গম্ভীর হয় চারুবালা। অম্বিই সান্ত্বনা দেয়—আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না আম্মি, তুমি কেঁদো না।

দু'দিন পরে বিষণ্ণ পরিশ্রান্ত বেদনাহত মূর্তি নিয়ে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে উঁকি দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো উপেন। টুর থেকে ফিরে এসেছে উপেন। জানে উপেন, অম্বি চলে গিয়েছে। এক একটা শূন্য ঘর আর বারান্দার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে রুমাল বের করে মুখ মোছে উপেন। হঠাৎ চমকে ওঠে, কি যেন দেখতে পায় উপেন। এক জায়গায়, মেঝের উপর অম্বিরই একটা ডল পড়ে আছে। ফোলা ফোলা গাল, হাসি হাসি মুখ একটা ডল। ডলটা তুলে নিয়ে, ডলের মুখে হাত বুলিয়ে, আর জলভরা চোখ নিয়ে আর দাঁত চিবিয়ে, কে জানে কার উপর রাগ ক'রে বলতে থাকে উপেন—ডল, পুতুল মাত্র, কাঠখড়ের পুতুলও ঘরের ভালবাসা পায় কিন্তু মানুষের মেয়ে আবর্জনা ...ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

অকস্মাৎ আড়াল থেকে হাসিতে আর আহ্লাদে উপচে পড়া মিষ্টি একটা ডাক যেন বাঁশির সুরের মত বেজে ওঠে--আপ্পি।

বিস্ময়ে চমকে ওঠে আর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে উপেনের।—সে কিরে অম্বি, তুই?

অম্বি ছুটে এসে উপেনের হাত ধরতে যায়। আলগোছে হাত সরিয়ে নেয় উপেন। অম্বি বলে—মাস্টার বড় দুষ্টু।

—বুঝেছি। আর দুষ্টুমি করবে না মাস্টার।

অম্বির অভিযোগের মর্ম বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। বুঝেছে উপেন,

বুঝেছে চারুবালা। অম্বি যেন বলতে চায় আমি যাব না। দুনিয়ায় যে সব মাস্টারীর শাসন আমাকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায়, সেই সব মাস্টারী বড় দুষ্টু, বড় নিষ্ঠুর।

না, এ রকম নিষ্ঠুরতা করা উচিত হবে না। মেয়েটার মনটা এই বাড়িকেই আপন ক'রে নিয়েছে। সুতরাং থাকুক না, বাড়ির মেয়ের মত হয়েই। বড় হোক, বেঁচে থাকুক তারপর ভগবান একটা উপায় করে দেবেনই। সাধারণ গেরস্থ ঘরের যে কোন জাতেরই হোক না কেন, খেয়ে পরে একরকম সুখে আছে, এরকম একটা পাত্র কি পাওয়া যাবে না? ভাল বরপণ দিলে পাওয়া যাবেই।

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনায় এই নতুন সিদ্ধান্ত জন্মগ্রহণ করে। বাড়ির মেয়ের মতই থাকুক অম্বি। কিন্তু,...কিন্তু ও যেন বুঝতে পারে যে, ও হলো এই বাড়ির মেয়ের মত। আর বেশি কিছু নয়। নইলে নইলে আবার সমস্যা দেখা দেবে।

ক'দিন পরেই সমস্যাটা আবার দেখা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হয়ে আর অতি সাবধানতায় অবিচল থেকে, সেই সমস্যাকে অঙ্কুরেই ছিন্ন করে দিল চারুবালা আর উপেন।

রমার সঙ্গে হিংসুটেপনায় আর একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল অম্বি। কিন্তু অম্বিকে বুঝিয়ে দিলো চারুবালা ও উপেন, রমার অধিকারে আর অম্বির অধিকারে অনেক পার্থক্য আছে।

ঘটনাটা এক। এই সন্ধ্যায় চারুবালার শোবার ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় অম্বি, খাটের উপর চারুবালার বিছানার পাশেই, যেন চারুবালার বুক ঘেঁষে আর একটি ছোট বিছানা রয়েছে, ছোট একটি বালিশও। অ্যাঁ, এখানে রমা শোয়, বুঝেছি। চেঁচিয়ে ওঠে অম্বি!

বায়না ধরে অম্বি—আমিও আম্মির কাছে শোব!

আয়া বলে, কভি নেহি। আয়াকে খিমচে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের ছোট বালিশটা আয়ার ঘর থেকে নিয়ে ছুটে আসে অম্বি। চারুবালার বিছানার এক পাশে রাখে, গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে।

প্রমাদ গনে চারুবালা। ঘর থেকে সরে গেল চারুবালা। আয়া এসে অম্বিকে বোঝায়—এখানে তোমায় শুতে নেই।

—কেন? রমা শোয় কেন?

আয়া বলে—রমা হলো আম্মির মেয়ে।

—আমি তাহলে কি?

—তুমি আম্মির মেয়ে নও।

অন্য ঘরে গম্ভীর হয়ে বসেছিল উপেন আর চারুবালা।—আম্মি, আম্মি? চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসে অম্বি।

চারুবালা—কি?

অম্বি—আম্মি, রমা বুঝি একলা তোমার মেয়ে?

চারু—হ্যাঁ।

অম্বি—আমি আম্মি?

চারুবালা করুণভাবে হাসে—তুমি আমাদের মেয়ের মত।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচ বছর বয়সের একটা মূর্তি। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় মায়াময় কৌতূহল যেন আজ সবচেয়ে কঠিন একটা উত্তরের আঘাত পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু অম্বিকে মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে ধীর স্থির ও শান্ত করে দিয়েছে, ঐ একটি উত্তর।

উপেন বলে—খেয়েছ অম্বি?

অম্বি না।

উপেন—খেতে যাও, আয়া খাইয়ে দেবে।

শান্তভাবেই বাধ্যভাবে, ধীরে ধীরে চলে যায় অম্বি।

ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ঢোকে। চারুবালার বিছানার এক পাশে ছোট বালিশে ঘুমিয়ে আছে রমা। রমার মুখের দিকে একবার তাকায়। তারপর নিজের ছোট বালিশটাকে হাতে তুলে নিয়ে যায় অম্বি।

জাতের ভয়ে নয়, মায়ার ভয়ে যে সাবধানতার প্রাচীর তুলে দিল উপেন আর চারুবালা, সেই প্রাচীর অটুট হয়েই রইল এই পরিবারের আরও পনরটি বছরের জীবনে। বেরিলি গোরখপুর আর শিলিগুড়ি, একে একে সার্ভিসের এক একটা অধ্যায় শেষ করে অবসর জীবনের আশ্রয় কলকাতার বাড়িতে এসে যখন ঠাঁই নিলেন উপেন, তখনও দেখতে পাওয়া গেল যে, এই পরিবারের বাপমায়ের স্নেহের কক্ষটি সেইরকমই দুভাগে ভাগ করা আছে। সেই প্রাচীর আজও আছে।

একটি ঘরে চারুবালার খাটের পাশেই আর এক খাটে শোয় আপন মেয়ে রমা, আর পাশের ঘরে একটি খাটে শোয় অম্বি। দুই ঘরের মাঝখানে একটি

দরজা, এবং এই দরজা যদিও বন্ধ থাকে না, তবু একটি পরদা ঝুলতে থাকে। আপন মেয়ে আর পরের মেয়েকে এইভাবেই পৃথক ক'রে রেখেছেন চারুবালা। আপন মেয়ে রমা হলো নিকটে, আর পরের মেয়ে অম্বি একটু দূরে।

বিগত পনর বছর ধরে এই সাবধানতার প্রাচীরকে একটু একটু করে আরও কঠিন করে তুলতে ভুলে যান নি উপেন আর চারুবালা। রমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্ম মাস্টার এসেছে। এসেছে ইংরেজীর মাস্টার আর গানের ও শেলাই-এর মাস্টারনী। অম্বি শুধু একটু দূর থেকে আর আড়াল থেকে দেখেছে। কাছে যায় নি। নিষেধ করে দিয়েছেন আপ্পি আর আম্মি।

এই ব্যবধান স্বীকার করে নিয়েছিল অম্বি। মেয়ে নয়, মেয়ের মত হয়ে থাকবার যে অধিকার পেয়েছে অম্বি সেই অধিকারের চেয়ে বেশি কোন অধিকার তার নেই।

অম্বি হয়তো বুঝতে না পেরে প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিল, কি ক্ষতি হবে লেখাপড়া শিখলে? কেন তাকে গান শিখতে দিতেও এত আপত্তি করেন আপ্পি আর আম্মি?

উপেন আর চারুবালার চিন্তার যুক্তিগুলি কোনদিন দেখতে পায় নি, তাই বুঝতেও পারে নি অম্বি।

সাবধান হয়ে ছিল উপেন, সমাজের দিকে তাকিয়ে। আর অম্বির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। লেখাপড়া শিখে অম্বি যদি একটা ভদ্রলোকের মেয়ের মনের মত মন পেয়ে বসে, তবে সমস্যা যে আরও জটিল হয়ে উঠবে।

বহু দূর অতীতে সে-সব চেষ্টার কাহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র আজ দেখা যাচ্ছে, উপেন আর চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে অম্বি। যে মেয়েকে ভদ্রলোকের মেয়ের মত হতে দিতেও চায় নি, বাড়ির মেয়ের মতও মনে করতে চায় নি, সেই মেয়ে আজ তাঁদের নিজের মেয়ের মত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ঐ মেয়ের মত পর্যন্ত, বাস্, আর নয়, আর বেশী নয়। অম্বিকে মানুষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গিয়েছে উপেন আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই পড়েছে। রমার বিয়ে দিতে হবে, অম্বির বিয়ে দিতে হবে। ভয় হয়, অম্বি যদি রমার মতই শখ আর মন পেয়ে বসে? রমার জন্ম যে রকম পাত্র পাওয়া যাবে, অম্বির জন্ম সে-রকম পাত্র তো আর পাওয়া যাবে না। জাত-পাত-জন্মের ইতিহাস নিয়ে অম্বির একটা পরিচয় আছে, আর সেই পরিচয়টা তো সুবিধের নয়। সুতরাং, কে বিয়ে করবে

অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা ও অবস্থার দিক দিয়ে একটু নীচু গোছের মানুষ ছাড়া? তাই একটু কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেন ও চারুবালা।

একজন মেয়ে, আর একজন মেয়ের মত। এই নিয়মে নিজেদের মনকে বেঁধে রেখেছেন উপেন ও চারুবালা। কিন্তু বাইরের আগন্তুকের চোখে ঠিক উল্টোটাই বোধ হয়। মনে হয়, রমাই যেন একটু দূরের একটা প্রাণ, আর অম্বি একেবারে নিকটের। রমা যেন এবাড়ির স্নেহ আর আদরের মাথায় চড়ে বসে আছে, আর অম্বি রয়েছে কোল ঘেঁষে বুক ঘেঁষে।

ভোরে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে অম্বি। মনে পড়ে যায়, ঘরের নানান কাজের কথা। মনে পড়ে আপ্পি এতক্ষণে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে। কিন্তু ঠাকুরটা কি চা এনে দিয়েছে এতক্ষণে? নিশ্চয়ই দেরী করেছে ঠাকুর। প্রথমেই ঠাকুরকে চায়ের তাগিদ দেয় অম্বি। পরে নিজেই ব্যস্তভাবে চা তৈরী ক'রে নিয়ে এসে উপেনের হাতের কাছে এনে দেয়। সস্নেহ স্বরে কথা বলেন উপেন, তুই এত ব্যস্ত হয়ে উঠিস কেন অম্বি? ছ'মিনিট দেরী হলোই বা!

উপেন বেড়াতে যাবেন, কিন্তু অম্বি একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উপেনকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয় না।—এ আলোয়ানটা ছেঁড়া, এটা কেন গায়ে দিয়েছে? ঘরের ভিতর থেকে অন্য একটা আলোয়ান নিয়ে এসে উপেনের গায়ে জড়িয়ে দেয় অম্বি।

রাঁধুনী-দিদির সঙ্গে আলাপ করে অম্বি, ঘরে কি আছে আর কি নেই, এবং কি আনতে হবে। নিজের ঘরে ঢুকে মশলার শিশি থেকে তরকারির ডালা পর্যন্ত অন্বেষণ করে। তারপর লিখতে বসে বাজারের ফর্দ। উপেন ভোরের হাওয়া খেয়ে ফিরে এসেই আবার বাজারে যান একবার। অম্বি তাঁর আগেই বাজারের ফর্দ আর হিসাব তৈরী ক'রে রাখে।

এঘর আর ওঘর ঘুরে কাজ করে অম্বি। ঠাকুর চাকর ও মালীকে নির্দেশ দেয়। বাগানের গাছে জল দেওয়া থেকে শুরু ক'রে বারান্দার ফুলের টবের সেবার কাজ পর্যন্ত, সবই একবার নিজের চোখে না দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না অম্বি। এই বাড়ীর প্রাণটাকেই যেন দুহাতে আগলে রাখতে চায় অম্বি, তারই জন্য ক্লান্তিহীন কাজের দায় গ্রহণ করেছে। কোন্ কাপড় ধোপাকে দিতে হবে, আর কোন্ কাপড় বাড়ীতেই কাচতে হবে, তারও লিস্ট ক'রে ফেলে অম্বি। তাগিদ দেয় ঠাকুরকে, আপ্পির স্নানের জন্য গরম জল হলো কি না?

এই ভাবেই চলে অশ্বির কাজের জীবনের পালা। রমার জীবনের পালা অন্য রকমের। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ত হয়ে ওঠে রমাও! সে ব্যস্ততার রূপ ভিন্ন। পড়ার তাগিদ, লেখার তাড়া। কলেজের উৎসবে আবৃত্তি করতে হবে, তার জন্য শেক্‌সপীয়র আর মাইকেল থেকে কবিতা মুখস্থ করার সাধনা। স্পোর্টসও আসছে, স্কিপিং-এর দড়ি নিয়ে ছাদে চলে যায় রমা। টিউটর আসেন। রমার পড়ার ঘরে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাঠ মুখর হয়ে ওঠে, তখন অন্য ঘরে আলনার উপর আপ্পির ধুতি আর চাদর গুছিয়ে রাখতে থাকে অশ্বি। তারপর কলেজের বাস আসে। ব্যস্তভাবে হেঁটে বাসের ভিতরে গিয়ে বসে রমা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অশ্বি। মুখের হাসি লেগে থাকে অশ্বির কিন্তু সে হাসি যেন একটু ক্লান্ত। শরীরটাকেও এতক্ষণে যেন একটু ক্লান্ত বলে মনে হয় অশ্বির। আস্তে আস্তে বাগানে নেমে এক গাছের ছায়ায় বসে লেস বুনতে থাকে অশ্বি।

এই লেস বোনাও যেন অশ্বির জীবনের এক বে-আইনী সাধনা, তাই সন্তর্পণে আর চারদিকে চোখ রেখে লেস বোনে অশ্বি। আপ্পি যেন না দেখতে পান। গানও শুধু গুনগুন করে অশ্বির মুখে, একটা তৃষ্ণাকে যেন বুকের ভিতর গোপন করে রাখছে অশ্বি। যেন শুনতে না পান আপ্পি। কারণ, এই সবই তার জীবনের নিষেধ।

ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়ির আর এক নিভৃতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চিন্তাকুল আলোচনা চলতে থাকে।

চারুবালা বলে—সেই তো, সেই সমস্যাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো। পরের মেয়ে নিজের মেয়ের মত হয়ে উঠলো, অথচ⋯!

উপেন—কি হলো?

চারু—কে এখন বিয়ে করবে এই নিরেট মূর্খ মেয়েকে?

উপেন—সমস্যাই বটে। তবে, ধর, বাঙালী সমাজেরই মধ্যে যদি এমন কোন ছেলে পাওয়া যায়, জাতে যাই হোক, লেখাপড়া সামান্য কিছু শিখেছে, আর ছোটখাট চাকরি বা দোকানদারি-টারি করছে, খেয়ে পরে বাঁচবার মত রোজগার করছে⋯।

চারু—পাওয়া আর যাবে না কেন। খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

উপেন—তা ছাড়া, যদি ভাল বরপণ দিই তবে⋯।

চারু—তাহলে তো হয়েই গেল। অম্বির মত মেয়েকে খুশি হয়ে বিয়ে করতে রাজী হবে।

হঠাৎ রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—কিন্তু অম্বি রাজী হবে কি?

স্বামী-স্ত্রীতে আবার বচসা বাধে। সেই পুরনো আক্ষেপ আর অভিযোগ। অম্বি যদি রাজী না হয় তবে তার জন্য দায়ী কে? কে ভুল করেছে? অম্বিকে লেখাপড়া না শেখাতে বলেছিল কে?

স্বামী-স্ত্রীতে আর একটা প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগের হানাহানি চলতে থাকে। কে আদর দিয়ে দিয়ে অম্বির মনটাকে শৌখিন ক'রে তুলেছে? উপেনের মতে আদর দিয়েছেন চারুবালা। চারুবালার মতে, আদর দিয়েছেন উপেন।

স্বামী-স্ত্রীর, এই বাড়ির বাপ ও মার এই রুক্ষ রুষ্ট কথার হানাহানির মধ্যে যেন একটা করুণতা আছে। বুঝতে পেরেছে দুজনেই, অম্বির মন তাঁদেরই মেয়ের মত একটা মন হয়ে উঠেছে। যার তার হাতে অম্বিকে গছিয়ে দিলেই কি সুখী হতে পারবে অম্বি?

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনার স্বর আবার শান্ত হয়ে আসে। সমস্যার সমাধানের জন্য এইবার একটু শক্ত মন নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। সিদ্ধান্ত করেন দু'জনেই প্রথম, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক।

সুশ্রী সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী, সাধারণ লেখাপড়া জানা সাধারণ উপার্জনক্ষম পাত্র হলেই চলবে। ভাল যৌতুক দেওয়া হবে।

আর, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো, অম্বি যেন বুঝতে না পারে যে, আপত্তি করা বা রাজী না হওয়া ওর পক্ষে সাজে না। রমার পক্ষে যা সাজে, ওর পক্ষে তা সাজে না। রমা এ-বাড়ির মেয়ে এবং অম্বি এ-বাড়ির মেয়ে নয়। সুতরাং নিজে ভাগ্যকে চিনতে শিখে আর মেনে নিয়ে অম্বিও যেন বিদায় নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখে।

চারুবালা বলে—যাতে রাজী হয়, তাই করতে হবে।

রমাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। রমার জন্য উপযুক্ত পাত্র খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। সমস্যা হলো অম্বিকে নিয়ে। তাই অম্বির একটা গতি করে ফেলতেই হয়। আগে অম্বির বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর রমার।

মাত্র দু'টি মাস হলো ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে উপেন পরিবার। এই বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার জলে সূর্যাস্তের রক্তিম ছবি আর গান্ধী-মঠের সাদা চূড়া দেখা যায়। বাড়ির নির্মাণ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। পশ্চিমের বারান্দার সিঁড়িটা, দোতলার দক্ষিণের ব্যালকনি

এখনো অসম্পূর্ণ। প্রতিবেশীদের সকলের সঙ্গে এখনো ভালো করে পরিচিতও হয়নি উপেন।

পাশের বাড়ির জানালায় মহিলাদের কৌতূহলী চক্ষু মাঝে মাঝে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিকটের বাড়ির দুই ফ্ল্যাটের দুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনী দুই মহিলার মধ্যে আলোচনা এবং গবেষণাও মাঝে মাঝে ধ্বনিত হতে শোনা যায়। বিশেষ করে রমা আর অম্বির সম্পর্কেই আলোচনা হয় বেশি।

একজন বলেন—পিঠাপিঠি আপন বোন বলেই তো মনে হয়। কিন্তু বয়স যেন সমান সমান।

আর একজন বলেন—নিশ্চয় যমজ বোন!

—মেয়ে দুটো ভালই।

—একটি একটু বেশি শান্ত।

—একটি একটু বেশি চঞ্চল।

—একজন বাপের মুখের আদল পেয়েছে, আর একজন মায়ের মুখের আদল পেয়েছে।

তৃতীয় আর এক মহিলা আর এক ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আলোচনায় যোগ দেন এবং সকলকে চমকে দিয়ে বলেন—দু বোন নয়।

—তবে!

—একজন হলো উপেনবাবুর মেয়ে।

—কোন্‌টি?

—ঐ, যেটি কলেজে পড়ে।

—আর একটি কে?

—আর একটি হলো মেয়ের মত।

—সে আবার কি?

—কি জানি, মেয়ের মায় সঙ্গে আলাপ হলো, উনি তো তাই বলেন।

সেই ক্ষণে উপেনের বাড়ির জানালায় দুটি হাসি-হাসি মুখ এক সঙ্গে দেখা দেয়।

একজন প্রতিবেশিনী বলেন—তোমাদের কথাই হচ্ছিল।

রমা—কি কথা?

প্রতিবেশিনী—ও তোমার কে হয়?

রমা—বোন।

প্রতিবেশিনী—এ কি রকম হলো ? তোমার মা বললেন, ওটি হলো তাঁর মেয়ের মত।

রমা—তাতে কি হলো ?

প্রতিবেশিনী—তাহলে তো আর বোন হলো না।

রমা—তাহলে বোনের মত ?

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কথাটা বলেই জানালা থেকে সরে আসে রমা। আর ঘরের নিভৃতে এসে অম্বিকে যেন ঠাট্টা ক'রে রাগাতে থাকে—বোনের মত ! বোনের মত !

মেয়ের মত, এই কথাটাকেই যেন সহ্য করতে পারে না অম্বি। কিন্তু সহ্য করতে হয়। আম্মি বা আপ্পি, যখনি অম্বির পরিচয় দেবার সময় এই কথাটা উচ্চারণ করেন, তখনই অম্বির বুকের ভিতর যেন একটা কাঁটার খোঁচা লাগে। মলিন হয়ে ওঠে মুখটা। কখনো আভাস দিয়ে ছলছল করে চোখ। এটা যে একটা পরিচয়ই নয়। কথাটা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয় অম্বিকে, এই পৃথিবীতে যেন বিনা অধিকারে আর ভুল ক'রে জন্ম লাভ করেছে ওর জীবন।

অম্বির বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে রমা যেন আজ একটু বেশি বিচলিত হয়। অম্বির হাত ধরে টান দেয় রমা।—আয় তো একবার আমার সঙ্গে।

আপত্তি করে অম্বি, কিন্তু অম্বিকে জোর ক'রে হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যায় রমা ! একেবারে এসে থামে এই ঘরের দরজার কাছে, যে ঘরের নিভৃতে বসে আলাপ করছিলেন উপেন আর চারুবালা।

উপেন আর চারুবালাকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে রমা।—তোমরা অম্বিকে শুধু 'মেয়ের মত' 'মেয়ের মত' কর কেন ?

ভয়ার্তের মত বিব্রতভাবে তাকিয়ে থাকেন উপেন আর চারুবালা। রমা বলে—আজ পর্যন্ত আমাকে বললেই না, ও আমার কে ?—আমার বোন নয় ?

চারুবালা বলেন—বোন বৈকি ?

—তবে তোমার মেয়ের মত কি ক'রে ?

—তুই ওসব বুঝবি না।

—বুঝিয়ে দিতে হবে।

—ওকে আমরা পেলেছি।

—আমাকে পাজনি বুঝি ?

—ওকে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছি।

—আর আমাকে ?

—তুই যা, ওঠ এখান থেকে। তুমি অনেক জ্বালা জ্বালিয়ে হাড়মাস ভুগিয়ে তবে এসেছ।

রমা বলে—বুঝলাম অম্বি তোমাদের জ্বালায় নি বলেই ও হলো মেয়ের মত।

উপেন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে যেন তাঁর বিশ্বাসের বেদনা দমন করবার চেষ্টা করেন।

রমা বলে—আম্মি কথাটার মানে কি মা? মায়ের মত?

চারুবালা রাগ করেন—মায়ের মত কেন হবে? ওটা একটা কথা, কথাটার মানে হলো, মা।

রমা—শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে, ও হলো আমার বোন, তুমি হলে ওর মা, কিন্তু ও হলো তোমার মেয়ের মত। অদ্ভুত!

চলে গেল রমা। অম্বিকেও হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল।

অম্বি বলে—তুই কি আবোল-তাবোল বকছিস, আম্মি কি ভাবলেন বল তো?

কিন্তু ঘরের নিভৃতে নীরব হয়ে বসে রইলেন উপেন আর চারুবালা। রমা মেয়েটার মুখরতাগুলি কি ভয়ানক! মুহূর্তের মধ্যে মনের কতগুলি গর্ব বিশ্বাস ও ধারণাকে যেন এলোমেলো ক'রে দিয়ে গেল রমার প্রশ্ন আর মন্তব্যগুলি।

কথাপ্রসঙ্গে উপেন আর চারুবালার মধ্যে আলোচনা আবার একটু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উপেন বলেন—অম্বি যদি আজ আমাকে বাপের মত মনে করে, আর তোমাকে মায়ের মত মনে করে…।

চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—কেন মনে করবে?

উপেন—কি আশ্চর্য, কথাগুলি গায়ে বিঁধছে কেন তোমার? তুমি তো এই চাইছ। অম্বি যেন আমাদের আপন বাপ-মা বলে না মনে করে, এতদিন ধরে অম্বিকে তাই মনে করাতে চেয়ে এসেছ, চেষ্টাও করে আসছো। তবে আজ কেন…!

চারুবালা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে শেষে অভিযোগ করেন—আমাকে তর্কে হারিয়ে তুমি কি সুখ পাচ্ছ বুঝি না! কিন্তু আমি ভালর জন্যই চেয়েছি, অম্বি যেন নিজেকে রমার সমান মনে না ক'রে বসে।

অগত্যা উপেনও তাঁর মনের অভিমান আর উষ্মাকে একটু শান্ত ক'রে আনেন এবং চারুবালার মতেই সায় দিয়ে স্বীকার করেন—হ্যাঁ, সমস্যা হলো সেইখানে। জাত বুঝে একটু নীচু ঘরে নীচু অবস্থার ঘরেই ওকে বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু ও এই ভুলই বুঝবে যে, আমরা ওর ওপর নিষ্ঠুরতা করলাম।

চারুবালা বলেন—উচিত হচ্ছে, এবার একটু ভাল করে শক্ত হওয়া, যেন অম্বি ভুল না বোঝে।

বাইরের বারান্দায় আগন্তুক এক ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরের সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন উপেন। চারুবালা বলেন—বোধ হয়, মেজমামা এসেছেন।

চারুবালার মেজমামা অর্থাৎ উপেনের মামাশ্বশুর এসেছেন। উপেন আর চারুবালা বাইরে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। হলঘরে বসে মেজমামাও নানা কুশল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন, কই তোমার মেয়েরা কই ?

চারু—মেয়েরা তো নয়, একটি মেয়ে।

মেজমামা—আর সেই পালিতা মেয়েটা ?

চারু—হ্যাঁ, সেও আছে।

মেজমামা—ডাক, একবার দেখে যাই ওদের।

রমা আর অম্বি এসে প্রণাম করে চারুবালার মেজমামাকে। মেজমামা সন্দেহে রমার একটা হাত ধরে বললেন—এটা বুঝি তোমার সেই পালিতা মেয়েটা। আর ওটি তোমার আপন··· ?

মুহূর্তের মধ্যে অম্বির মুখের উপর দিয়ে যেন এক দুর্লভ হর্ষের দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে চলে যায়। ভুল ক'রে যে-কথাটা বলে ফেলেছেন আম্বির মেজমামা, সেই কথাটাই যে অম্বির স্বপ্ন।

কিন্তু দেখা যায়, মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা পরাভবের আঘাতে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে চারুবালার মুখ। চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—না, ঐ তো রমা, আমার আপন মেয়ে। আর ঐ হলো অম্বি···এখন আমার মেয়েরই মত।

অম্বির দুচোখের হর্ষ আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি, তারপর চলে যায়।

চারুবালা কথা প্রসঙ্গে নিজের মেয়ে রমার নানা গুণের কথা বলতে থাকেন। লেখাপড়ায় ভাল, থার্ড ইয়ার, ইংরেজীতে অনার্স নিয়েছে। স্পোর্টসে প্রাইজ পায়, ডিবেটে আবৃত্তিতে প্রাইজ পায়। ভাল গাইতে পারে, ক্র্যাফটস্ শিখেছে নানা রকম।

রমা আপত্তি করে এবং মায়ের মুখে তার এই প্রশংসার কীর্তন শুনে লজ্জাও পায়। কিন্তু চারুবালা বলেন—রমার জন্য একটি ভাল পাত্র আপনি খোঁজ করুন মেজমামা।

পরমুহূর্তে অন্য ঘরে গিয়ে একটি আলমারি থেকে কতকগুলি এমব্রয়ডারি

আর লেসের কাজ তুলে নিয়ে এসে মেজমামার চোখের সামনে তুলে ধরেন চারুবালা।—আপনি দেখুন মেজমামা। নিজের মেয়ে বলে বাড়িয়ে বলছি না। রমার হাতের কাজ কত সুন্দর দেখুন।

চেঁচিয়ে ওঠে রমা—এগুলি আমার তৈরি নয় মা।

—তোর নয়? তবে কার?

—অম্বি করেছে!

—অম্বি? অম্বিকে কে শেখালে? তুই?

—না, নিজে শিখেছে।

—নিজে শিখেছে? তোর দেখাদেখি?

—আমি কিন্তু কোনদিন দেখিয়ে দিই নি।

অপ্রসন্নভাবে চুপ করে এবং মনের ভিতর পরাভবের ক্ষোভ কোনমতে সংযত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন চারুবালা। মেজমামা আশ্বাস দিয়ে গেলেন, উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করবেন।

তার পরেই অন্য ঘরে অম্বির কাছে গিয়ে যেন একটা চাপা আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য উপস্থিত হলেন চারুবালা।—এসব তুই শিখলি কবে?

—অনেকদিন আগেই।

—তবে লুকিয়ে রেখেছিলি কেন? আমাকে বলিস নি কেন?

উত্তর দেয় না অম্বি। চারুবালা মন্তব্য করেন—বুঝেছি।

অম্বি ছলছল চোখে বল্লে—কি বুঝলে আম্মি? আমি কিন্তু···

কিন্তু ক্ষুব্ধভাবেই অম্বির আদুরে ভঙ্গির প্রশ্ন আর কাতর স্বর উপেক্ষা করে উপেনের কাছে এসে তর্ক বাধিয়ে বসেন চারুবালা।—সমস্যা খুবই খারাপ দিকে গড়াচ্ছে।

—কি?

—রমাকে হিংসে করতে আরম্ভ করেছে অম্বি।

মেজমামার মন্তব্য শুনেই চারুবালার সংস্কারের গর্ব আহত হয়েছিল। তাঁর নিজের মেয়েকে পালিতা মেয়ে বলে বোধ হয়েছে মেজমামার, আর অম্বিকে আপন মেয়ে! অম্বির মুখের হাসিটাও লক্ষ্য করেছেন চারুবালা। অভিযোগ করেন চারুবালা—দেখলে তো ওর মনে বিষ ঢুকেছে।

উপেন বলেন—অম্বিকে দোষ দিচ্ছ কেন? বল, মেজমামার চোখে বিষ আছে।

—কেন?

—আমরা ওকে মেয়ের মত বলছি, কিন্তু পৃথিবী যে সেটা বুঝতে চাইছে না।

চারু—তুমি বলতে চাও, ভুল করছে পৃথিবীর মানুষ, অম্বি নয়?

হতাশভাবে উপেন বলেন—কে জানে?

উপেন আর চারুবালার আলোচনায় আবার নানারকম সতর্কতার সিদ্ধান্ত একে-একে দেখা দিতে থাকে। লোকে যেন ভুল না বোঝে, যেন পৃথিবীর চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিতে পারে, রমা হল আপন মেয়ে, আর অম্বি মেয়ের মত। এইবার পৃথিবীর চোখের সামনেই অম্বিকে নিজের কাছ থেকে, এই পরিবারের অন্তরের বৃত্ত থেকে একটু ভিন্ন ক'রে না রাখলে ভুল করবে সবাই, আর অম্বির মনও মিথ্যার গর্বে ও বিশ্বাসে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাবে।

অম্বিকে স্পষ্ট করেই বলে দিলেন চারুবালা—ওসব কাজ তোমার সাজে না, দরকারও নেই। রমা যা করবে, তোমাকে তাই করতে হবে, এর কোন মানে নেই। মেজমামার কাছে আমাকে যেরকম নাকাল করলে, এরকম যেন আর কখনো করো না।

লেসের বোঝা একটা আবর্জনা পিণ্ডের মত পাকিয়ে নিয়ে চুপ করে ঘরের একান্তে বসে থাকে অম্বি। ছটফট করে। তারপর আলমারির মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেই লেসের স্তূপ, বিছানার উপর শুয়ে পড়ে অলসভাবে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে অম্বি।

অম্বি আর ভুল করতে চায় না। বুঝেছে অম্বি, আপ্পি আর আম্মির মনের দুঃখটা কোথায়? রমার পক্ষে যে কাজ সাজে, অম্বির পক্ষে সে কাজ সাজে না। রমার সঙ্গে যেন কোন কাজের তুলনার মধ্যে পড়তে না হয়। রমা যে-সব কাজ করে না, এইবার থেকে মাত্র সেই সব কাজের মধ্যে হাত দুটোকে উৎসর্গ ক'রে দিতে হবে। আর, আম্মি ও আপ্পি যেন কখনো বুঝতে না পারেন, কোন দুঃখ আছে অম্বির মনে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। ঘর থেকে বের হয়। তারপর এঘর ওঘর ঘুরে কাজ করতে থাকে। মনে পড়ে, চোখে দেখতে পায়. আপ্পির জুতোগুলিতে পালিশ নেই। বিকেল হয়েছে, বেড়াতে বের হবেন আপ্পি। অম্বি ব্যস্তভাবে আপ্পির জুতোতে পালিশ লাগাতে থাকে।

রমা সাজ-সজ্জা সেরে ব্যস্তভাবে এসে অম্বিকে দেখে বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে—এ কি, তুই এখনো, এসব করছিস কি? বেড়াতে যাবি না?

—আমি বেড়াতে যাব না।

—তার মানে ?

—তার মানে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

—বাইরের ঘরে গিয়ে উপেনের পায়ের কাছে জুতো জোড়া এগিয়ে দিয়ে অগ্নি বলে—ও জুতো রাখ! এটা পরো।

চারুবালা আসেন। রমা চীৎকার করে—অগ্নি এরকম বদমাইশি করছে কেন ?

—কি ?

—বলছে, বেড়াতে যাবে না।

—নাই বা গেল, তুই একা যা।

রমা আপত্তি করে—আমি একা যাব না।

অগ্নির মুখের দিকে তাকিয়ে রমা বলে—তুই না বলেছিলি, গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে ?

অগ্নি—হাঁ বলেছিলাম, তাতে হয়েছে কি ?

—তবে এখন যাবি না বলছিস কেন ?

চারুবালা বলেন—যাবে না ওর ইচ্ছে, তুই জবরদস্তি করছিস কেন ?

রমা—তাহলে আমারও যেয়ে কাজ নেই।

চুপ করে থাকেন চারুবালা আর উপেন। তারপর যেন অনিচ্ছার সুরে চারুবালা অগ্নিকে বলেন—তবে তুইও যা।

ঘরের ভিতর গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে অগ্নি। অগ্নির সাজ দেখে চমকে ওঠেন উপেন আর চারুবালা। একটা সাধারণ মিলের শাড়ি, আচলটা আবার ছেঁড়া, যেন ইচ্ছে করেই রুক্ষসূক্ষ একটা মূর্তি ধারণ ক'রে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অগ্নি।

রমা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে অগ্নিকে ধমক দিতে থাকে। অগ্নির ভাঙা বেনীটাকে নাড়া দিয়ে, আভরণহীন কানটাকে টিপে আর ছেঁড়া আচলটাকে দোলা দিয়ে রমা বলে—আমি যাব না, তোর সঙ্গে যেতে আমার ঘেন্না করছে।

মা ও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিযোগ করে রমা—তোমরা ওকে এত লাই দিচ্ছ কেন ? কিছু বলছ না যে ?

নিরুত্তর হয়ে এদিক-ওদিক মুখ ক'রে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা ও উপেন।

অগ্নি হেসে ফেলে, আর রমাকে পাল্টা ধমক দিয়ে বলে—তুই বেশি বাজে বকিস না। চল আপ্পি।

যাবার সময় চারুবালাকে বলে যায় অম্বি—ছুধ জাল দেওয়া হয় নি এখনো রাঁধুনী দিদিকে মনে করিয়ে দিও আম্মি।

অম্বির ভালর জন্তই এই রকম কঠোরতা করতে হয়েছে। এই ধারণা আছে বলেই কঠোরতা করতে পারলেন চারুবালা। কিন্তু তবু উদাস দৃষ্টি মেলে পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। উপেনের পাশে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে ছুটি মেয়ে, একটি নিজের মেয়ে আর একটি পরের মেয়ে। চারুবালার চোখের দৃষ্টি কাঁপতে থাকে, যেন নিজের এই কঠোরতাকেই সহ্য করবার শক্তি খুঁজছেন তিনি।

চাকর এসে প্রশ্ন করে—আপনি যে এখন বের হবেন বলেছিলেন মা, ট্যাক্সি ডাকবো ?

মনে পড়ে চারুবালার শ্যামবাজারে পিসিমার বাড়িতে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখতে পান চারুবালা, ড্রেসিং আলমারির পাশে টুলের উপর রাখা আছে একটা নতুন তাঁতের শাড়ি আর ব্লাউজ, মেজের উপর ভেলভেটের একজোড়া চটি।

আম্মির জন্যই রেখে দিয়ে গেছে অম্বি, কিন্তু দেখতে পেয়ে চারুবালার ছুই চোখে যেন জ্বালা লাগে। কি ভয়ঙ্কর একটা বিদ্রূপকে সাজিয়ে রেখে গিয়েছে মেয়েটা। অম্বির নাম করে নিন্দা বর্ষণ করেন—মেয়েটা যেন আমাকে জব্দ করার জন্তই জন্মেছে।

শেষ পর্যন্ত নতুন তাঁতের শাড়িটাকে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন চারুবালা। চাকরকে বললেন—আমি যাব না।

ফটকে গাড়ি এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে আসেন শ্যামবাজারের পিসিমা, সঙ্গে এক যুবক।

শ্যামবাজারের পিসিমা এর আগেও কয়েকবার এসেছেন ব্যারাকপুরের এই বাড়িতে। পিসিমার সংসার খুবই ছোট, একমাত্র নাতি ঐ অধীরই হলো পিসিমার যত স্নেহ উদ্বেগ আর ছুশ্চিন্তার দায়। একবার কেদার-বদরী ঘুরে আসবেন, কিন্তু তার আগে নাতির বিয়ে দিয়ে সংসার থেকে দায়মুক্ত হতে চান পিসিমা। তাই কেদার-বদরীর আহ্বান বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কারণ অধীর কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। শুধু বই-পত্র আর লেখা-পড়া নিয়ে যেন একটা খামখেয়ালের জগতে বাস করছে অধীর। পিসিমার

মনে এটা একটা দুঃখ। অনেক কোম্পানির কাগজ আছে পিসিমার। মাঝে মাঝে রাগ ক'রে বলেন পিসিমা—যদি বিয়ে না করিস, আমি আর মাত্র একটি বছর দেখবো, তার পর হাসপাতালে সব সম্পত্তি দান করে দেব। পিসিমার হুমকি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে পার করে দেয় অধীর। অধীরই পাল্টা বিদ্রূপ করে, আমি বিয়েও করবো না আর তোমার সব কোম্পানির কাগজও খাব।

পিসিমা বলেন—ওটি হবে না।

পিসিমার সকল কথার মধ্যে কয়েকটি আগ্রহ সবচেয়ে বেশি প্রবল, এবং নিত্যদিন তাই নিয়ে আলোচনা করেন, বাড়ির ঝির সঙ্গে কিংবা সরকার মশাই-এর সঙ্গে। এক হলো বংশের গর্ব, দুই কেদার-বদরী যাবার আকাঙ্ক্ষা, তিন অধীরের বিয়ের জন্য চিন্তা। একটি বড় ঘর চাই, বড় ঘরের সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা একটি মেয়ে চাই। তাই পিসিমার এটা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিদিন খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করেন। কিন্তু কোন পাত্রীই পছন্দ হয় না। প্রতিদিন অধীরকে একবার রাজী করাতে চেষ্টা করেন—বিয়ে করবি কি না বলিস ?

অধীর বলে—না।

—কেন ?

—ইচ্ছে হয় না।

—ইচ্ছে হলে করবি তো ?

—ইচ্ছে হবে না কোনদিন।

পিসিমা বস্তুত একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। অধীরের বন্ধু যারা আসে মাঝে মাঝে, তাদেরও অনুরোধ করেন, বন্ধুকে বিয়ে করতে রাজী করাও।

অধীরের বন্ধু বলতে মাত্র দু-তিন জন যারা আসে, তারাও অধীরের মতই লেখাপড়ার জগতে বাস করে। সকলেই রিসার্চ-স্কলার। ওদের মন পড়ে থাকে দূর পেনসিলভিয়ারের ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে। কেউ ইতিহাস, কেউ ভাষা, এবং কেউ বা সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে। পিসিমার অনুরোধ শুনে অনেকেই বিচলিত হয়, এবং অধীরকে অনুরোধও করে—তুমি বিয়ে করে ফেল অধীর।

অধীরের উত্তরে সেই এক কথা—যেদিন ইচ্ছে হবে।

—কবে ইচ্ছে হবে ?

—তা বলতে পারি না। মোটকথা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল নয়।

বন্ধুরা হাসে। এই ধরনের আলোচনার জের মাঝে মাঝে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কক্ষে এবং বারান্দার উপরে স্কলার বন্ধুদের এক ছোট সমাবেশের মধ্যেও দেখা দেয় এবং গ্রন্থ-রাজ্যের শুষ্কতার মধ্যে সরসতার ছোঁয়াও লাগে।

বেশি নয়, সংখ্যায় ছয় জন মাত্র। ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সমাবেশ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রৌঢ় সৌম্যমূর্তি ডক্টর ব্যানার্জিও আছে। আর সবাই যুবক। এক একটি কক্ষে নোটবই ও পেন ও বিপুল গ্রন্থের স্তূপ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই সকলে অধ্যয়ন ক'রে চলে যান। কুশল প্রশ্ন, পারিবারিক সংবাদ এবং বিশেষ ক'রে নিজের নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে সকলের মধ্যে বেশ একটি অন্তরঙ্গ আলোচনা চলে। পড়া শেষ হলে কখনো অধীরের কক্ষে, কখনো ডাঃ ব্যানার্জির কক্ষে, এবং কখনো বা বারান্দার অথবা লনের উপর একটি আলাপমুখর আড্ডা দেখা দেয়। অধীরের গবেষণার বিষয় হলো—এভ্‌রি ম্যান ইজ বর্ন ইকোয়্যাল।

রুশো বলেছেন, এভরি ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি। কিন্তু অধীর প্রমাণ করতে চায়, শুধু ফ্রি নয়, ইকোয়্যাল, জন্মগত কোন সংস্কার বলেও কিছু নেই। হেরিডিটি একটা ভুয়া থিওরি। কাস্ট একটা অতি মিথ্যা, ব্লাড কোন সংস্কারেরই ধারক নয়। এমন কি আপন পর সম্পর্ক, আত্মীয়তাবোধ, এগুলিও হলো অবস্থার সৃষ্টি। রক্তের বন্ধন, নাড়ির টান—এসবই ভুয়ো।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে অধীর। পিসিমাই গর্ব ক'রে বলে থাকেন যে, সাত পুরুষ ধরে কুলীন ছাড়া অন্য কোন নীচু ঘরে এই পরিবারের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি।

অধীরের মনে যেন একটা ভয় আছে, বংশগত আভিজাত্যের ঐ সংস্কারকে কোনদিন বিশ্বাস না ক'রে বসে অধীর। তাই বন্ধুদের বলে, আমার এই রিসার্চ ডক্টরেট পাবার জন্য নয়, আমি আমার মনকেই বোঝাচ্ছি।

—এখনো কি বুঝতে পার না?

—একটু বাকি আছে।

হ্যাঁ, একটু বাকি আছে, আজও একেবারে সন্দেহহীন হতে পারে নি অধীর। পাণ্ডিত্যের দ্বারা যে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, সেই সত্যকে আজও যেন অনুভব করতে পারছে না অধীর। একটা খটকা যেন অলক্ষ্যে মনের ভিতর রয়ে গিয়েছে। স্কলার বন্ধুদের কাছে সেই কথাও বলে অধীর।—আর

একটি প্রমাণ চাই, তবেই আমার গবেষণার শেষ হবে। এমন একটি প্রমাণ, এমন একটি তথ্য, যে তথ্য অধীরের মনের খটকার অবশেষটুকু চূর্ণ ক'রে দিয়ে বিস্ময় আর বিশ্বাসে ভরে দেবে মন।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এক নিগ্রো দার্শনিকের সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই ঘটনার বিবরণ পাঠ ক'রে আশ্বস্ত হয় অধীরের মন। এই নিগ্রো দার্শনিকও চিকাগো ধর্মসভায় ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানগভীর সুন্দর এক ভাষণ দিয়েছিলেন। আফ্রিকার উপকূলে এক অরণ্যময় প্রান্তে এই নিগ্রো দার্শনিকের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণে পরাজিত হয়ে গোষ্ঠিশুদ্ধ সকলের সঙ্গে বালকও রজ্জুবদ্ধ হয়ে জঙ্গলের প্রান্তে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়েছিল। অগ্নিকুণ্ড জলছিল পাশে। শত্রুপক্ষ দামামা বাজিয়ে উল্লাসে নৃত্য করছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই সকল বন্দীর সঙ্গে বালককেও পুড়িয়ে মারবে জয়ী শত্রুর দল; জয়ী ও পরাজিত, দুই গোষ্ঠীই নাকি উগ্র নরখাদক সমাজের মানুষ। দৈব অনুগ্রহে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেল বালক। হাত-পায়ের বাঁধন যেন হঠাৎ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শত্রুর অগোচরে পালিয়ে এসে উপকূলের নিকটে শ্বেতাঙ্গ দাস-ব্যবসায়ীদের একটি জাহাজ দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল বালক। ক্রীতদাস হয়ে আমেরিকায় চালান হলো। সেই নরখাদক অরণ্যচারী মানুষের বংশজ নিগ্রো বালকই হলো সেই দার্শনিক।

কিন্তু তবু সন্দেহ থাকে। হেরিডিটি, বংশজ গুণ ও শোণিতের সংস্কার কি সত্যই মিথ্যা? ইউনেস্কোর রিপোর্ট পাঠ ক'রে আর একদিন আর একবার বিস্মিত ও সেই সঙ্গে আশ্বস্ত হয় অধীর। ইউনেস্কোর তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে রেসিয়াল ট্যালেণ্ট বলে কিছু নেই। প্রতিভা জাতিগত নয়। রক্তের মধ্যে উত্তম ও অধম কোন জাতিভেদ নেই। তবু যেন মনে একটা সংস্কারের ছায়া ছটফট করে—সাতপুরুষের বংশগর্বে লালিত গোঁড়া হিন্দুর মন একটা প্রত্যয় খুঁজে পেতে চায়, সে এই গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। নানা অরফ্যানেজ ঘুরে বংশগত সংস্কারের সত্যতা বা মিথ্যার বিচার করছে অধীর কিন্তু তাতেও নিঃসংশয় হতে পারে না।

খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করতে করতে সেদিন চমকে উঠলেন পিসিমা—এ কি, উপেনই যে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। কই আমাকে তো একদিনও বলে নি।

উপেনের মেয়ে রমার কথা মনে পড়ে পিসিমার। এই তো উপযুক্ত মেয়ে

অনেকদিনের আগের মনের আশাটাকেও নতুন ক'রে মনে পড়ে পিসিমার। অনেক দিন থেকে মনে মনে এই কথাটাই বুঝে এসেছেন পিসিমা, রমা যেমন উপযুক্ত মেয়ে তেমনই উপযুক্ত ঘর—পালটি ঘর। পিসিমা জানেন, উপেনরাও সাতপুরুষ কুলীন ছাড়া অন্য কোন নীচু ঘরে কাজ করে নি!

উপেনের মেয়ে রমার সঙ্গে যদি অধীরের বিয়ে দেওয়া যায়, তবে সব দিক দিয়েই ভাল হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই পিসিমার। চেনা ঘর, দূর সম্পর্কে কুটুমও বটে। কিন্তু রাজী হবে কি খামখেয়ালী নাতিটা?

বাড়ির ঝি-র সঙ্গে আলাপ ক'রে পিসিমা তাঁর নিজের মনের ধারণাই প্রকাশ করেন, যদি একবার উপেনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ছোঁড়াটাকে ফেলতে পারি, তবে বুঝলে বটার মা, আজকালকার ছেলেদের তো চিনি। মেয়ের মুখের একটি কবিতা শুনলেই হয়ে যাবে।

কিন্তু যে একরোখা ছেলে, নিয়ে যাওয়া যায় কি ক'রে?

অনেক চেষ্টা ক'রে, আর অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্য্যন্ত অধীরকে রাজী করালেন পিসিমা। ওরে, উপেন হলো তোর বাবার বন্ধু, তোর একটা ভদ্রতা থাকাও তো উচিত। আমি এর মধ্যে সাত দিন ঘুরে এলাম, তুই একদিনও গেলি না। ওরা কি ভাবলে বল দেখি?

অধীর—উপেনবাবুর বাড়িতে মেয়ে-টেয়ে আছে নাকি?

পিসিমা—থাক না, তাতে তোর কি?

অধীর—তাতে তোমার কথার মানেটা বুঝতে পারতাম, এই আর কি!

পিসিমা রাগ করেন—তোকে সাধছে কে? আমি কেদার-বদরী চলে যাচ্ছি, আর কোম্পানির কাগজ হাসপাতালে দান করে দেব।

অধীর হাসে—চল।

চারুবালাকে প্রণাম করে অধীর। পিসিমা চারুবালার সঙ্গে যে আলোচনা করতে চান, সে আলোচনা অধীরের সম্মুখে চলে না। পিসিমা অধীরকে বলেন তুই ওঘরে বসে ততক্ষণ বই-টই দেখ দাদু। আমরা একটু সংসারের কথা বলি।

রমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করে অধীর এবং সত্যিই বই ঘাঁটতে থাকে। বই-এর পৃষ্ঠায় নাম লেখা—রমা রায়।

এদিকে পিসিমা ও চারুবালার আলোচনা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। পিসিমা বলেন—খবরের কাগজে দেখলুম, মেয়ের বিয়ে দিতে চাও। কিন্তু আমার

ধারণা ছিল, রমা পাশ না করার আগে রমার বিয়ে দেবে না। তাই আমি কিছু বলি নি, নইলে আমারও অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল কথাটা পাড়ি।

চারুবালা—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি অম্বির জন্য।

পিসিমা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে যান—অম্বির জন্য? তাই বল, তবে বৃথাই এলুম।

চারুবালার আগ্রহে পিসিমা সবিস্তার বর্ণনা করেন, অধীরের কথা। বিবরণ শুনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন চারুবালা—আপনি এতদিন কেন বলেন নি পিসিমা? আপনার নাতি, তায় আবার এত গুণের ছেলে, এরকম পাত্র পেলে এখুনি রমাকে পার ক'রে দিই। পাশ করবে না হয় পরে।

পিসিমা—তাহলে বল? উপেন রাজী হবে তো?

চারু—খুব রাজী হবে। ভাগ্যি ভাল বলতে হবে, যদি এই বিয়ে হয়।

পিসিমা—কিন্তু একটা সমস্যা আছে। ছেলেকে রাজী করানো। তবে আমার বিশ্বাস কি জানো? রমাকে একবার দেখলে মন ফিরে যাবে। তাই ওকে সঙ্গে নিয়েই এসেছি। আর তোমাদেরও বলি অধীরকে তোমরাও মাঝে মাঝে ডেকো।

—নিশ্চয়ই ডাকবো:

—কিন্তু রমা কোথায়?

—এই এল বলে, আর একটু অপেক্ষা করুন।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বারান্দায় কতগুলি পদধ্বনির সাড়া শোনা যায়। উপেন এসে ঘরে ঢোকেন।

কিন্তু রমা আর অম্বি দুজনেই যেন নিজেদের মনের উল্লাসে কলরব জাগিয়ে আর হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে রমার পড়ার ঘরে।

পিসিমা এবং চারুবালা যে-রকমের ঘটনা তৈরি করতে চাইছিলেন, তাই হলো। রমার পড়ার ঘরে এক অপরিচিত যুবক বসে আছে, কল্পনা করতে পারে নি রমা আর অম্বি। দুজনেই ঘরের ভিতর ঢুকে অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

রমা প্রশ্ন করে—আপনি কাকে চান?

অধীর—কাউকেই না। আমার দিদিমা এসেছেন এই বাড়িতে।

অন্য ঘরে উপেনকে দেখেই পিসিমা প্রশ্ন করেন—রমা কোথায়?

—রমা আর অম্বি ঐ ঘরে।

চমকে ওঠেন পিসিমা। অপ্রসন্নভাবে ভ্রূকুটি ক'রে বলেন—অম্বি আবার ওঘরে গেল কেন?

চারুবালা একটু বিচলিত হন। তিন অভিভাবক একসঙ্গেই ব্যস্তভাবে

উঠে রমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করেন। পিসিমার নির্দেশে উঠে এসে উপেনকে প্রণাম করে অধীর। তারপর আলাপ আর প্রশ্নের পালা চলতে থাকে। উপেনের প্রশ্নে অধীর বলে—একটা চাকরিও করছি, আর রিসার্চও করছি।

চারুবালা বলেন—রমার জন্মদিন আসছে, সেদিন তোমাকে আসতেই হবে।

উপেন—শুধু জন্মদিনে কেন, রোজ আসবে, তুমি অবনীর ছেলে, বলতে গেলে আমাদের আপন জন।

অধীর—রমা কে?

চারুবালা রমাকে দেখিয়ে দিয়ে পরিচয় শোনান—ঐ আমার মেয়ে রমা, থার্ড-ইয়ার চলছে, ইংলিশে অনার্স নিয়েছে। ডিবেটে প্রাইজ পেয়েছে, স্পোর্টসে প্রাইজ পেয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে অম্বির দিকে তাকিয়ে একবার আমতা আমতা ক'রে কি যেন বলতে চেষ্টা করেন চারুবালা, তার পরেই বলে ফেলেন—ঐ হলো অম্বি, আমাদের মেয়ের মতই।

অম্বির মুখের উপর যেন অদৃশ্য এক চাবুকের আঘাতের জ্বালা এসে লেগেছে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় অম্বি। পিসিমা উপেক্ষাভরে অম্বির দিকে একবার তাকান। তাঁর ইচ্ছে অম্বি এখানে না থাকলেই ভাল।

অম্বির বোধহয় হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ভুল হচ্ছে অম্বির। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অম্বির পক্ষে সাজে না। এই মেলামেশার আসরে অম্বির কোন কাজ নেই। যে কাজ অম্বিকে এখন করতে হবে, সেই কাজ মনে পড়ে যায় অম্বির। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যায় অম্বি, এবং ঠাকুরকে চা তৈরি করতে নির্দেশ দেয়।

চায়ের কাপ নিজের হাতে নিয়ে পড়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় অম্বি—আম্মি।

চারুবালা বের হয়ে আসেন। অম্বির মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকেন। অম্বির হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চলে যান।—কি হলো আম্মি? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে অম্বি। কিন্তু কোন উত্তর দেন না চারুবালা। এক ঠাকুরের কাছ থেকে অন্য এক কাপ চা নিজের হাতে নিয়ে চারুবালা ফিরে আসেন, এবং অধীরের হাতে তুলে দেন। অম্বি স্তম্ভিতের মত বারান্দায় আর এক প্রান্তে উদাস ও আনমনার মত চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে—আবার কোথায় ভুল হলো?

পিসিমা আর অধীর বিদায় নিল। চারুবালা বলেন—তুমি তো আমাদের একেবারে পর নও অধীর। এসো মাঝে মাঝে। নিকটজন বলতে আমাদের আর ক'জনই বা আছে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। মনটা ভালই ছিল চারুবালার। অধীর ছেলেটিকে খুবই পছন্দ হয়েছে। উপেনও বার বার চারুবালার সঙ্গে আলোচনা করেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে আশাও প্রকাশ করেন—খুবই ভাল হয়, যদি অধীরের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়।

চারুবালা আরও উৎফুল্লভাবে আশাপ্রকাশ করেন—হবে না কেন? রমাকে দেখে অপছন্দ হবার তো কোন কারণই নেই।

উপেন আবার আবৃত্তি করেন সেই কথা—রমাকে নিয়ে তো কোন সমস্যা নেই, সমস্যা হলো অম্বিকে নিয়ে।

চারুবালা বলেন—রমার বিয়ের আগেই যদি অম্বির একটা গতি হয়ে যেতো, তবে বেশ হতো। বয়সে অম্বিই তো বড়, অন্তত মাস ছয়েক তো বটেই।

উপেন—আমার মনে হয়, অম্বিও এখন সমস্যাটা বুঝতে পারছে, এখন তো আর সেই পাঁচ বছর বয়সের সেই মধুপুরের বাসার একটা বাচ্চা নয়। বড় হয়েছে, বুঝতেও পারছে। শুধু ভয় হয়, আমাদের যেন ভুল না বোঝে।

চারুবালা—কি ভুল করেছি যে আমাদের ভুল বুঝবে?

উপেন উত্তপ্ত স্বরে বলেন—এই যে আজ কাণ্ডটা হলো। মেয়েটাকে একটা ছেড়া কাপড় পরিয়ে সারা রাজ্যি ঘুরিয়ে আনা হলো।

চারুবালার মেজাজও উত্তপ্ত হয়—তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ মনে হচ্ছে!

উপেন—খোঁটা দিচ্ছি আমার অদৃষ্টকে। ছিঃ।

চারুবালা বিরক্তভাবে ঘর ছেড়ে চলে যান। যেতে যেতে মন্তব্য করেন —আমি লাই দিতে পারবো না, পরের মেয়েকে মাথায় নিয়ে থাকতে পারবো না।

চারুবালার মনের একটা ভয় এইবার চারুবালাকে সত্যই মাত্রাছাড়া ভাবে কঠোর করে তুলেছে। পিসিমা সবই জানেন, কোন্ এক জঙ্গলের কোন্ এক অন্ত্যজ কুলি পিতা-মাতার সন্তান হলো অম্বি। পিসিমা এই বাড়ির ধুলো মাড়ান, এই তাঁর যথেষ্ট কৃপা। অম্বি আছে বলেই পিসিমা এই বাড়ির জল খান না। তবু সব সহ্য ক'রে আর ক্ষমা ক'রে, এই বাড়ির মঙ্গলের জন্যই রমাকে ঘরের বউ ক'রে নিয়ে যেতে চান পিসিমা। অধীরের সঙ্গে

রমার বিয়ের প্রস্তাব এই মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি অধীর জানতে পারে যে, জাতপাতের সংস্কার তুচ্ছ করে এই বাড়ির মানুষগুলি এক অন্ত্যজ মেয়েকে নিয়ে স্নেহের আর আদরের মাখামাখি করছে। বড় বংশের ছেলে অধীরের মনে বড় সংস্কার থাকবে, এ তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু পিসিমা সহায় আছেন তাই ও সমস্যা দেখা দেবে না। অম্বির জাতের কথা জানতেও পারবে না অধীর।

বারান্দা দিয়ে নিজের মনের উষ্মায় মন্তব্য করতে করতে চলে যাচ্ছিলেন চারুবালা, হঠাৎ সেই মন্তব্যের আঘাতে বারান্দার এক প্রান্তে একটি ছায়া নড়ে ওঠে। পরের মেয়ে—কথাটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছে অম্বি।

আম্মি ? তীব্রস্বর আর্তনাদের মত আহ্বান শুনে থমকে দাঁড়ান চারুবালা, ডাক দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অম্বি। অম্বির চোখে মুখে অদ্ভুত একটা শাণিত কৌতূহল ছটফট করছে। এরকম অশান্ত হতে অম্বিকে কখনো দেখেন নি চারুবালা।

—আমি কে আম্মি ?

এত কঠোর আর এত স্পষ্ট একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না চারুবালা। প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে এক-পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ান চারুবালা। অম্বি বলে—কোনদিন বল নি, আজ বলতেই হবে। আমি না শুনে ছাড়বো না।

—তোর তো বড় সাহস বেড়েছে অম্বি !

—বল, আমি না শুনে ছাড়বো না।

—কি শুনতে চাস ?

—আমার ছোঁয়া চা কি বিষ ?

চারুবালা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে—বুঝেছি, বেশ বুদ্ধি রেখে ঝগড়া করতে শিখেছিস তো ?

চিৎকার করে অম্বি—বল, আমি কে, আমার ছোঁয়া চা মানুষ খাবে না কেন ?

মেজাজ হারিয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—তুই ছোট জাত। যে জাতের ছোঁয়া ভদ্রলোক খায় না, সে জাতের দরজা মাড়ায় না ভদ্র জাতের মানুষ।

—আমার জাত ছোট কেন হলো ?

—ছোট জাতের বাপ মা-র ঘরে জন্মেছিস তাই।

—কোথায় সেই ছোট জাতের বাপ-মা।

—নেই, পৃথিবীতে নেই। থাকলে তুই আমার বোঝা হয়ে···!

চারুবালার হাত ধরেছিল অম্বি, শক্ত ক'রে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যান চারুবালা। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, উগ্র চোখের দৃষ্টি হঠাৎ জ্বালায় ছলছল ক'রে ওঠে। ছটফট ক'রে চলে যান চারুবালা। অম্বি একটা ভাঙা মূর্তির মত মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে।

নিজের ঘরে বিছানার উপর শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন চারুবালা। উপেন এসে বলেন—তুমি ওসব কথা ওকে কেন বলতে গেলে? কি লাভ হলো?

কোন উত্তর দেন না চারুবালা। ঠাকুর এসে বলে—অম্বিদি বললেন, খাবেন না।

উপেন—অম্বি খায়নি এখনো?

ঠাকুর—না।

চারুবালা উঠে বসে—তোমরা খেয়েছ?

উপেন—হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।

ঠাকুর—রমাদিও খেয়েছেন।

চারুবালা ঠাকুরকে বলে—আমি খাব না।

ঠাকুর কুণ্ঠিতভাবে চলে যায়।

উপেন—নাঃ, আমার আর এসব ভাল লাগে না। উদ্‌ভ্রান্তের মত আর আক্ষেপের সুরে বলতে বলতে চলে যান উপেন।

কিছুক্ষণ পরেই চারুবালা ওঠেন। রান্নাঘরে ঠাকুরকে থালাতে খাবার সাজাতে বলেন। নির্দেশ দেন—নিয়ে এস।

অম্বির ঘরে ঢুকে ডাক দেন চারুবালা—অম্বি।

অম্বি ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে। চোখে হাসি দেখা দেয়। লজ্জা পায় অম্বি! একেবারে শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে যায় অম্বির চেহারা। উল্টো অনুযোগ ক'রে চারুবালাকে অম্বি প্রতিবাদ জানায়—ছিঃ, আম্মি, তুমি এসব কি করছো? আমি একটুও রাগ করি নি আম্মি।

—তা হলে খা।

খেতে বসে অম্বি। চারুবালা বলেন—আমরা তো আর তোর পর নই, তোর ছোঁয়ায় আমাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু বাইরের লোক, সমাজের আর পাঁচজন তো তোকে আর মায়ার চোখে দেখে না। তারা জাত বুঝে চলে।

উপেনের ছায়ামূর্তি দেখা যায়, দরজার বাইরে নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখে শান্ত হয় উপেনের উদ্বিগ্ন চোখ, নিজের হাতে দুধের বাটি তুলে অম্বিকে খাইয়ে দিচ্ছেন চারুবালা।

অম্বির কাছে, একটা পরের মেয়ের কাছে এইভাবে হার মানতে মানতে চলেছে এই বাড়ির সব উষ্মা অভিযোগ সতর্কতা আর কঠোরতা। কিন্তু এখনো বোধহয় বুঝতে পারেন না উপেন আর চারুবালা, তাঁরা হার মানছেন হার মানতে বাধ্য হয়েছেন তাদের নিজেদেরই অন্তরের গোপনে নিহিত একটা স্নেহান্ধতার কাছে।

তবে এইবার কিছুটা আশ্বস্তও হয়েছেন উপেন আর চারুবালা। অম্বি তার জন্ম-পরিচয় জেনেছে। এইবার বুঝেছে অম্বি। বুঝেছে আরও ভাল ক'রে নিজের অদৃষ্টকে। রমাতে আর অম্বিতে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যটুকু স্বীকার ক'রে নিয়ে অম্বি নিশ্চয়ই এইবার তার ভাগ্যকে স্বীকার করে নেবে শান্তভাবেই। আপ্পি আর আম্মির স্নেহকে সন্দেহ করবে না অম্বি।

সুতরাং, অম্বির বিয়ের জন্যও একটু ভাল করে চেষ্টা করতে হয়। জাতের সংস্কারে বাঁধা এই সমাজে কোথাও কোন্ উদার মানুষ আছে, যে মানুষ জাত মানে না, শুধু মানুষের মেয়ে বলে সম্মান ক'রে অম্বিকে ধরে নিয়ে যাবে। হয়তো আছে। কিন্তু কেমন ক'রে খোঁজ পাওয়া যায়?

অনুসন্ধান করেন উপেন। আশ্রমে পালিতা মেয়েদের বিয়ে হয় কোথায় কেমন ক'রে? খোঁজ নিয়ে আরও হতাশ হয়ে পড়েন, এবং কল্পনা করতেও ভীত হয়ে ওঠেন উপেন। চারুবালাকে আরও চিন্তিত ক'রে উপেন বলেন—যেখানে খোঁজ করছি, দেখছি পাত্র আছে ঠিকই। কিন্তু একেবারে ভিন্ন ধর্মের পাত্র, যারা জাতপাত মানে না। তা-ছাড়া, আর যে-সব ব্যাপার শুনলাম, সে আরও ভয়ানক। যত নারী আশ্রম জুড়ে যত সব পাপীর দল বসে আছে। সেখানে বিয়েটা একটা কৌশল মাত্র, মেয়েগুলিকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায়।

আতঙ্কিতভাবে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা। তোমাকে আর ওভাবে খোঁজ করতে হবে না। ঐ বিজ্ঞাপনই ভাল। লোক বুঝে খোঁজ খবর নিয়ে তবে সম্বন্ধ করা যাবে।

বিজ্ঞাপনেরই সূত্রে এক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক এসে দেখা দিলেন একদিন। পাত্রের পিতা। উপেন স্মরণ করতে পারেন না, কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোক

বলেন—আমি ও আপনি এক কলেজেরই ছাত্র ছিলাম। নামটা এখনো স্মরণে আছে, বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝেছি। যাক, ওসব যৌতুক-কৌতুকের আগ্রহে নয়, আপনার মত মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, মাত্র এই আগ্রহে। তাছাড়া আপনার মামাশ্বশুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জেনে আরও আগ্রহ হলো।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক মেজমামার কাছ থেকে উপেনের সম্পত্তির কথা শুনতে পেয়েই উৎসাহিত হয়েছেন।

ভদ্রলোক বলেন, তিনি এসব বিষয়ে অতি উদার; যৌতুক সম্বন্ধে তাঁর কোন দাবি নেই, ওটা স্বেচ্ছার ব্যাপার। দাবি করা বর্বরতা। তিনি শুধু মানুষ বোঝেন। মানুষ ভাল হলেই সব ভাল।

ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে সমাজের নিন্দা করেন। এখনো কতরকম জাত-পাতে সংস্কারে বাঁধা রয়েছে সমাজ! বংশ বড় কথা নয়, ভদ্রতা হলো বড় কথা। টাকা আসল নয়, রুচি ও শিক্ষা দীক্ষা হলো আসল কথা। আক্ষেপ করেন— কবে যে সমাজের মনে উদারতা জাগবে?

আশা জাগে উপেনের মনে। সকৃতজ্ঞ ও সপ্রশংভাবে আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে পাত্রের পরিচয় জানতে থাকেন উপেন। পাত্র সুশ্রী। পাত্র দোকান দিয়েছে, কাপড়ের দোকান, তবে একটু ক্যাপিটেলের দরকার হয়ে পড়েছে।

—তার জন্ম কোন চিন্তা নেই।

—আমি আপনার কাছ থেকে এই রকমই আশা করেছিলাম উপেনবাবু; আপনার মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে নিয়ে ·।

উপেন এইবার আসল সমস্যার কথা উত্থাপন করেন।— কিন্তু একটি কথা আপনাকে জানাই। পাত্রী আমার মেয়ে নয়। যার বিয়ের কথা বলছি, সে আমার মেয়ের মত।

—আজ্ঞে? ··হ্যাঁ, তাতেই বা কি এসে যায়?

—আমার পালিতা মেয়ে। মেয়েটি জাতে ছোট।

—কি রকম? কুলীন ঘরের নয়?

—ছোট জাতের···বেশ একটু, যাকে বলে জল অচল জাত।

ভদ্রলোক অপ্রসন্নভাবে এবং একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ান। এরকম কথা আপনার কাছে শুনবো বলে আশা করি নি।

—সে কি? আপনার মত সন্দেহমুক্ত, উদার চিত্ত··· ।

—রাখুন মশাই। তার চেয়ে যদি বলতেন, মেয়ের দুটো পা নেই…।

বলতে বলতে চলে গেলেন ভদ্রলোক।…এরকম লোকঠকানো বিজ্ঞাপন আর দেবেন না মশাই।

অসহায় অপমানিতের মত, আহত রোগীর মত অবসন্নভাবে বসে থাকেন উপেন। চারুবালা এগিয়ে আসেন।

উপেন বলেন—শুনলে তো?

—শুনেছি। এইরকম ব্যাপার যে দাঁড়াবে, সেটা বিশ বছর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

—কি করা যায়?

—ওসব ভদ্রঘরের আশা ছেড়ে দাও। আর কী সব ভদ্রঘর দেখছো তো?

আশ্চর্য করলো অধীর। পিসিমার যে প্রশ্নকে প্রতিদিনই সোজা উত্তর দিয়ে শুধু না ক'রে এসেছে অধীর আজ সেই প্রশ্নের সম্মুখেই যেন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল অধীরের এতদিনের সংকল্পের শক্ত গ্রন্থিটা। আমতা আমতা ক'রে যে ভাষায় উত্তর দেয় অধীর, তার মোটামুটি অর্থ এই দাঁড়ায় যে বিয়ে হলে আপত্তি নেই।

তবে তো ওষুধে ধরেছে। পিসিমার গম্ভীর মুখে হাসির ছায়া কাঁপে, এবং সাফল্যের আনন্দ ঝি বটার মা'র কাছে জানিয়ে এবং অধীরকে সঙ্গে নিয়েই সোজা উপেনের বাড়িতে চলে এসেছেন পিসিমা।

—লক্ষণ ভাল, লক্ষণ ভাল। পিসিমা উৎফুল্ল স্বরে বলতে থাকেন। আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হলো।

চারুবালা—কি ভেবেছিলেন?

—ভেবেছিলাম, ছোঁড়াকে যদি একবার কোনমতে টেনেটুনে নিয়ে এসে রমার সামনে ফেলতে পারি, তবে ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যাবে।

পিসিমার কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে চারুবালার দুই চক্ষু। উপেনও শুনে খুশি হন।

চারুবালা প্রশ্ন করেন—কিন্তু অধীর কোথায়?

পিসিমা—অধীরও এসেছে।

সুবিজ্ঞা পিসিমা অধীরকে আর একবার রমার পড়ার ঘরে বসিয়ে, অর্থাৎ রমার চোখের সামনে বসিয়ে রেখেই ভিতরে এসেছেন।

অধীর বাইরের বারান্দায় বসতে চেয়েছিল, আর রমাকে আপনি বলে

সম্বোধনও করেছিল! পিসিমাই অধীরের ভুল শুধরে দিয়েছেন—রমাকে তুই আপনি করে বলছিস কেন রে? আপনি নয়, তুমি তুমি। তোর চেয়ে বয়সে রমা কত ছোট।

রমাও ভদ্রতা ক'রে বলেছে—বারান্দায় বসবেন কেন?

অধীর—তোমার পড়ার ব্যাঘাত হবে।

রমা—একটুও না। আমার পড়া হয়ে গিয়েছে।

পড়ার কথা উঠতেই অধীরের পড়ুয়া জীবনের সব আগ্রহ রুচি আর ইচ্ছা যেন একটা স্বচ্ছন্দ সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। পড়ার কথা থেকে বই-এর কথা, সাহিত্যের কথা, কাব্যের কথা, শেকসপীয়র ও শেলি পর্যন্ত আলোচনা গড়াতে থাকে।

কলেজ ম্যাগাজিনে রমার লেখা একটি কবিতার খুব প্রশংসা করে অধীর। কবিতার নাম 'চন্দ্রমল্লিকা'।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয় অধীর। চন্দ্রমল্লিকা এই কথাটাই যেন কয়েকদিন আগের একটি মিষ্টি গম্ভীর ও শান্ত মুখচ্ছবি চকিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে অধীরের, তার হাতে একটা চন্দ্রমল্লিকা ছিল···এইঘরে এইখানে দাঁড়িয়েছিল সে। হঠাৎ চলে গেল। রমার মা যাকে বললেন তাঁর মেয়ের মত, কোথায় গেল সেই মেয়ে? সে কি এই বাড়ির মেয়ে? এখানেই থাকে?

রমাকে প্রশ্ন করে অধীর—আচ্ছা, সেদিন যে আর একজনকে দেখলাম, তোমার মা যাকে বললেন মেয়ের মত···

—অম্বির কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আসুন।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে রমা; বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় —অম্বি!

কোন সাড়া না পেয়ে, বারান্দা থেকে নেমে বাগানের এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—অম্বি! দেখতে পায় রমা, অম্বি দাঁড়িয়ে আছে জলের ঝারি হাতে, চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে।

—আসুন। অধীরকে ডাক দিয়ে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অম্বির কর্মব্যস্ত মূর্তির সম্মুখে দাঁড়ায় রমা। বিব্রত লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অম্বি। রমাই চীৎকার ক'রে অম্বির গুণের পরিচয় ব্যাখ্যা করে, এবং সেই ব্যাখ্যায় অম্বির পরিচয় যেন এক নতুন রহস্যের ফুলের মত ফুটে ওঠে।

রমা বলে—আমি কবিতায় চন্দ্রমল্লিকা লিখি, আর অপ্নি সত্যি চন্দ্রমল্লিকা ফোটায়।

বিস্মিত অধীরকে আর একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেয় রমা। এই যত সব ফুল দেখছেন, সবই ওর হাতের যত্নে তৈরি। ওর হাতে যাদু আছে।

কথাপ্রসঙ্গে অধীর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—অপ্নির লেখা কবিতা কোথায়? দেখতে চাই কার রচনা ভাল।

রমা বিব্রতভাবে বলে—অপ্নি ওসব···

অধীর নিজের কথার ঝোঁকেই নানা প্রশ্ন করতে থাকে।—অপ্নিও কি ইংলিশে অনার্স নিয়েছে? অপ্নির এখন কোন্ ইয়ার? কোন্ কবিকে ভাল লাগে অপ্নির? শেকসপীয়রের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ভাল না মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ভাল?

রমাই অপ্রস্তুত হয়ে, আর একটু বিচলিত হয়ে বাধা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে অধীরকে—অপ্নিকে কেন মিছিমিছি ওসব কথা ব'লে···।

হঠাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন উপেন, চারুবালা আর পিসিমা। উপেন আর চারুবালা পিসিমাকে নতুন বাড়ির অন্দর ও বাহিরের মূর্তিটাকে দেখিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। কোথায় এখনো কাজ বাকি আছে কোথায় নতুন দুটো ঘর আরও হবে। একটা অসম্পূর্ণ সিঁড়ির কাছে এসে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন পিসিমা। আতঙ্কিত পিসিমা বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বল্লেন—এ যে আত্মহত্যার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছ উপেন!

তারপর আবার নারকেলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পারিবারিক নানা সমস্যার কথা আলোচিত হয়। অপ্নির জন্য যে দুশ্চিন্তা রয়েছে মনে, সেকথাও প্রকাশ করেন চারুবালা। অপ্নির সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—মেয়েটা অবুঝ নয়, এবং ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ, যে-কোন জাতের ঘর, একটু গরিব হলেই বা ক্ষতি কি, মোটামুটি মানুষ ভাল, এই রকম ঘরে যদি মেয়েটাকে নিতে কেউ রাজী হতো তবে···।

পিসিমা আশ্বাস দেন—বলতো আমি চেষ্টা করি।

চেষ্টা করুন পিসিমা।

পিসিমার মনের ইচ্ছা, অপ্নির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা আগে ভাগেই করে রাখা ভাল। কারণ পিসিমার মনে একটা শঙ্কা আছে যে, উপেনের এই সম্পত্তির অধিকারে যেন অপ্নি নামে ঐ পরের মেয়েটা কোন ভাগ দাবি করার সুযোগ না পায়। যেন ঐ ঝঞ্ঝাটই না দেখা দেয়, তারই জন্য পিসিমার মনে চিন্তা আছে। একমাত্র মেয়ে রমাই পাবে সম্পত্তি, এবং রমার পাওয়া অর্থ

তাঁর নাতি অধীরের পাওয়া। অম্বির যদি বিয়ে না হয়, তাহলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। কারণ মায়ার বশে উপেন তার ঐ পালিতা মেয়ের জন্ম সম্পত্তির কিছু রেখে যাবেই। সমস্যার এই দিকটা কদিন থেকেই পিসিমার মনের ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তুলেছে।

অম্বির সম্বন্ধে উপেন আর চারুবালার মায়ার ব্যাপার দেখে মনে মনে আরও সাবধান হয়েছেন পিসিমা। হ্যাঁ, খোঁজ করতে হবে, উপেনের এই পালিতা মেয়েটার জন্ম এমন একটি পাত্র খুঁজতে হবে, যাকে মাত্র দু-তিনটি হাজার টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেই সে খুশি হয়ে উপেনকে দায়মুক্ত করে দেবে। তারপর, উপেনের যা রইল, সবই মেয়ে রমার জন্য, অর্থাৎ জামাই-এর জন্য ; অর্থাৎ তাঁরই স্নেহের নাতি অধীরের জন্য রইল। এই ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে পারলেই খুশি মনে কেদার-বদরী যেতে পারবেন পিসিমা।

পিসিমা তাঁর যুক্তিগুলি মনের ভিতর চেপে রেখে শুধু ইচ্ছাটাকেই ব্যক্ত করলেন ? আশ্বাস দিলেন—কোন চিন্তা নেই, অম্বির একটা গতি ক'রে দিচ্ছি।

হঠাৎ চোখে পড়ে সকলেরই, চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে অধীর আর রমা, আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনছে অম্বি। দৃশ্যটাকে দেখতে ভাল লাগে না কারও। তাই সবাই ব্যস্তভাবে ঘটনাকে যেন একটু ভাল ক'রে বুঝবার জন্ম এগিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়েছেন।

অধীর রমার কলেজ ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে— রমার কবিতা চমৎকার। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, অম্বি কেমন লেখে ?

চারুবালা মৃদু হেসে বলেন—তুমি ভুল বুঝেছ অধীর। অম্বির ওসব গুণ নেই। অম্বি এইসব ফুল ফোটানো আর বাগান সাজানোর কাজই করতে পারে, আর এইসব কাজ নিয়েই আছে।

অধীর হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। পিসিমাই বাধা দিয়ে বলেন—চল্ দাদু।

অম্বি একা দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে। আর উপেন চারুবালা পিসিমা রমা ও অধীর ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যায়। বিদায় নেয় পিসিমা ও অধীর।

এত বড় পৃথিবীর সংসারভরা এই আলোছায়ার মধ্যে যেন বিশেষ ক'রে তিনটি স্থানের ঘটনার রূপগুলিই একে একে বদলে যেতে থাকে। ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়ি, শ্যামবাজারের ঐ বনেদি বাড়ি, আর বেলভেডিয়ার বাগানের

ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠকক্ষ। এই তিন ভিন্ন স্থানের মানুষগুলির মনের আগ্রহও এক একটি কারণে ও ঘটনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, দুটি চেষ্টায়। অধীরকে বিয়ে করতে রাজী করাবার চেষ্টায়। পিসিমার বিশ্বাস আছে, অধীরের বিয়ে করতে রাজী হওয়ার অর্থ রমাকে বিয়ে করা। উপেনের সম্পত্তির বংশের ও স্বভাবের গুণগান করেন পিসিমা। রমার প্রশংসায় সর্বদা মুখর হয়ে থাকেন পিসিমা। অধীর শোনে, বেশ আগ্রহ নিয়েই শোনে। কিন্তু স্পষ্ট ক'রে কোনো মন্তব্য করে না।

আর একটি দুরূহ ব্রতে ব্রতিনী হয়েছেন পিসিমা। অম্বির জন্য একটা পাত্রের সন্ধান। বটার মাকে বলেন, ড্রাইভারকে বলেন, বলতে বলতে মনের কথাও প্রকাশ ক'রে ফেলেন পিসিমা—তোমরা চেষ্টা ক'রে একটা খোঁজ খবর কর, যেমন-তেমন একটা মানুষ হলেই হোলো। দোজবরে হোক, আর তেজবরে হোক। যে কোন জাত হোক। হাভাতে হোক, আর যাই হোক, কুড়িয়ে পাওয়া একটা মেয়েকে পার করতে হবে, তার জন্য তো আর রাজপুত্তুর পাওয়া যাবে না!

ড্রাইভার আশ্বাস দেয়, বটার মাও বলে—দেখছি খুঁজে, নিশ্চয় পাওয়া যাবে এমন পাত্তর।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠকক্ষে একা বসে যখন বই-এর স্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি করে অধীর, তখন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে। হঠাৎ নিজেই লজ্জা পায়।

পরদা সরিয়ে প্রৌঢ় স্কলার ডক্টর ব্যানার্জি যখন উঁকি দেন, তখন আনমনা ও উদাস অধীরকে দেখে বেশ একটু বিস্মিত হন। হেসে হেসে প্রশ্ন করেন—হ্যালো ইয়ং স্কলার, আনমনা কেন?

লজ্জিত অধীর ডক্টর ব্যানার্জিকে কাছে ডেকে আবার তার থিসিস নিয়ে আলোচনা করে। ডক্টর ব্যানার্জি আশ্চর্য হয়ে বলেন—সে কি, আর কিছুই তো এগোয়নি দেখছি, সেই হেরিডিটির চ্যাপ্টার নিয়েই পড়ে আছ।

স্কলার বন্ধুরা মাঝে মাঝে লাইব্রেরির বারান্দায় আড্ডায় আলোচনা করতে বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে সন্দেহই করে ফেলে—অধীরের হলো কি? আজকাল প্রায়ই অ্যাবসেণ্ট হচ্ছে দেখছি। যায় কোথায়?

বন্ধুরা জানেন না, অধীর তখন ব্যারাকপুরের এক নতুন বাড়ির বাতাসে যেন তার জীবনের প্রথম অনুভূত এক সৌরভের রহস্যকে সন্ধান ক'রে ফিরছে। প্রায়ই আসে অধীর। এবং অধীরের এই আসা-যাওয়ার ঘটনার ভিতর দিয়েই

এই বাড়ির যে পরিণাম তৈরি হয়ে চলেছে, সেই বাড়ির বাপ ও মা অনুমান করতে পারেন।

অধীর বুঝতে পেরেছে, কেন সে আসে? কোন গুণ নেই, কবিতা লিখতে পারে না, সামান্ত লিখতে পড়তে মাত্র শিখেছে, অম্বি নামে সেই মেয়েই যে মূর্তিমতী কবিতার মত ফুটে রয়েছে। এই বাড়ির বাগানের চন্দ্রমল্লিকাও যেন অম্বির মতই গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ। শুধু চোখের তৃষ্ণা নয় বুঝতে পেরেছে অধীর, তার মনের এক দুর্বার তৃষ্ণা তাকে একেবারে বেহায়া করে দিয়ে এই বাড়ীর দিকে টেনে আনে, প্রায় প্রতিদিন। অম্বিকে দেখতে ভালো লাগে, অম্বিকে দেখতে আশ্চর্য লাগে।

নার, উপেন ও চারুবালা বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের সুন্দরী শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না মেয়ে রমার রূপের আর গুণের আকর্ষণেই অধীর নামে ঐ শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন আর উচ্চবংশীয় ছেলেটি এখানে আসে। দেখতে পায়, দেখে নিঃসংশয় হন উপেন আর চারুবালা। রমার প্রতিভা, রমার লেখা-পড়ার কৃতিত্ব, রমার নানা গুণের প্রশংসা করে অধীর। অম্বির সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলে অধীর, কিন্তু সেটা নিতান্তই কথা বলা মাত্র! দেখে খুশী হয়েছেন চারুবালা, অম্বিও অধীরের কাছ থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসে। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে অম্বিকে, ভাল করেই জানে অম্বি, অম্বির ছোঁয়া জল খেলে জাত যাবে অধীরের। সুতরাং অন্য কোন ভয়কে মনে স্থান দেন না চারুবালা ও উপেন।

এর মধ্যে চিন্তার দিক থেকে শুধু নির্বিকার মনে হয় রমাকে। রমা এখনো যেন রহস্যের বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে নি। আড়ালে আলাপ ক'রে হাসাহাসি করেন উপেন ও চারুবালা।—রমা মেয়েটার মনটা একেবারে সাদা! এখনো কল্পনাও করতে পারে নি যে, অধীর ওকে বিয়ে করতে চায়, ওরই জন্য অধীর আসে, বিয়ে হবে অধীরেরই সঙ্গে। যদি বুঝতো, তবে রমা সেদিন অমন করে অধীরকে একা ঘরে বসিয়ে রেখে গটগট ক'রে কলেজের স্পোর্টসে চলে যেতে পারতো না। এখনো স্পোর্টসই ওর কাছে জীবনের সব চেয়ে বেশী প্রিয়!

চারুবালা মাঝে মাঝে উপদেশ দেন রমাকে—অধীর এলে ওরকম হেলাফেলা ভাব দেখাস নি। কত ভাল ছেলে, কত শিক্ষিত, কত বড় বংশের ছেলে। আপন জন মনে করে বলেই তো আসে।

কিন্তু এই উপদেশ প্রায়ই ভুলে যায় রমা।

বারান্দার থামের পাশে সোফায় বসে আন্নির চাদরের ছেঁড়া রিপু করে অন্বি। হঠাৎ ফটকের দিকে চোখ পড়তেই চমকেওঠে। অধীর আসছে, থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে অন্বি। কিন্তু অধীর এসেই হাসিমুখে অন্বির কাছে দাঁড়ায়। অন্বি অপ্রস্তুত ভাবে আর একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলে—আসুন, রমা আছে ওখানে।

অধীরও একটু বিব্রতভাবে চলে যায় রমার ঘরের দিকে। রমাও অধীরকে দেখতে পেয়েই ব্যস্তভাবে বলে—আসুন। পরমুহূর্তে বলে—ঐ যে ওখানে অন্বি বসে রয়েছে।

অধীর বলে—হ্যাঁ, অন্বির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

দু'চারটে মোটা মোটা বই আর ম্যাগজিন অধীরের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে রমা বলে—পড়ুন আমি আসছি।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে অন্বিকে দেখে একবার থমকে দাঁড়ায় রমা তারপর বলে—গীতার মা ডেকেছে, আমি চললাম।

অন্বি—কেন?

রমা—চণ্ডালিকার রিহার্সাল আছে।

তারপর একটু ভ্রূভঙ্গি ক'রে আর বাইরের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে আস্তে আস্তে বলে—আর পারিনা, ভদ্রলোক সব সময় বই নিয়ে যত ঘ্যানর ঘ্যানর—ধেৎ।

অন্বি শাসনের ভঙ্গিতে বলে—ছিঃ, কি আবোল তাবোল বলছিস।

চলে যায় রমা।

চারুবালা এসে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন অন্বিকে—রমা কোথায় গেল?

অন্বি উত্তর দেয়—গীতাদের বাড়ি।

চারুবালা মেয়ের উদ্দেশ্যে ধমক দিতে গিয়ে সামলে নিলেন। তারপর ঘরের ভিতর অধীরের কাছে এসে রমারই প্রশংসা ক'রে বলেন—রমা খুব সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে কি না, তাই ওরই ওপর অভিনয় দেখাবার ভার পড়েছে। গুণ আছে, লোকে ছাড়বে কেন? যাক—তুমি চা না খেয়ে যেও না অধীর।

চারুবালা চলে যেতেই এই বাড়ির এইখানেই যে একটি নিভৃত এক মধুর সুযোগ নিয়ে আপনি ধরা দেয়, সেই নিভৃতের মধুরতা তুচ্ছ করে থাকতে পারে না অধীর। পড়ার ঘর থেকে নিজেই উঠে আসে বই হাতে নিয়ে।

অম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়। অম্বি অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। অধীর বলে—তোমার সবচেয়ে বড় গুণ কি জান অম্বি ?

অম্বি আশ্চর্য হয়—আমার ?

অধীর - হ্যাঁ তোমার সবচেয়ে বড় গুণ হলো, তোমার কোন গুণ নেই।

অধীরের কথার মধ্যে যেন মোহ আছে। কিন্তু শুধু শুনতে পেয়ে নয়, অধীরের চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সন্ত্রস্ত হয় অম্বির চোখের দৃষ্টি। অধীরের ঐ চোখেও যে কেমন একটা মুগ্ধতা ফুটে রয়েছে।

অম্বি প্রশ্ন করে—দিদিমা কেমন আছেন ?

হেসে হেসে অনুযোগ করে অধীর—এই কি আমার কথার উত্তর হলো ?

অম্বি হাসে—আমি কি বলবো বলুন ?

অধীর—কেন ? জিজ্ঞাসা করলেই তো পার, আমার সবচেয়ে বড় দোষ কি ?

অম্বি—আপনার দোষ ?

অধীর—হ্যাঁ।

অম্বি হাসে—আপনার দোষ থাকলেও আমিতো কিছু জানি না, বুঝতেও পারি না।

অধীর—সত্যিই বুঝতে পার না।

অম্বি—না।

অধীর—আমার সবচেয়ে বড় দোষ, তোমাকেই দেখার জন্য এখানে আসি।

চমকে উঠে, ভীতভাবে মুখ লুকোবার চেষ্টা করে অম্বি। ঘরের ভিতর থেকে ডাক শোনা যায় চারুবালার—তোমার চা দেওয়া হয়েছে অধীর।

একেই বোধহয় বলে পরশমণির ছোঁয়া। অম্বির মনের সব ভাবনা ও স্বপ্নের রং বদলে দিয়ে গেল অধীরের ঐ কয়েকটি কথা আর অধীরের চোখের ঐ দৃষ্টি।

কাজ করতে করতে আনমনা হয় অম্বি। জীবনে এই প্রথম হঠাৎ ভুল ক'রে কাজের মাঝখানেই বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়। দৃষ্টি ছুটে যায় ফটকের দিকে। আগন্তুক একটা পদধ্বনির জন্য অম্বির মনের কল্পনাই যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কখনো বা এসে রমার পড়ার ঘরের ভিতরে দরজার বাইরে থেকে উঁকি দেয়। দেখতে পায়, শুধু একা রমা পড়ার বই কোলে নিয়ে কৌচে বসে

ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় রমা। প্রশ্ন করে—কি রে? চোরের মত তাকাচ্ছিস কেন রে?

ঘরে প্রবেশ করে অম্বি—তুই ডাকাতের মত ঘুমোচ্ছিস কেন রে? পরীক্ষা এগিয়ে আসছে মনে নেই।

—তুইও আমাকে শাসন করবি? রমা তেড়ে আসে। অম্বি ছুটে গিয়ে হলঘর পার হয়ে একেবারে ভিতরের বারান্দায় গিয়ে আপ্পির পিছনে ভাল মানুষের মত দাঁড়ায়। রমা ব্যর্থ হয়ে ভালমানুষের মত বই হাতে চারুবালার চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

কৌতূহলী হয়ে রমাকে প্রশ্ন করেন উপেন—কি, কিছু বুঝতে হবে নাকি? হিস্ট্রি?

রমা বই-এর আড়ালে মুখ টিপে হাসে—না।

উপেন বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চারুবালা বলেন—ব্যাঙ্কের কাজ সেরে জিনিসপত্রগুলি একেবারে কিনে নিয়েই চলে এস।

কতগুলি পায়ের শব্দের সাড়া এগিয়ে আসে। প্রবেশ করেন পিসিমা আর অধীর।

উপেন বলেন—আসুন পিসিমা, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেবেন, এখনি একবার কাজে বের হতে হচ্ছে।

অম্বি বলে—এই রোদের মধ্যে এখন আবার কোথায় চললে আপ্পি?

উপেন—রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে পাহাড়ে জঙ্গলে কাজ করেছি ত্রিশটি বছর। রোদের ভয় আমাকে দেখাস না অম্বি!

কিন্তু উপেনকে সহজে রেহাই দেয় না অম্বি। দেখতে পায় অম্বি, আপ্পির কামিজের একটা বোতাম নেই। ছুঁচ সুতো আর বোতাম নিয়ে আসে অম্বি। জামাতে বোতাম বসিয়ে ছুঁচ চালাতে থাকে তার পরও থামে না। উপেনকে চেয়ারে বসিয়ে, জুতোর ফিতে আবার ঠিক করে বেঁধে দেয়। ব্রাশ নিয়ে আসে, উপেনের মাথার চুল অম্বি নিজের হাতেই ব্রাশ ক'রে দেয় ভাল ক'রে।

উপেন স্নেহার্দ্র স্বরে বলেন—অম্বির অত্যাচার এইভাবেই সহ্য করছি পিসিমা। এই মেয়েটা আমাকে একটা খোকা ক'রে রেখেছে।

পিসিমা শুকনো স্বরে বলেন—তুমি বেরুচ্ছ উপেন কিন্তু আমার যে একটা দরকারী সংসারী কথা ছিল…।

হ্যাঁ বলুন। ইঙ্গিতে পিসিমাকে অন্য ঘরে আসতে আহ্বান জানিয়ে

এগিয়ে যেতে থাকেন উপেন আর চারুবালা। চারুবালা বলে যান—অধীরকে চা দিতে ভুলিস না রমা।

কিন্তু ভুল হয় রমার। হঠাৎ রমাও পাশের বাড়ির এক জানালার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে—দরকারী কথা?

সত্যিই পাশের বাড়ির জানালায় এক মহিলার মূর্তি হাত তুলে ইঙ্গিতে রমাকে ডাকছিলেন। অম্বির দিকে তাকিয়ে রমা বলে—হাসিবৌদি ডাকছেন, কি যেন বলতে চাইছেন।

চলে যায় রমা। ভিতরের বারান্দায় আবার এক নিভৃত অধীর ও অম্বির সান্নিধ্যকে যেন নিবিড় ক'রে দেবার জন্য আপনি রচিত হয়।

অম্বি চোখ তুলে তাকাতে পারে না তারই মুখের দিকে, যাকে দেখবার জন্য ওর সারাক্ষণের আগ্রহ উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

অধীর বলে—রমা ঠিকই বলেছিল অম্বি। তোমার হাতে জাদু আছে।

অম্বি লজ্জিত হয়—ওরকম ক'রে বলবেন না।

অধীর—স্বচক্ষেই তো দেখলাম, তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে উপেনবাবু কেমন শিশুর মত হয়ে গেলেন।

ওদিকের পাশের বাড়ির জানালায় হাসিবৌদি আর রমার মধ্যে আলোচনা চলে। হাসিবৌদির কথাগুলির আড়ালে কেমন একটা ঠাট্টা যেন লুকিয়ে। প্রশ্ন করেন হাসিবৌদি—কে উনি?

রমা বলে—আত্মীয়।

হাসিবৌদি—কেমন আত্মীয়?

রমা—বাবার মাসতুতো ভাই-এর পিসিমার নাতি, শ্যামবাজারে থাকেন।

হাসিবৌদি নাক কুঁচকে হাসেন—অ্যা, তাই বলো, অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

রমা—হ্যাঁ।

হাসিবৌদি—তাহলে নিকট সম্পর্ক হয়ে যেতে কোন অসুবিধা নেই?

রমা—আজ্ঞে? কি বললেন?

হাসিবৌদি হাসতে হাসতে জানালা থেকে সরে যান—আচ্ছা আসি।

রমার হঠাৎ মনে পড়ে চায়ের কথা। নিজের মনেই আক্ষেপ করে—দূর ছাই, ভুলেই গিয়েছি। চা, চা তৈরি কর ঠাকুর। বলতে বলতে অন্যদিকে চলে যায় রমা।

অন্য ঘরে পিসিমা সেই দরকারী সংসারী কথাটা ব্যক্ত করেন—অম্বির জন্য

পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। ভালপাত্র, বেশ ভাল পাত্র! তোমরা আর মনে কোন বাধা না রেখে রাজী হয়ে যাও উপেন।

পাত্রের পরিচয়ও জানিয়েছেন পিসিমা—পাত্রের একটু বয়স হয়েছে, এই যা। আর জাতের দিক দিয়ে একটু নীচু, এই মাত্র। কিন্তু টাকা পয়সা বেশ আছে। আর সংসারে একেবারে একা মানুষ, আপন বলতে কেউ নেই। সামান্য রকমের যৌতুক দিলেই—।

চারুবালার মুখটা হঠাৎ বিষন্ন হয়, চোখও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন—পাত্রের বয়স কি খুবই বেশি?

পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—হাঁা গো, বেশি বৈকি, এই আমাদের অধীরের বয়সেরই মত, একটু বেশি বয়স।

চারুবালা হাঁপ ছাড়েন—তাহলে আর কি এমন বয়স? বেশ কাঁচা বয়স, অম্বির সঙ্গে মানাবে ভাল।

পিসিমা বলেন—সহজে কি রাজী হয়? শুধু আমার উপদেশে রাজী হয়েছে, আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে কিনা।

উপেন বলেন—আপনি যখন বলেছেন ভাল, তখন আমাদের মনে আর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না পিসিমা।

পিসিমা আবার সেই সামাজিক ভয়ের কথা তুলে সূক্ষ্ম কৌশলে যেন আর একবার উপেনকে একটু ভয় পাইয়ে দেন। পিসিমা বলেন—অম্বিকে বিদায় না করার আগে আমিই বা কোন্ প্রাণে রমাকে বিয়ে করবার জন্য অধীরকে বলতে পারি। তোমরা জাতের নিয়ম না মেনে যে বংশের সম্মান একটু গোলমাল ক'রে রেখেছো।

চুপ ক'রে শুনতে থাকেন উপেন ও চারুবালা।

পিসিমা বলেন—তবু তুমি কি যেন ভাবছো উপেন।

উপেন—মেয়েটার কথাই ভাবছি পিসিমা। নিজের মেয়ে নয়, কিন্তু তবু ঐ মেয়েটাই চলে গেলে আমার কি দশা হবে বুঝতেই পারছেন, স্বচক্ষেই তো দেখলেন। আমি কিসে পয়সা খরচ করলাম, আমি মনে করতে পারি না। মনে করিয়ে দেয় অম্বি। আমার হাতের লাঠিটা হাতের কাছে অম্বি এগিয়ে না দিলে, লাঠি নিতেই ভুলে যাই।

চারুবালা বলেন—কথাটা সত্যিই, অম্বি চলে গেলে সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়তে হবে ওকেই।

পিসিমা মনের বিরক্তি চেপে রেখে বলেন—তাতো হবেই। কাজের ঝি

চাকর চলে গেলে কষ্টে পড়তে হয়। ওরকম কষ্ট সবাইকে সহ্য করতে হয়। আমার কাছেও তো ছিল সাবিত্রী, এগারটি বছর। হঠাৎ চলে গেল, আমাকেও কষ্টে পড়তে হয়েছিল বৈকি।

চমকে ওঠেন উপেন আর চারুবালা। কাজের ঝি-চাকর চলে গেলে যতটুকু কষ্ট হয়, মাত্র ততটুকু কষ্ট হবে অম্বি চলে গেলে? তাই কি? এই ভয়ংকর মিথ্যাটাই কি সত্য? উপেনের শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশি ছটফট করতে থাকে। চারুবালা কেঁপে কেঁপে নিঃশ্বাস ছাড়েন।

উপেন কুণ্ঠিতভাবে বলেন—না, কথাটা ঠিক তা নয়। যাক গিয়ে—পাত্র যদি ভাল হয়।

পিসিমা—যদি বলছো কেন, সব দিক দিয়ে ভাল পাত্র।

চারু—বেশ তো, কথা রইল, আমরাও একবার পাত্রকে দেখি···তারপর।

পিসিমা—নিশ্চয়, দেখবে বৈকি।

ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধীর তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে অম্বিকে কি-যেন বলবার জন্য চেষ্টা করছিল; আর অম্বির চোখ দুটোও যেন ভয় পেয়ে অধীরের মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

অধীর বলে—তোমার সঙ্গে আমারও যে একটা দরকারী সংসারী কথা আছে অম্বি।

অম্বি বলে—বলুন।

ডাক শোনা যায়—অধীর কোথায় রে!

পিসিমা ডাকছেন। এই দিকেই আসছেন পিসিমা, উপেন আর চারুবালা। আর কথা বলা হলো না। চলে গেল অধীর।

অন্য ঘরের নিভৃতে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অম্বি সেই ঘরের মূর্তিটাকে, যে-মানুষ আজ না বলা কথার বেদনা দিয়ে চলে গেল।

রমার জন্মদিনের উৎসবটাই একটা ঘটনা সৃষ্টি ক'রে অধীর ও অম্বির মনকে আরও নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে মধুর পরিণামের চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিল।

সে ঘটনায় বেদনার অশ্রু ছিল, কিন্তু সেই অশ্রুর মধ্যেও ক্ষণিকের এক হর্ষময় মধুরতা হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

রমার জন্মদিন। প্রতি বছর রমার জন্মদিন হয়ে আসছে। আর শুধু মাম্মি আর আম্মির কাছে গল্প শুনেছে অম্বি, ছোট্ট অম্বি একদিন রমাকে

হিংসে ক'রে আর জোর ক'রে জন্মদিন করিয়ে নিয়েছিল। সেই কাহিনীটুকুই জানে অম্বি, সেই ঘটনার ছবি একটুও মনে পড়ে না। অম্বি জানে, তার জন্মদিনটাই হারিয়ে গিয়েছে এই পৃথিবীর বাতাসে চিরকালের মত।

রমার জন্মদিন। পরিপাটি সাজে সেজেছে রমা। অম্বির ঘরের ভিতর হঠাৎ এসে ধমক দেয় রমা—কি, আজও তুই পেত্নী সেজেই থাকবি না কি? তা হবে না।

অম্বিকে প্রায় জোর করেই সাজাতে থাকে রমা। সাজ শেষ হলে হাত ধরে বাইরের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, সেখানে অভ্যাগতদের জন্ম আসর সাজানো হয়েছে।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, এবং তারপরেই স্নেহাক্ত ও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা ও উপেন। রমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমের দিকে চলে যাচ্ছে অম্বি। উপেন আর চারুবালা চাপাস্বরে, যেন একটা বেদনা চাপা দিয়ে আলাপ করেন—অম্বিটার মুখটা কি সুন্দর দেখলে তো। কপালে শুধু একটা চন্দনের টিপেই সারা মুখটা মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের দোষ···।

উপেন—আমাদের ভাগ্যের দোষ বল।

চারুবালা—তা তো বটেই।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবচেয়ে আগে এলেন পিসিমা, সঙ্গে অধীর। এসেই রমার গলায় পরিয়ে দিলেন একটি হার—জন্মদিনের উপহার।

উপেন আর চারুবালা একসঙ্গে বলেন—এ আবার কি কাণ্ড করলেন পিসিমা। আপনার আশীর্বাদই যথেষ্ট।

পিসিমা—এতদিন তোমরা দূরদেশে ছিলে, চোখেও দেখতে পাই নি মেয়েটাকে, আর মনের সাধও পূর্ণ করতে পারি নি। আজ সুযোগ পেয়েছি, ছাড়বো কেন?

ড্রইংরুমে সোফার উপর একা বসে ছিল অম্বি। হাতে একটি ছবির এল্‌বাম। রমার জীবনের উনিশটি জন্মদিনের তোলা ফটো। শেষ দিক থেকে এলবামের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থামে অম্বি। ফটোতে চারুবালা ও উপেন পাশাপাশি বসে আছেন, তার মাঝখানে তিন বছর বয়সের রমা। কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার পাতা উলটে একেবারে প্রথম পাতায় এসে থামে অম্বি। চারুবালার বুকের উপর রয়েছে এক বছর বয়সের রমা। এক শিশুর প্রাণ তার মায়ের স্নেহের তপ্ত নীড়ের মধ্যে শুয়ে আছে। সে-ছবি দেখতে দেখতে ছলছল করে অম্বির

চোখ। পিছন থেকে এগিয়ে এসে অম্বির কাছে দাঁড়ায় অধীর। কে জানে কখন এসে এবং কতক্ষণ ধরে চুপটি ক'রে অম্বির সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল অধীর।

অম্বি চমকে ওঠে—আপনি কখন এলেন?

অধীর—অনেকক্ষণ। কি দেখছিলে তুমি?

—রমার জন্মদিনের ছবি।

—কোন ছবিটা সবচেয়ে ভাল?

—সবগুলিই ভাল।

—না, আমি বলবো?

—বলুন।

অধীর দেখায় দুটি ছবি···এটা আর এটা, কেমন? সত্যি নয়?

—হ্যাঁ, সত্যি। এলবামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হলো ঐ দুটি ছবি, একটি আম্মির কোলে এক বছর বয়সের রমা, আর একটি আপ্পি ও আম্মির মাঝখানে তিন বছর বয়সের রমা।

অম্বি তখনো ধারণা করতে পারে নি, কদিনের পরিচিত এই সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ভিন-জগতের একটি মানুষ অম্বির মনের গভীর গোপন করা জীবনের সবচেয়ে বড় অভাবের বেদনাময় রূপটি ধরে ফেলতে পেরেছে। কিন্তু বুঝতে হলো আর কিছুক্ষণ পরে।

রমা এসে অধীর আর অম্বিকে ডেকে নিয়ে গেল। আক্ষেপ করে রমা—যা সবচেয়ে খারাপ লাগে আমার, তাই এখন করতে হবে।

অধীর—কি?

রমা—গান।

আসরে গিয়ে চারুবালা ও উপেনের কাছে দাঁড়ায় দুজনে, অম্বি ও রমা পাশাপাশি দুটি শান্ত স্নিগ্ধ ও সুন্দর মেয়ে। সেই ভুলই করলো অভ্যাগতেরা, এবং সেই ভুল করলেন চারুবালা ও উপেন, অম্বিও।

আগন্তুক মহিলা ও ভদ্রলোকেরা, সবাই নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয় অথবা পরিবারের বন্ধুস্থানীয়, প্রত্যেকেই অম্বিকে দেখিয়েই প্রথমে প্রশ্ন করেন, এইটি বুঝি আপনার আপন মেয়ে আর ঐটি পালিতা। বেঁচে থাক, সুখে থাক।

চারুবালা বলেন—না, এটি আমার মেয়ে রমা, ঐটি হলো এখন আমার মেয়েরই মত।

অম্বির স্নিগ্ধ মুখে বেদনার ছায়া পড়ে। চারুবালাও তারপর যেন আক্রোশে সঙ্গে প্রত্যেকেরই ঐ অদ্ভুত ভুল ধারণার উপর রাগ করে আরও জোরে বলতে থাকেন—এটি হলো আমার মেয়ে। ওটি হলো মেয়ের মত।

মেয়ের মত! মেয়ের মত! শুনতে শুনতে আর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অম্বি। চারুবালারও অভিমান ও অহংকারের কোথায় যেন ঘা পড়েছে। অম্বির সুন্দর সাজ আর মুখের ছলনায় তাঁর নিজের মেয়েরই পরিচয় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অম্বির দিকে অপ্রসন্নভাবে তাকান চারুবালা, যেন অম্বি এখানে না থাকলেই ভাল ছিল।

চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল অম্বি। আসরের এক প্রান্তে সোফার উপর বসে অধীর দেখতে পায় সেই দৃশ্য। চমকে ওঠে অধীরের চোখের কৌতূহল।

রমার কলেজ বান্ধবীরা একটা গান রচনা ক'রে উপহার দিয়েছে রমাকে। রমাকে এখনি গাইতে হবে সেই গান। পীড়াপীড়ি করেন গুরুজনেরা। বান্ধবীরাও সমর্থন করে। শেষে গাইতে হয়। সুন্দর গলায় সুন্দর সুরে গান গায় রমা। বান্ধবীরাও সুরে সুর মিলিয়ে গানের মধুরতা আরও মধুর ক'রে তোলে।

কিন্তু এই গানের জগৎ থেকে নীরবে সরে পড়েছে অধীর। এখানে একজনের জন্মদিনের মাঙ্গল্য কলরব ও আনন্দ সুরময় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আর একজন কোথায় গেল, যার জন্মদিনের পরিচয় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে?

চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে একটি ছায়া ঘুরে বেড়ায় দেখতে পায় অধীর। অম্বির কাছে এসে দাঁড়াতেই নীরব ও আনমনা অম্বি চমকে ওঠে—কে?

—আমি।

—আপনি কেন উঠে এলেন?

—তুমি কেন উঠে এলে?

—আপনি বুঝবেন না।

—আমি বুঝেছি।

—পৃথিবীতে কারও বোঝাবার সাধ্যি নেই।

—আমার সাধ্যি আছে।

—বলুন তো, কেন?

অধীর সমবেদনার সুরে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—ওটা তো একটা কথার কথা মাত্র, তার জন্য এত দুঃখ পাও কেন?

চোখ বড় ক'রে বিস্মিত হয়ে অম্বি প্রশ্ন করে—কি কথা ?

অধীর—আম্মি আর আপ্পির মুখের ঐ কথা, মেয়ের মত।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি। জীবনে এই প্রথম একজনের চক্ষু ধরে ফেলেছে তার জীবনের সবচেয়ে গোপন রহস্যকে।

অধীর বলে—তুমি তো উপেনবাবুর মেয়ে, কার সাধ্যি আছে পৃথিবীতে অস্বীকার করবে এই সত্য ?

—আপনি স্বীকার করেন ?

—নিশ্চয়ই।

অম্বি—বলুন আর একবার বলুন, আমারই তাহ'লে ভুলে হয়েছে। বলুন, ওটা একটা কথার কথা মাত্র।

অধীর—বলেছি, তোমার অভিমানের ভুল। ওটা তোমার আপ্পি আর আম্মির কথার ভুল। পৃথিবীর চোখের কাছে তুমি যে উপেনবাবুরই মেয়ে।

আসর থেকে জন্মদিনের মহিমার সঙ্গীত রেশ ছড়ায়, এই রেশ ভেসে আসে।

অধীর প্রশ্ন করে—তোমার জন্মদিন কবে অম্বি ?

অম্বি—হারিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারে।

অধীর- বুঝলাম না।

অম্বি—এত বুঝতে পারছেন, এটা বুঝতে পারছেন না কেন ? আমার জন্মদিনের খবর কেউ জানে না।

অধীর—আমি যদি বলি, কেউ একজন জানে।

—কে ?

—ঐ আকাশ। এই রকমই সেদিন আকাশে তারা ছড়িয়ে ছিল।

অম্বি হাসে—সত্যি কথা ?

অধীর—বিশ্বাস করবে কি, যদি বলি, আজ তোমার জন্মদিনকেই ভালবেসে উপহার দিতে ইচ্ছে করছে আমার।

অম্বি—বিশ্বাস করবো।

অম্বির একটা হাত ধরতে চেষ্টা করতেই হঠাৎ আতঙ্কিতের মত পিছিয়ে সরে যায় অম্বি।

অধীর বলে—বল, নেবে আমার উপহার ?

চমকে ওঠে অম্বি।

অধীর—বল অম্বি ?

অম্বি মুখ তোলে—পেয়ে গেছি উপহার।

—পেয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কি ?

—জন্মদিনই যার অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, তাকে আপনি মানুষ বলে ভেবেছেন। তার দুঃখটাকে চিনেছেন। এর চেয়ে বেশি আর কোন উপহার আশা করি···কিন্তু বড় ভয় করে···সহ্য করতে পারবো না···আপনি ভুল করবেন না অধীরবাবু।

বলতে বলতে হঠাৎ ছটফট ক'রে ওঠে অম্বি, যেন তার মনের খুশীর ভিতর থেকে একটা ভুলের ভয় হঠাৎ তপ্ত হয়ে কণ্ঠস্বরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। যার ছায়ার কাছে যাবার অধিকার নেই, তারই ছোঁয়া মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করেছে অম্বি। ভুল হয়েছে, উঁচু জাতের মানুষের মনের একটা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অপরাধ ক'রে ফেলেছে অম্বি।

কারণ, অম্বি বিশ্বাস করে, সে ছোট রক্তেরই মানুষ। মিথ্যা বলবেন কেন আম্মি ? কিন্তু জেনে শুনেও চোরের মত এ কি কাণ্ড সে করে বসলো ? যেন একটা ভয়ংকর অপরাধের ভয় থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ছুটে চলে যায় অম্বি।

সত্যিই অধীর ধারণা করতে পারে না, কি ভুল হলো। নিজের মনকে ঠকাতে চায় না অধীর। স্পষ্টই বুঝতে পারে, উপেনবাবুর বাড়িতে, উপেন ও চারুবালার স্নেহে পালিতা ঐ অম্বিকেই, টবের চন্দ্রমল্লিকারই মত যার জীবন, সেই অম্বির সুন্দর মুখটাকেই ভালবেসে ফেলেছে তার মন। গুণ নেই অম্বির, মনে করতেও হাসি পায় অধীরের। পূর্ণ চাঁদের মায়ার মত মায়া নিয়ে, মমতার লতার মত দুটি সেবার হাত নিয়ে একটি বাড়ির প্রাণের সব প্রয়োজনকে স্নিগ্ধ ক'রে রাখছে যে, তাকে একটা বিস্ময়ের মূর্তির মতই যে মনে হয়।

ঠাট্টা ক'রে একদিন যে কথাটা অম্বিকে বলেছিল অধীর, প্রতিক্ষণেই বুঝতে পারে অধীর, মোটেই ঠাট্টা নয় সেই কথাটা।—ইচ্ছে করে আমার, কটা দিন জ্বর হয়ে পড়ে থাকি।

হেসেছিল অম্বি—এ আবার কেমন অদ্ভুত ইচ্ছে।

অধীর—তাহলে তুমি একটা ভুল করে ফেলবে, আর সেই ভুলেই তোমার ভুল ভেঙে যাবে।

অধীরের কথার তাৎপর্য সূক্ষ্ম হলেও বুঝতে পেরেছিল অম্বি। যে মেয়ের

দুহাতে সেবা আর মমতা ব্যাকুল হয়ে আছে, সেই মেয়ে কি হঠাৎ আগ্রহে ছুঁয়ে ফেলবে না অধীরের জ্বরে বিব্রত কপালের তপ্ততা।

আজ একটু আশ্চর্য হয়, সত্যিই বুঝতে পারে না অধীর, কেন সেদিন অমন ক'রে আতঙ্কিতের মত হাত সরিয়ে নিল অম্বি। অধীরের স্পর্শকে সত্যিই কি ভয় করছে অম্বি ?

লাইব্রেরির কক্ষে বসে অকারণে বিচলিত হয় অধীর। নিজের মনেই বিড়বিড় করে। লিখতে গিয়ে হাতটা যেন অকারণে ছটফট করছে।

ভুল, কিসের ভুল ? নিজের মনে বলতে বলতে উঠে পড়ে অধীর।

অম্বিকেই সোজা ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন ক'রে তাহ'লে জেনে নেওয়া উচিত, কিসের ভুল ? অমন হেঁয়ালী ক'রে সরে গেলে চলবে না।

অম্বি জানে, হ্যাঁ ভয় করছে অম্বিরই মন। জেনে শুনে অন্যায় করতে পারবে না অম্বি। ভালবাসার ঐ দুটো চক্ষু শুধু তাকিয়েই তৃপ্ত হোক, ঐ মানুষকে স্পর্শ করার অধিকার নেই অম্বির। অম্বি নিজেকে অন্ত্যজা অস্পৃশ্যা বলেই বিশ্বাস করে।

কিন্তু নিয়তিই যেন করুণা-পরবশ হয়ে অম্বির এই ভুল ভাঙাবার জন্য পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সমাজ সংসারের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কোনদিন জাগে নি অম্বির মনে, সেই অম্বিই বুঝতে পারে যে, সমাজ আর সংসারও ভুল করে। বিধাতার কাছে ঘৃণ্যা অস্পৃশ্যা ও অন্ত্যজা নয় অম্বি। ধীরে ধীরে এই বিশ্বাসের জাগরণ অম্বির জীবনের বিষণ্ণতাকে আবার সুস্মিত ক'রে তুলতে থাকে। মনে হয়, এবং বিশ্বাসও করে অম্বি, অধীর নামে এই ভালবাসার মূর্তিকে স্পর্শ করার অধিকার তারও আছে। কিন্তু স্পর্শ না করাই ভাল।

গঙ্গার ঘাটে, বেড়াতে গিয়ে অদৃশ্য এক ভক্তকণ্ঠের উৎসারিত গানের ভাষা অম্বির নিঃশ্বাসগুলিকেই যেন একদিন নতুন ভাবনায় চঞ্চল ক'রে তোলে। গাইছেন ভক্ত—জাত-পাতের বড়াই কর কেন সংসারের মানুষ ? প্রেমেই আপন হয় মানুষ। সেই পরম আপনের কাছে কেউ ছোট নয়, আর কেউ বড় নয়। গান শুনে অম্বির মন যেন এক আশার দীক্ষা লাভ করে।

এই গানের ভাষা আর সুর শুনে চমকে ওঠেন উপেন।

বিমর্ষ হয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন। অম্বি প্রশ্ন করে—কি ভাবছো আপ্পি ?

উপেন—এখানে আর আমি বেড়াতে আসবো না।

অম্বি—কেন আপ্পি ?

উপেন—ঐ সব আজে-বাজে গানের জন্য।

অম্বি—গানের জন্য ?

উপেন—হ্যাঁ, ওটা একটা গালাগালি।

চণ্ডালিকার অভিনয় দেখতে গিয়েছিল অম্বি। অম্বির দুই চক্ষুর বিস্ময় যেন এক আলোকের জগতে পথ খুঁজে বেড়াতে থাকে, অস্পৃশ্যার হাতের উপহার ঐ স্নিগ্ধ বারি পান করলেন ভিক্ষু। ঐ চণ্ডালিকা মেয়ের বেদনার রূপটিকে যেন দেখতে পেয়েছে অম্বি, তার নিজের অন্তরের গভীরে। অভিনয় দেখতে দেখতে চমকে ওঠে অম্বির মনের কল্পনা। তৃষ্ণার্ত এক জীবন-পথিককে বারিদান করছে অম্বি এবং সেই পথিকের মুখটি যে অধীরেরই মুখের মত।

যে ভুলের ভয় কঠিন ক'রে রেখেছিল অম্বির মনের আবরণ, যার জন্য সেদিন অম্বিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি অধীর, সেই ভুলের মিথ্যাকে বুঝতে পারে অম্বি; সে মিথ্যাকে তুচ্ছ করবার সাহসও যেন মনের ভেতর হঠাৎ জেগে উঠে আসতে থাকে।

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একা-একা ওপারের সন্ধ্যা-কাশের রং দেখছিল অম্বি। নিজেই জানে না, কেন সে আজকাল একা-একা এইভাবে কিসের জন্য এখানে আসে ? গঙ্গার ঢেউ-এর শব্দের মধ্যে কি কোন সান্ত্বনা আছে ?

বিকাল হয়ে এসেছে। হঠাৎ চারুবালার কাছে গিয়ে অম্বি বলে—আমি একবার গঙ্গার ঘাটে বেড়িয়ে আসি আম্মি।

চারু—একা যাবি ?

অম্বি—হ্যাঁ।

চারু—তা'হলে যা।

অম্বি চলে যেতেই উপেন রাগ ক'রে চারুবালাকে বলেন—খুবই খারাপ লক্ষণ চারু।

চারু আতঙ্কিত হন।—তার মানে ?

উপেন—অম্বির মনে বড় বেশি সাহস জেগেছে। এসব ভাল নয়।

চারু আশ্চর্য হয়ে বলেন—তুমি কি মেয়েটাকে কোন সন্দেহ করছো ?

চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন—হ্যাঁ, ও আজকাল আমাদের অপমান দেখতে ভালবাসে। যে গান শুনে আমার মনের সব গর্ব স্তব্ধ হয়ে গেল, সেই গান শুনতে গেল অম্বি। শত হোক, পরের মেয়ে।

চারু—কিছুই বুঝতে পারছি না।

উপেন—একটা সন্ন্যাসী গঙ্গার ঘাটে গান গাইছিল, জাতের বড়াই কর কেন মানুষ, ভগবানের কাছে কেউ ছোট আর কেউ বড় নয়। শুনে তোমার ঐ অম্বির চোখে মুখে কি আনন্দ! যেন আমাকে ঠাট্টা করার জন্যই—

চারু—একথা সত্যি। পরের মেয়ে কখনো আপন মেয়ের মত হতে পারে না। কিন্তু তার জন্য দুঃখ করেও কোন লাভ নেই। বড় হয়েছে বয়স হয়েছে, এখন নিজের স্বার্থ বুঝে নিয়ে যদি পর হয়ে যায়, ভালই। ওকেও দোষ দেই না।

সেদিন আর একটি রহস্য কল্পনাও করতে পারে নি অম্বি। কখন অম্বিকে পথে দেখতে পেয়ে আর অনুসরণ ক'রে অধীরও নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চমকে ওঠে অম্বি—আপনি কেমন ক'রে এখানে এলেন?

অধীর হাসে—মনে মনে টের পেয়ে।

অম্বি হাসে—কখ্খনো না!

অধীর—তাহ'লে রমার কাছ থেকে খবর পেয়ে এসেছি!

অম্বি—তাই বলুন।

কত গল্প করে অধীর। মুগ্ধ হয়ে শুনেতে থাকে অম্বি, গান্ধী নামে এক মহাপুরুষের সারা-জীবনের এক সত্য আগ্রহের কথা বলছে অধীর। এক অন্ত্যজা অস্পৃশ্যাকে ঘরের লক্ষ্মীরূপে নাম দিয়েই আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন যে মহামানব, তার নাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই ঘাট।

গান্ধীঘাটের কাছে বোধিবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আর অধীরের কাছে গল্প শুনে ধন্য হয়ে যায় অম্বির প্রানের সব কৌতূহল। বৃদ্ধ, যে মহাপুরুষের নামের পুণ্য ধারণ ক'রে রেখেছে এই বটের ছায়া, সেই মহাপুরুষ ছোটবড় ভেদ অস্বীকার ক'রে গিয়েছেন। কত অস্পৃশ্যা ও অন্ত্যজাকে তিনি মহীয়সীর সম্মান দিয়ে গিয়েছেন। শুনতে শুনতে এই বোধিবটের ছায়ার স্নিগ্ধতাকেও পুণ্যময় বলে মনে হয় অম্বির। ভুল ভেঙে যায়, পূর্ণ হয় বিশ্বাসের দীক্ষা। না, তারও অধিকার আছে, শুধু এই পৃথিবীর তরুলতা ও ফুলকে ভালবাসার নয়, ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, কিন্তু নিজের অন্তরের আনন্দের মধ্যেই বুঝতে

পারে, অধীরকেও ভালবাসার অধিকার তার আছে। আর অধিকার যখন আছে, তখন সেই ভালবাসার মানুষের হাতে হাত রেখে আর কানে কানে একটা বিস্ময়ের উপহার দিতে পারবে না কেন অম্বি? এমন কুণ্ঠার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু এখানে এত মানুষের চোখের সামনে কেমন ক'রে তার হাতে হাত রাখা যায়? একটি নিভৃত কি পাওয়া যায় না?

—এত আনমনা হয়ে কি ভাবছো অম্বি? অধীরের প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে অম্বি। ব্যস্তভাবে বলে—চলুন এবার বাড়ি ফিরে যাই।

অধীর—এতক্ষণ আমিও আনমনা হয়ে একটা কথা ভাবছিলুম।

অম্বি—কি কথা?

অধীর—তোমাকে এত ভাল লাগলো কেন?

অম্বি—চলুন, অনেক দেরি হয়ে গেল।

অধীর হাসে—এর কোন কারণই যে বুঝে উঠতে পারছি না।

অম্বি—আজ এখানে কিসের জন্য এত বেশি ভিড়, কিছু বুঝতে পারছি না।

—যদি জানতাম যে, আমাকেও তোমার এই রকমই ভাল লাগে, তবে—।

সামনের পিছনের ও আশে পাশের এত জীবন্ত চক্ষুওয়ালা ভিড়টাকেই যেন হঠাৎ তুচ্ছ ক'রে অম্বির হাত ধরে ফেলে অধীর।

—ছিঃ, এ কি করেছেন? যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছে অম্বি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরও ব্যস্তভাবে বলে—চলুন, আম্মি হয়তো এতক্ষণে খুব ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

কি অদ্ভুত আর কি রকম নিষ্ঠুর যেন অম্বির এই কুণ্ঠা। গঙ্গার ঘাটে লোকের মেলার মধ্যে অম্বির সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে অম্বিকে যে সব কথা বলে অধীর তার কিছুই কি বিশ্বাস করতে পারে নি অম্বি? তবে কেন অমন ক'রে হাত সরিয়ে নিল? অনেক কিছুই কল্পনা করে অধীর, কিন্তু কোনটিকেই অম্বির ঐ অদ্ভুত ভীরুতার কারণ বলে মনে হয় না।

তবে ওটা কি অম্বির মনের একটা লজ্জার বাধা? কিন্তু এ মেয়ের মনকে তো এমন কিছু লাজুক বলে মনে হয় না। চোখ দুটোও ভীরু নয়। অধীরের মুখের বেপরোয়া কথাগুলি শোনবার সময় বেশ তো অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই দুটি চোখ। ভালবাসার কথা শুনতে যার কোন সঙ্কোচ নেই, সে কেন হাত সরিয়ে নেয়? কেন বারবার সেই একই কথা বলে, আপনি না বুঝে বড় ভুল করছেন অধীরবাবু!

গঙ্গার ঘাটে অম্বির পাশে দাঁড়িয়ে অমন সুন্দর সূর্যাস্ত দেখবার আনন্দের মধ্যেও যেন একটা ফাঁকি ছিল ; কাঁটার মত মনের ভিতর বিঁধছে সেই ফাঁকি। অম্বির চোখের চাহনি আর মুখের চেহারাটি তো বেশ স্বচ্ছ আর সরল ; কিন্তু অম্বি নিজে যেন ঠিক তার বিপরীত। একটা রহস্য, একটা খামকা ভয়ের খেয়াল। ভালবাসার কথা শুনতে ভালবাসে কিন্তু ভালবাসার কথা বলতে পারে না। কাছে এগিয়ে আসে, পাশে দাঁড়ায়, কিন্তু হাত ধরতে গেলেই যেন চমকে ওঠে আর সরে যায়।

ভাবতে গিয়ে নিজেরই উপর রাগ ক'রে যেন নিঝুম হয়ে যায় অধীরের মন। অম্বি নামে ঐ মেয়েকে ভালবাসার অধিকার তার আছে ; কিন্তু ভালবাসলেই কি ভালবাসা পাওয়ার অধিকার এসে যায় ? সন্দেহ হয়, অধীরের জীবনে হঠাৎ বোধহয় বড় কঠিন একটা ভুল হয়ে গেল। কোন নারীকে না ভালবেসেও জীবন বেশ সহজে, আনন্দে ও হেসে হেসে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। অধীরের এই ধারণার অহংকার শাস্তি পাবে আর জব্দ হবে বলেই বোধহয় অম্বির সঙ্গে অধীরের দেখা হয়েছিল। ভুলতে পারা যায় না এবং চেষ্টা ক'রেও বোধহয় ভুলতে পারা যাবে না, অম্বি নামে ঐ মেয়ের চোখমুখ চলা-বলা আর হাসি হর্ষ ও গম্ভীরতা দিয়ে তৈরী করা অদ্ভুত এক মধুরতার ছবিকে। সন্ধ্যাকাশের আভা যখন ওর মুখের উপর লুটিয়ে পড়ে তখন মনে হয় ঐ মেয়ে যেন রঙীন আকাশেরই একটুকরো শোভা। মৃদু বাতাসের ছোঁয়া লেগে ওর কপালের কাছে কালো চুলের গুচ্ছ যখন আধভাঙা হয়ে ফুরফুর করে, তখন মনে হয় এই মেয়ে যেন একটি মালতী লতা। অধীরের মুখের কথাগুলি শুনতে শুনতে ওর চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন একটা ভরা নদীর প্রাণ শান্তভাবে জোয়ারের শব্দ শুনছে। নিজেকেই প্রশ্ন করে অধীর, তার লজিক-পড়া আর সায়েন্স-জানা মনের সব যুক্তি-বুদ্ধি কি তবে সত্যিই একটা মোহের মধ্যে পড়ে বোকা হয়ে গেল ?

কেন ভাল লাগে অম্বিকে ? এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না অধীর। এবং ভাবতে গিয়ে মনের ভিতরে যেন যত উদ্ধত তর্ক আর যুক্তিগুলি নিজের দুর্বলতার লজ্জায় ছোট হয়ে যায়। অম্বির চেয়ে কত বেশী সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আছে। রমাই তো অম্বির চেয়ে দেখতে বেশীর সুন্দর। অম্বির চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানা শত-শত মেয়ে এই শ্যামবাজারে আর ব্যারাকপুরেও আছে। এই জীবনে কত মেয়ের সঙ্গে অধীরের আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু কোনদিন তো কোন পরিচিতার সুন্দর মুখ স্মরণ করে অধীরের মনে

ভাবনার কোন উত্তাপ কোন লজ্জা আর কোন আগ্রহের চঞ্চলতা জেগে ওঠে নি। তবে অশ্বি কেমন ক'রে আর কিসের জোরে অধীরের প্রতিক্ষণের নিঃশ্বাসে এই দুর্বার পিপাসা ভরে দিল ?

উপেনবাবুর পালিতা মেয়ে অশ্বি। বোধহয় উপেনবাবুর কোন আত্মীয়-কুটুম্ব অথবা বন্ধুর মেয়ে। এর চেয়ে বেশি গভীরের কোন রহস্য কল্পনা করে নি অধীর। অনুমানে যেটুকু ধারাণা হয়েছে, তাই শুধু জেনে রেখেছে অধীর। অশ্বির জন্মের-পরিচয় জানবার জন্য কোনদিন বিশেষ কোন কৌতূহলও অনুভব করে নি। উপেনবাবু এবং চারুবালা এবং দিদিমাও অধীরের কছে অশ্বির জন্ম-পরিচয় জানাবার কোন দরকার অনুভব করে নি! অশ্বিকেও কোনদিন এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে নি অধীর। দরকার কি ? অশ্বি তো এখন সত্যিই উপেনবাবুর মেয়ে। অশ্বির বাপ-মায়ের পরিচয় জানাবার জন্য প্রশ্ন করারও কোন অর্থ হয় না। শুধু অশ্বির মনে ব্যথা দেওয়া হয়।

কিন্তু অশ্বিকে যেন আজও ঠিক চিনতে পারা গেল না। অশ্বি যেন তার জীবনের অনেক কিছু অধীরের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েও জীবনের কোন নিবিড় একটা রহস্যকে দুর্লভ রত্নের মত গোপন ক'রে রাখতে চায়। চৈত্র-সন্ধ্যার দমকা বাতাসের মত হঠাৎ এসে সৌরভ ছড়িয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু তার পরেই যখন দূরে পালিয়ে যায়, খুঁজতে গেলে আর পাওয়া যায় না।

রাগ হয় অশ্বির উপর, কিন্তু কি আশ্চর্য অশ্বিকে ভুলে যেতে ইচ্ছা করে না কেন ? অশ্বির হাতের সামান্য একটা স্পর্শের জন্য এই ব্যাকুলতা কেন ? এই ভালবাসা আর ভাললাগা মোহগুলি কি কোন নিয়মের ধার ধারে না ? অধীরকে অন্যমনার মত লাইব্রেরি ঘরের নিভৃতে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে অনেকবার ঠাট্টা করেছেন ডক্টর ব্যানার্জী—কি হ'ল ফ্রেণ্ড ? কাকে ভাবছো ?

অধীর হাসে—নিজেকে।

ডক্টর ব্যানার্জী—অর্থাৎ অন্য একজনকে ভাবতে কেন ছাই এত ভাল লাগছে, তাই না ?

অধীর—আমি নিজের মনের সমস্যাই ভাবছি ডক্টর ব্যানার্জী।

ডক্টর ব্যানার্জী—আমিও যে তাই বিশ্বাস করছি। তাহ'লে এতদিনে সমস্যায় পড়েছ! উইশ ইউ গ্র্যাণ্ড সাকসেস!

বলতে বলতে চলে যান ডক্টর ব্যানার্জী। কিন্তু অধীরের মন থেকে সেই প্রশ্নটা যে চলে যাবার নামও করে না। কেন ভাল লাগে অশ্বিকে ? মনে

হয় অধীরের, এরচেয়ে বেশি কঠিন প্রশ্ন বোধহয় এই সংসারেই নেই। এবং এই প্রশ্নের উত্তর নেই।

যদি ভুল হয়ে থাকে হোক্। এই ভুলের শেষ না দেখা পর্যন্ত বোধহয় ভুল ভাঙবে না। তবে আর দেরি ক'রেই বা লাভ কি? তাড়াতাড়ি একটা সেট্লমেন্ট ক'রে ফেলাই উচিত। অম্বির কাছে গিয়ে, অম্বিকে একটি নিভৃতে ডেকে নিয়ে এসে সোজা স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারা যায়, আমার ভালবাসাকে তুমি ভুল মনে করছো কেন? কেন হাত সরিয়ে নাও? কিসের আপত্তি?

তার হাতে হাত রাখবার জন্য কেন এই ব্যাকুলতা? ভাবতে গিয়ে নিজের মনকে শত ধমক দিয়েও কেন বোঝাতে পারে না অম্বি, এবং বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারে না, তার এতদিনের ভীতু জীবনটাকে এ কোন ভয়ানক লোভে পেয়ে বসলো? ইচ্ছা করে, এবং কল্পনা করতেও ভাল লাগে অম্বির, হঠাৎ একটা জ্বর এসে এই শরীরটাকে একেবারে অসহায় ক'রে বিছানার উপর শুইয়ে রাখুক, অন্তত পাঁচটা দিন। আসুক অধীর, অম্বির মুখের করুণ ও উদাস মুখের দিকে তাকিয়ে ছলছল করুক ওর ওই দুই চক্ষু; তারপর হঠাৎ অম্বির একটা হাত টেনে নিয়ে বসে থাকুক অধীর। যদি তাই হয়, যদি সেই সুযোগ পাওয়া যায়, এবং কেউ যদি দেখে না ফেলে, তবে অধীরের হাতের সেই ছোঁয়া মনে মনে বরণ ক'রে নিয়ে অম্বির বোধহয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে যেতেও ভাল লাগবে।

শুধু ঘরের নিভৃতে বসে জাগা-মনের ভাবনাগুলির সঙ্গে নয়, মাঝরাতের আর ভোরের ঘুমের স্বপ্নের সঙ্গেও যেন অম্বির মনটা লড়াই ক'রে হাঁপিয়ে ওঠে আর লজ্জা পায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, বিছানার উপর বসেই শাড়ির আঁচল দিয়ে ঠোঁট মোছে। শিউরে ওঠে শরীরটা; আঃ, স্বপ্নও এত স্পষ্ট হয়।

নিজেরই মনের নতুন দুঃসাহসগুলির রূপ দেখে আশ্চর্য হয় অম্বি। বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের আনাচে-কানাচে, কিংবা বোধহয় এই রক্তধারার মধ্যেই এই দুঃসাহস অনেক অভিমানে লুকিয়ে পড়ে ছিল। আম্মি বলেছেন—তার দেহের ছোঁয়াকেই ভয় করে উঁচু-জাতের পৃথিবীর যত প্রাণ। কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর ভয়! গাছের পাতা ও ফুলের ছোঁয়াকে কুড়িয়ে নিয়ে বুকে আর মাথায় তুলে নিতে পৃথিবীর কোন মহাপবিত্রের মনেও কোন আপত্তি নেই। অম্বির দেহটা কি ঐ পাতা আর ফুলের চেয়ে কম জীবন্ত? তবে কিসের এই ভয়? অধীরের মনেও কি সেই ভয় আছে?

অধীরের মনে ওরকম কোন ভয় আছে কি না বোঝা যায় না। বুদ্ধ আর গান্ধীর কথাগুলিকে কি অধীরও সত্যিই বিশ্বাস করে। কিংবা অধীরের কাছে ওসব কথা শুধু কতগুলি গল্পের কথা? ভুলেও তো একবার অধীর একথা নিজের মনের জোর নিয়ে বলতে পারলো না যে, ঠিকই বলেছিলেন বুদ্ধ আর গান্ধী—জন্ম আর জাতের জন্য মানুষ বড় হয় না, ছোটও হয় না। সত্যিই অম্বির মনের চিন্তাগুলি যেন মাঝে মাঝে একটা দুঃসহ অভিমান সহ্য করতে চেষ্টা করে। মানুষ না হয়ে বাগানের একটা চন্দ্রমল্লিকা হ'য়ে জন্ম নিলেই তো ভাল ছিল। তাহ'লে সারা পৃথিবীর চোখের সামনে অধীরের বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে অম্বির জীবনে কোন বাধা থাকতো না, কোন অন্যায়ও হতো না।

এ কি হ'লো মনের দশা? সকালবেলার খবরের কাগজের ছবি আর লেখাগুলির উপর চোখ আর মনের আগ্রহ ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রেও ধরে রাখতে পারে না অম্বি। মনটা যেন একজনের পায়ের শব্দ শোনবার জন্য ছটফট করছে। কখন আসবে অধীর? আসুক একবার। আজও কি একটি নিভৃতে দাঁড়িয়ে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার সুযোগ পাওয়া যাবে না?

অম্বির এই শান্ত দেহটাই যেন বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চায়। অধীরকে স্পর্শ করবার তার অধিকার নেই, এই মিথ্যা অভিশাপকে চূর্ণ ক'রে দিতে ইচ্ছা করে। আর আপত্তি করবে না, হাত সরিয়ে নেবে না অম্বি।

ভিতরের ঘরে তখন পিসিমা উল্লাসের সঙ্গে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করছিলেন যে, নাতি তাঁর বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে মুখ খুলেই এবার বলেছে।

পিসিমা বললেন—আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাহলে বল পাত্রী দেখি। নিজের মুখেই বললে, পাত্রী দেখাই আছে। বলতে বলতে আহ্লাদে গলার স্বর কেঁপে ওঠে পিসিমার।

পিসিমা—রমাকে খুবই মনে ধরেছে বুঝতে পারছি। এইবার তোমরা একটা দিনক্ষণ ঠিক কর।

উপেন—আর অম্বির জন্যে যে পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন?

পিসিমা—সে তো ঠিকই আছে। আজ বল আজ. কাল বল কাল। পাত্র দেখ, দিন ঠিক কর।

আলোচনা করতে করতে সকলে বাইরে আসেন। অম্বিকে লক্ষ্য ক'রে

চারুবালা বলেন—অধীর যদি আসে, তবে এক মুহূর্তেও যেন এখানে আর দেরি না করে।

একটি কার্ড অম্বির হাতে দিয়ে উপেন বলেন—অধীরের নেমতন্ন পত্র। রমাদের কলেজের স্পোর্টস দেখার নেমতন্ন। আমারা চললাম। অধীরকে বলবি, অবশ্যই যেন যায়।

চারুবালা বলেন—বলবি, না গেলে রমাও দুঃখ করবে।

দেখে চমকে ওঠে অম্বি। অধীর আসছে। কিন্তু না, অসম্ভব। উঁচু জাতের ঐ মানুষের মনের একটা ভুল ধারণার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো উচিত নয়। তার হাতে হাত রাখা দূরে থাকুক, তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করাও উচিত নয়। যদি কোন দাবি করে অধীর, তবে অম্বি আজ স্পষ্ট করেই বলে দেবে, তোমার দাবি সত্যি কিন্তু আমিই যে মিথ্যা। ক্ষমা কর, এত কাছে এস না, একটু দূরেই থাক।

বারান্দার এই দিকে, এই থামের পাশে যেখানে একা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে চেষ্টা করছে অম্বি, সেটা যে সত্যিই একটা নিবিড় নিরালা। যদি সোজা এসে এখানেই অম্বির কাছে দাঁড়ায় অধীর? ভয় পায় অম্বি। আজ অম্বি তার নিজেরই স্পর্শলোলুপ হাতটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কে জানে অধীরকেই হতভম্ব ক'রে দিয়ে কোন ভুল ক'রে ফেলবে অম্বি? চেয়ার থেকে উঠে ভিতরের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায় অম্বি।

যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে অধীর। আজ স্পষ্ট ক'রে অম্বির কাছে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা ক'রে দিয়ে যাবে। অম্বিই তার জীবনের স্বপ্ন। অম্বিই তার জীবনের প্রয়োজন। এর মধ্যে কোন ভুল নেই।

ঘরে কেউ নেই, এমনই একটি অবাধ নিভৃত তৈরি হয়ে আছে। এবং অধীরও এসেছে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা ক'রে দেবার জন্য, নইলে শান্তি পাচ্ছে না অধীর।

অধীর সোজা অম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়।—আমি একটুও ভুল করছি না অম্বি। ডাক তোমার আম্মিকে, ডাক তোমার আম্মিকে, সবার সামনেই জানিয়ে দিয়ে যাই, আমি একটুও ভুল করছি না।

—কেউ নেই বাড়িতে।

—তুমিও কি নেই?

—আমি তো আছিই। যাব কোথায়?

—আমার কাছে।

চমকে ওঠে, চুপ ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অম্বি।

—বল অম্বি, তোমার আপত্তি নেই। যদি একটুও আপত্তি থাকে, তবে এখনই বলে দাও।

—একটুও না অধীরবাবু। একথা আমাকে দিয়ে বলিয়ে কি সুখ পাচ্ছেন আপনি? আজও যদি না বুঝে থাকেন তবে কোন দিনই বুঝবেন না।

অধীরের মনের সব বিমর্ষতা মুছে যায়। প্রণাম করে অম্বি। বাধা দেয় অধীর, কিন্তু অম্বি শোনে না।—সেদিনের ভুল ক্ষমা কর, আজ তোমাকে ছোঁয়ার অধিকার পেয়েছি।

—কে দিল অধিকার?

—দিয়েছে আমার মন।

অধীর বলে—আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি অম্বি। তোমার খোঁপায় একটি চন্দ্রমল্লিকা, কপালে খয়েরের টিপ তারার মত আঁকা, চাঁপা রঙের ঢাকাই তাঁতের শাড়ি, তার মধ্যে হস্নু-হানার সুগন্ধ। এই সুন্দর মূর্তি নিয়ে তুমি অমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলতে পার আমায়, এই স্বপ্নের মানে কি?

—মানে হলো, তুমি সুন্দর।

—কথা এড়িয়ে যেও না। বল, কবে ঐ স্বপ্নের মতো ক'রে তোমাকে কাছে পাব।

—তোমার যেদিন ইচ্ছা।

—এই মাসেই এই আষাড়ের কোন শুভদিনে।

—বেশ।

—তাহলে দিদিমাকে বলি।

—বলো।

চলে যাচ্ছিল অধীর। অম্বি হঠাৎ বলে—ইস্, কী সাংঘাতিক ভুল।

রমাদের কলেজের স্পোর্টসে যাবার জন্য নিমন্ত্রন কার্ডটা অধীরের হাতে তুলে দিয়ে অম্বি বলে—আপ্পি বার বার বলেছেন, এখনি যাও, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

অধীর কি-যেন ভাবে! অম্বি বলে—যাও, নইলে রমাও দুঃখ করবে।

স্পোর্টস-এর মাঠের একপাশে এক জায়গায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে চারুবালা ও উপেন অধীরের প্রতীক্ষা করছিলেন।—অধীর কি ভুলেই গেল?

কিন্তু পরমুহূর্তেই চারুবালা ও উপেন খুশি হয়ে দেখতে পেলেন, অধীর এসেছে। রমার তখন হার্ডল্ রেস শুরু হয়েছে! ফার্স্ট হলো রমা।

চারুবালা অধীরের দিকে তাকিয়ে বলেন—আমি জানতাম, রমা ফার্স্ট হবে।

রমা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রশ্ন করে—অম্বি আসে নি?

তারপর অধীরকে দেখেই ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে হঠাৎ বলে ফেলে—আপনি এলেন কেন? উঃ কি ভীষণ লজ্জা করছে আমার! এইবার আপনি চলে যান।

অধীর হেসে ফেলে—তা'হলে আমি চলি।

চারুবালা ভ্রূভঙ্গি ক'রে মেয়েকে ধমক দেন—কথা বলার কি ছিরি?···ওর কথা তুমি গ্রাহ্য করো না অধীর।

চোখ বেঁধে হাঁড়ি ভাঙবার খেলা! রমা লাঠি হাতে হাঁড়ি ফাটাবার জন্য তৈরি হয়ে মাঠের কিনারায় এসে পড়ে। চারুবালা ভ্রূকুটি ক'রে হাসতে থাকেন। রমা যেন একটা পাগল অন্ধের মত আই চাই করতে করতে বাঁধা চোখ নিয়ে আর লাঠি ঘুরিয়ে এই দিকেই আসছে অথচ হাঁড়িটা মাঠের মাঝখানে পোস্টের গায়ে নির্বিকার ঝুলছে।

কি বিশ্রী ভুল করছে রমা। ভুল আন্দাজ করছে। যেন আকাশে বাড়ি মারবার জন্য লাঠি তুলেছে।

ও কি? ওখানে যে অধীর দাঁড়িয়ে আছে। আসর-সুদ্ধ দর্শক হাসতে থাকে। প্রায় অধীরেরই মাথা লক্ষ্য ক'রে লাঠি তোলে রমা! এক লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অধীর হাসতে থাকে।

ঘটনা দেখে হেসে ফেলেও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান চারুবালা। উপেনের কানে কানে বলেন—রমাটা কি ইচ্ছে ক'রে অধীরকে অপ্রস্তুত ক'রে সরিয়ে দিতে চাইছে? ওর মতলব কি?

উপেন বলেন—তুমি কেন মিছিমিছি ছেলেমানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বুঝবার চেষ্টা করছো? বাইরে থেকে দেখে ওসব কিছু বোঝা যায় না।

চারুবালা—আমার যেন কেমন ঠেকছে। মেয়ের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

উপেন—না, না, তুমি, খামকা ওসব কথা ভাবছো।

তখন একা ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে গান গাইছিল অম্বি, গলা খুলে।

আজ তার জীবনের পরিণাম একেবারে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। আর যে ভাগ্যের দোষ দেখে আপ্পি আর আম্মি কত চিন্তা করেছেন, কত আক্ষেপ করেছেন, সেই ভাগ্যের শুভ স্বরূপের সংবাদ শুনতে পেয়ে কত খুশি হয়ে উঠবেন দুজন, আপ্পি ও আম্মির মুখ হেসে উঠবে। সেই কল্পনায় আনন্দ যেন অম্বির এতদিনের সাবধানতায় বাঁধা মনকে মাতিয়ে দিয়েছে।

রেডিও হতে উৎসারিত সঙ্গীতের একটি স্তবক শুনে নেয় অম্বি। তার পরেই রেডিও বন্ধ ক'রে সেই গান গাইতে থাকে। তার পর আর এক স্তবক।

বাড়ির বারান্দায় উঠে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ান চারুবালা ও উপেন।—কে গাইছে গান? অম্বিও গাইতে পারে না কি?

চারুবালা—অম্বি নয়। রেডিওর গান।

সন্দেহ মেটাবার জন্য পরদার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখেন চারুবালা। ফিরে এসে বলেন—হ্যাঁ, অম্বিই গাইছে।

উপেন গায়ের চাদর নামিয়ে অপ্রস্তুতের মত স্বরে বলেন—অম্বি কি কখনো গানের মাস্টারের কাছে গান শিখেছিল?

—না। কোনদিন তো দেখি নি। অম্বিকে কখনো গান শেখানো হয়নি।

—তবে, এ কিরকম হলো? শেখানো হলো না, তবুও শিখলো। তা ছাড়া রমার চেয়েও ভাল গলা পেল?

এটাও যেন চারুবালা ও উপেনের জীবনের একটা সংকল্পের পরাভব। অম্বির গলার সুন্দর গান শুনে আনন্দিত হতে পারছেন না। নিজেদের বুকের ভিতরেই যেন একটা কাঁটার খোঁচা বিঁধছে। হঠাৎ গান বন্ধ হয়। বোধহয় বুঝতে পেরেছে অম্বি আপ্পি ও আম্মি ঘরে ফিরে এসেছেন। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে ভিতরের বারান্দার দিকে আসতে থাকে অম্বি এবং শুনতে পায়, ঠিক, আপ্পি আর আম্মিই কথা বলছেন। থমকে দাঁড়ায় অম্বি।

তারপরেই শিউরে ওঠে অম্বির সারা শরীর। যেন এক জ্বালাময় শিহরণ। দুঃসহ বেদনায় আবিল হয়ে যায় চোখের দৃষ্টি। আপ্পি আর আম্মির আলোচনার ভাষা থেকে একটি যে নিদারুণ তথ্য অম্বির কানে এসে বেজেছে, সেই তথ্যের জ্বালা নিষ্ঠুর কৌতুকে পুড়িয়ে দিচ্ছে অম্বির বুকের পাঁজর।

উপেন—আমার ইচ্ছা, রমা পরীক্ষাটা দিয়ে নিক, তারপর একটা ভাল দিন বুঝে···।

চারু—কিন্তু পিসিমার ইচ্ছে, শুভস্য শীঘ্রং, যত শিগগির হয় তত ভাল।

বিয়ের পরেও পরীক্ষা দিতে পারে রমা। আর অধীরের মত বিদ্বান ছেলের বউ যে হবে, তার পড়াশুনার কোন অসুবিধেও হবে না।

উপেন—এটা আমাদের ভাগ্যি বলেই মানতে হবে, রমার জন্য অধীরের মত পাত্র পাওয়া গিয়েছে।

সব শুনতে পায় অম্বি। ছুটে চলে যায়, যেন মরিয়া হয়ে ছুটে উপরতলার ঘরে এসে দুহাত দিয়ে মাথাটা নিষ্ঠুরের মত টিপে ধরে। তার পরেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ডাকে। অধীরকে আহ্বান করে।

—শুনুন, আপনি কি সত্যিই আমার সব কথা বিশ্বাস করেছেন।···

চোখ দিয়ে জল গড়ায়, কিন্তু নিজেকে কঠোর ক'রে, যেন আত্মহত্যার প্রয়াসের মতই অম্বি জানিয়ে দেয় অধীরকে, আমাকে যদি বাঁচতে দিতে চান তবে একথা এখন কাউকে বলবেন না। না কাউকে না। দিদিমাকে নয়, আপ্পি আম্মিকেও নয়। পায়ে পড়ি আপনার, আপনি শুধু চুপ ক'রে থাকুন··· কতদিন? জানি না, ভগবান জানেন। হ্যাঁ, আসবেন বৈকি···একশোবার আসবেন।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে অপরাধিনী মনে করেছে অম্বি। কি ভয়ংকর ভুলে আপ্পি আর আম্মির মনের একটা বড় সাধকে যেন হত্যা করতে চলেছিল অম্বি কিন্তু সময় থাকতেই ধরা পড়ে গিয়েছে অম্বির সেই ভুল। রমাকে অধীরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েছেন, অনেক আশা নিয়ে দিনক্ষণের অপেক্ষা করছেন আপ্পি আর আম্মি। এই সত্য যদি প্রথমেই এমনই আকস্মিক কোন ঘটনায় বুঝতে পারতো অম্বি, তবে অম্বি অধীরের মুখের দিকেও তাকাতো না, তাকাতে যতই ইচ্ছে হোক, আর মনের ভিতর সে স্বপ্ন যতই কান্না কাঁদুক না কেন। নিজের উপর কঠোর হবার শক্তি আছে অম্বির। এতদিন সেই শক্তি নিয়েই অম্বির জীবন চলছে।

নতুন ক'রে একবার ভয়ানক কঠোর হতে পারবে না কেন অম্বি? নিশ্চয়ই পারবে। আপ্পি আর আম্মির মনের আশাকে এখন নিজের প্রাণের রক্ত দিয়েই সফল ক'রে তুলতে হবে। রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ে হবে, এই আকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনাকেই এখন প্রতিমুহূর্তের চিন্তা আর চেষ্টা দিয়ে সত্য ক'রে তুলতে হবে। এই হবে অম্বির জীবনের এক নতুন ব্রত। দুঃসহ, কিন্তু হাসিমুখেই এই ব্রত পালন করবে অম্বি।

হ্যাঁ, হাসিমুখেই এই বাড়ির জীবনের পরিণামকে যেন জোর ক'রে পথ

ঘুরিয়ে নেবার জন্য অম্বির প্রতিদিনের চেষ্টা চলতে থাকে। রমার কাছে অধীরের প্রশংসা, আর অধীরের কাছে রমার প্রশংসা। যেন যাদুকরীর মত রমার মনে সেই মোহ সঞ্চারিত করতে চায় অম্বি, যে-মোহ ভালবাসা হয়ে ফুটে উঠতে পারে। অধীরের মনের উপরেও যেন সেই সূক্ষ্ম ও জটিল মায়া রচনায় পরীক্ষা চালায় অম্বি। অধীরের কাছে রমাকে মোহনীয় ও লোভনীয় ক'রে তোলবার জন্য নানা কথা ও কাহিনী ও ঘটনায় পরিবেশন করে অম্বি।

পড়ার ঘরে রমার কাছে গিয়ে অনেক চিন্তা আর উদ্বেগের ভঙ্গিতে অম্বি বলতে থাকে—অধীরবাবু তোর এত প্রশংসা করে কেন?

—প্রশংসার যোগ্য বলে, এর মধ্যে কেন আবার কি?

—না, অধীরবাবু কেন করেছ?

—হরির মা'ও তো আমার প্রশংসা করে।

—ঠাট্টা না ক'রে তোমার একটু বোঝা উচিত রমা।

—তুই কি বোঝাতে চাস আমাকে?

—অধীরবাবুর মত ভাল মানুষ হয় না।

—তা কে না জানে? বিদ্যা অনেকেরই থাকে, কিন্তু অমন ভাল মন খুব কম দেখা যায়।

—আমার ভয় হয়, এরকম একটা ভাল মনও শেষ পর্যন্ত যদি কোন দুঃখ পায়।

—তার মানে?

সহসা উত্তর দিতে পারে না অম্বি। অম্বির অনুরোধগুলির মধ্যে যেন চাপা কান্নার সুর লুকিয়ে রয়েছে, অথচ অম্বি যেন এক নতুন হর্ষের সুর দিয়ে ঢাকতে চাইছে সেই করুণতা।

রমার কত প্রশংসা করে অধীর, রমার কানে সে-কথা বর্ণনা করতে গিয়ে অম্বি হঠাৎ আরও স্পষ্ট ক'রে দেয় তার চেষ্টার ইঙ্গিত।—অধীরবাবুর কাছে তুই যদি রোজ পড়া শিখে নিতে পারিস, তবে কলেজের সব মেয়ের মধ্যে তুই নিশ্চয়ই ফার্স্ট হবি।

রমা বলে—হ্যাঁ, কিন্তু তুই যদি অধীরবাবুর কাছ থেকে পড়া শিখিস তবে কি হবে বুঝতে পারিস?

—কি?

—তবে তুই এই পৃথিবীর সব মেয়ের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে যাবি।

বিব্রত হয় অম্বি। কিন্তু উপায় খোঁজে, আশা ছাড়ে না।

অধীর যেদিন এল, সেদিন আবার নতুন ক'রে অম্বি তার পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য তেমনি সূক্ষ্ম প্রয়াসের কুহক সৃষ্টি করে। রমার মত ভাল মেয়ে হয় না। রমাকে যে-মানুষ আপন ক'রে নেবে, সে-মানুষ জীবনে সুখী হবেই হবে। রমা যে সব প্রশংসা করেছে অধীরের নামে, সে সব প্রশংসার কথাই অধীরেকে বিচিত্র এক উৎসাহ নিয়ে শোনাতে থাকে অম্বি।

রমার পড়ার ঘরে অধীর এসে ঢুকতেই রমা বলে—অম্বিকে ডেকে দিচ্ছি

অধীর হাসে—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

রমা—আমার কথা ছেড়ে দিন। হয় তো ডলিদের বাড়ি চলে যাব আবার চণ্ডালিকার রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছে।

রমা চলে যায়, এবং একটি মিনিট পরেই উদাসভাবে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় অম্বি। অম্বি বলে—আপনি কিছু মনে করবেন না অধীরবাবু। একটু অপেক্ষা করুণ, এখনই আপ্পি আপনার সঙ্গে গল্প করবার জন্য আসবেন।

অধীর হাসে—তার মানে, আপনি এখন এখানে আমার কাছে বসে দু'টো কথাও বলতে পারবেন না, এই তো?

—সত্যিই আমার কাজ আছে অধীরবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন?

—আপনার কথা আমি একটুও বিশ্বাস করলাম না, বিশ্বাস করুন।

—রমাকেও বিশ্বাস করা আপনার উচিত হয় নি।

—তার মানে?

—ও যে একটা ছুতো ক'রে চলে গেল, বুঝতে পারেন নি?

—বুঝতে পারলেও আমার কি করার আছে?

—রমাকে আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে দু'টো কথা বলবার জন্য কত আশা ক'রে বসে থাকে রমা; আপনি শুধু ওর আজে বাজে কথাগুলিকেই দেখতে পান, ওর মনটাকে দেখতে পান না।

গম্ভীর হয় অধীর।

মনে হয় অম্বির, তার এই ব্রত সফল হয়, যদি আর একটু চেষ্টা করা যায়। যদি একটু কঠোর হওয়া যায় যদি তার মনের কান্নাকে আরও ভাল ক'রে চেপে অধীরের মনে রমার নামে এক নতুন মোহ সৃষ্টি করতে পারা যায়।

এক এক সময় অধীরের কথা ও মন্তব্য থেকে যেন আশার আভাস পায় অম্বি। মনে হয়, অধীরের মনে রমার সম্বন্ধে একটা আকর্ষণের মায়াবোধ জাগছে; এই সত্য কল্পনা করতে একদিকে যেমন নিশ্চিন্ত হয় অম্বি, তেমন

আর এক দিকে মনে হয়, কি দুঃসহ এই সত্য!

রোজই আসছে অধীর, অধীরের একমাত্র কৌতূহল হলো, কেন অম্বি তার বিয়ের প্রস্তাবকে বাধা দিল? বিষণ্ণ হয়ে আছে অধীরের মন। সুযোগ খোঁজে সোজা প্রশ্ন ক'রে অম্বির কাছ থেকে এই রহস্যের অর্থ জেনে নিতে চায়, কিন্তু ঠিক সুযোগ পায় না। যতবার নিভৃতে দেখা পেয়ে কথাপ্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে চেয়েছে অধীর, ততবারেই কোন না কোন ঘটনায় প্রশ্ন অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। হয় চা খেতে ডাক দেন চারুবালা, নয় অম্বি সরে যায় কোন কাজের অজুহাতে।

ব্যারাকপুরের গঙ্গার কলস্বর যখন অনেক রাতের নীরবতার মধ্যে হঠাৎ এক একবার বেজে ওঠে, তখন ঘুম ভেঙ্গে যায় অম্বির এবং আর ঘুম আসে না। গঙ্গার ঘাটে একা একা বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অম্বি। গঙ্গার ঘাটেও এখন আর সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় না। আষাঢ়ে মেঘের ঘটায় কালো হয়ে আছে আকাশ। কিন্তু গঙ্গার ঢেউ তো আছে, আর জলের শব্দে অদ্ভুত সান্ত্বনায় ভাষা আছে। কাছে গিয়ে দেখতে আর শুনতে ইচ্ছা করে, কিন্তু না, আর না। ভয় হয়, পিছন থেকে হয়তো ব্যাস্তভাবে ছুটে আসবে একটি সুন্দর মানুষের ছায়া। একেবারে পাশে এসেই আবার সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করবে—তুমি এমন ক'রে লুকিয়ে থাকছো কেন?

কিন্তু সে এখন কোথায়? কলকাতাতেই আছে কি? অনেক দিন হলে, এই বাড়িতে আর আসে নি অধীর। আপ্পি আর অম্মির কথাবার্তা থেকেও কোন সংবাদ ধরতে পারে না অম্বি। আশ্চর্য লাগে, এই বাড়ির কারও মন একটু বিচলিত হয় না কেন?

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারে অম্বি, এই বাড়ির মন সত্যি বিচলিত হয়ে উঠেছে। শ্যামবাজার থেকে পিসিমার চাকর একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। অধীরের অসুখ। খুব জ্বর আর মাথাধরা।

বাড়িসুদ্ধ সবাই উদগ্র হয়ে উঠেছে, আপ্পি আর আম্মি তৈরি হয়েছেন, এখুনি শ্যামবাজারে গিয়ে অধীরকে একবার দেখে আসবেন।

দেখে খুশি হয় অম্বি। কিন্তু এই খুশির ভিতরেই যেন একটা কাঁটা লুকিয়ে রয়েছে। অধীরকে দেখতে যাবার অধিকার এই পৃথিবীর সবারেই আছে, শুধু নেই অম্বির।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে

ইচ্ছা করে। নিজের এই হাত দু'টোকেই যেন আবর্জনা বলে মনে হয় অম্বির। সে মানুষ যে নিজেই শখ ক'রে চেয়েছিল এই জর, শুধু অম্বির হাতের একটা ভুল দেখবার লোভে। অধীরের কপালে অম্বির হাতের ছোঁয়া লুটিয়ে লুটিয়ে জরের সব জ্বালা আর তাপ স্নিগ্ধ ক'রে দেবে, সেই মানুষের এমন একটি স্বপ্নকেই আজ তুচ্ছ ক'রে দূরে সরে থাকবে অম্বি।

কিন্তু বুঝতে ভুল হয় নি অম্বির। এই অসুখের খবর যে অম্বিকেই কাছে পাওয়ার আহ্বান। কিসের আশায়, কার জন্য, এই খবর এসেছে, কল্পনা করতে অসুবিধা নেই। তবু যেতে পারবে না অম্বি, এবং সেই মানুষও অম্বির এই হৃদয়হীনতা দেখে হতভম্ভ হয়ে অম্বিকে চিরকালের মত অবিশ্বাস করুক।

হঠাৎ রমা এসে বলে—আমি যাচ্ছি অম্বি।

—কোথায়?

—অধীরবাবুর অসুখ, একবার দেখে আসি।

অম্বি অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। রমার চোখের ঐ চঞ্চলতা কি সত্যিই একটা ব্যাকুলতা? রমার মনে তবে কি সত্যিই···।

রমা বলে—তুই যাবি না?

অম্বি—না।

রমা— কেন?

অম্বি—কেন আবার কি? যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

রমা গম্ভীরভাবে বলে—ইচ্ছে যদি না করে তবে না যাওয়াই ভাল।

চলে গেল রমা। আপ্পি আর আম্মির সঙ্গে একই গাড়িতে বসে রমা চলে যাচ্ছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এই রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করে অম্বি, এবং বুঝতে পারে, হ্যাঁ, রমার মন আজ অধীরের কাছে গিয়ে বসবার জন্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অধীরের জন্য রমার মনে এতদিনে একটা মায়া ভরা কৌতূহল দেখা দিয়েছে।

অম্বির চেষ্টা আর ইচ্ছাই সফল হয়েছে। জানালার কাছে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অম্বি, সে নিজেই জানে না। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা অন্ধ ভিখারী চেঁচিয়ে গান গাইছে আর বৃষ্টি পড়ছে। ভিখারীকে চাল দিয়ে বিদায় করার পর আর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে ভিজবার পর অম্বির চোখ থেকে যেন বেদনার ঘোর কেটে যায়। ভালই হলো। যেন একটা মানত সফল হলো এতদিনে।

তবু একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাবে অম্বির সব

উদ্বেগ। অধীরও কি তবে রমারই আশায় তার জ্বরের শরীর হয়ে দরজার দিকে তৃষ্ণার্তের মত উৎসুক হয়ে তাকিয়ে বিছানার উপর চুপ ক'রে পড়ে আছে? কে জানে, এতক্ষণে বোধহয় রমাকে পেয়েই শান্ত হয়ে গিয়েছে অধীরের চোখের প্রতীক্ষা।

তাই যেন হয়। ফটক থেকে ফিরে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই ঝি চেঁচিয়ে ওঠে···এ কি গো অম্বিদি? মিছিমিছি ভিজছো কেন?

অম্বি হাসে—ভয় নেই, আমার জ্বর হবে না।

পিসিমার পরিকল্পনাও প্রায় সফল হয়ে এসেছে। অম্বির জন্য যে পাত্র সংগ্রহ করেছেন পিসিমা, সেই পাত্রের পক্ষ হতে পাতিপত্র রচনা করার প্রস্তাবও এসে গেল। নইলে অন্য জায়গায় পাত্রী খুঁজবেন তাঁরা। পিসিমাও ব্যস্তভাবে উপেন আর চারুবালাকে নানা তাগিদে বিচলিত ক'রে তুললেন। পিসিমার কথার জালে তাঁদের মনের প্রশ্নগুলিও যেন বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। ভুল হয়ে যাচ্ছে যুক্তি। পিসিমার কথার উপর বেশি বিশ্বাস। পিসিমাকে বড়ই উপকারী জন বলে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন দুজনে। পাত্রপক্ষের লোক আর উপেনবাবু একদিন পাতিপত্রে সিঁদুরের ছাপ দিয়ে বিয়ের প্রস্তাবও পাকা ক'রে ফেললেন।

আর একটা প্রস্তাব, পিসিমা তাঁর সংকল্পের আর এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এইবার, অধীরকে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন এবং বলবেন। রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ের তারিখটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে, শুধু অধীরকে একটু জিজ্ঞাসা করা। শুধু দুজনের মন একটু বুঝে নেওয়া। রমার কি ইচ্ছে, পরীক্ষার আগেই রাজী কি না? অধীরও কি এই চায়?

এইজন্যই এইবার রমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন পিসিমা। দুটিতে এক সঙ্গে বসে গল্প করলে বলেই ফেলবে মনের কথা, আর পিসিমা আড়াল থেকে শুনেই ফেলবেন। পিসিমা বলেন—ওগো আমি তো দিদিমা হই, নাতির সঙ্গে একটু রগড় আমি করবো না তো কে করবে?

কদিন পরে পিসিমা নিজেই এলেন দুটি চিঠি হাতে নিয়ে, দুটি নিমন্ত্রণ পত্র। রমা আর অম্বির কাছে লেখা অধীরের দুটি চিঠি। জন্মদিনের নিমন্ত্রণ। পিসিমা উপেনের বাড়ির ফটকে ঢুকবার আগেই একটি চিঠিকে কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেন। অম্বির নামে লেখা নিমন্ত্রণের আহ্বান-লিপি ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে থাকে। পিসিমা এসে শুধু রমার হাতে তুলে দেন নিমন্ত্রণ পত্র।

দেখে খুশি হয় অম্বি। শুধু রমার কাছেই অধীরের নিমন্ত্রণের চিঠি এসেছে। তার মনে সন্দেহ থাকে না। অধীরের মনে রমার জন্য যে আহ্বান জেগে উঠেছে, তার প্রমাণ ঐ নিমন্ত্রণের চিঠি। শুধু রমারই কাছে, আর কারো কাছে নয়। চোখের জলে আর বিস্ময়ে এই প্রমাণকে সত্য বলে স্বীকার করতে চেষ্টা করে অম্বি।

আর কোন প্রশ্ন নেই: অম্বির আর একটি মানতও সফল হয়েছে। অধীরের মন আজ রমাকেই খুঁজছে।

ভাল হলো, আপ্পি আর আম্মির জীবনের একটা সাধের আশাকে ব্যাথিত করবার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেল অম্বির জীবন। আরও ভাল, অম্বিকে একটা ছলনা, একটা মিথ্যা ভালবাসার খেয়াল, একটা ফাঁকির কুহকিনী বলে বুঝে ফেলতে পেরেছে অধীর। সুখী হোক অধীর। অম্বিকে মনে প্রাণে যদি ঘৃণা করতে পারে অধীর, তবেই একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে অম্বি।

চোখের কোণ দুটো ছলছল করে, নিঃশ্বাসের মধ্যে যেন কাঁটা খচখচ করে। করুক। কেউ দেখতে পাবে না, বেশ ভাল করে এই বেদনা লুকিয়ে ফেলতে পারবে অম্বি। রমার বিয়ের দিনে অম্বির মুখের হাসি দেখে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্দেহবাদীও বলতে পারবে না যে, অম্বির বুকের ভিতর তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নটা নিজেই নিজের গলায় ছুরি দিয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করছে। আপ্পি আম্মি আর রমা সুখী হবে। সবচেয়ে বেশি সুখের কথ, অধীর সুখী হবে। তবে আর দুঃখ করবার কি আছে। অম্বি জানে. সেই পাঁচ বছর বয়স থেকেই জানে, কেমন ক'রে সংসারের এক একটা সুন্দর ও মধুর মায়া আর ভালবাসার লোভ থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। সেই যে কবে, আজও স্মৃতির কুয়াশার ভিতর যেন জলজল করে সেই দৃশ্যটা। আম্মির বিছানা থেকে অম্বি তার ছোট বালিশটা তুলে নিয়ে আয়ার ঘরে চলে গেল। আম্মির বুক ঘেঁষে শোবার অধিকার ছিল না, সেই পাঁচ বছর বয়সের অম্বির। আজও ঠিক তেমনিই সরে যেতে হোল। সহ্য করা এমন কি কঠিন কাজ? এখন তো অনেক বড় হয়েছে অম্বি। অনেক বয়স হয়েছে, বুকের হাড়গুলি কেমন যেন পাথর পাথর হয়ে গিয়েছে।

রমাকে সাজিয়ে দিল অম্বি। সেই সাজে, যে-সাজে, অধীরের স্বপ্ন অম্বিকেই সাজাতে চেয়েছিল একদিন। সেই চন্দ্রমল্লিকা, হস্নুহানার সৌরভ, খয়েরের টিপ, আর চাঁপারঙের শাড়ি। রমা আশ্চর্য হয়, কেন অম্বি যাবে না? চারুবালাই রমার আপত্তি খণ্ডন করেন, রমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এসে

বলে দেন—বনেদী বংশের উচু জাতের বাড়িতে অম্বি যেতে পারে না, যাওয়া উচিত নয়।

পিসমার বাড়তে এই ঘটনার মীমাংসা হয়ে গেলে বড় স্পষ্ট ভাবেই। রমা এল। অধীরের সঙ্গে নিভৃতে বসে রমার অনেক গল্প আর আলোচনাও হলো। পিসিমা বার বার দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ান, উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। তারপরেই অপ্রসন্ন মুখে গজগজ করতে করতে অন্যত্র চলে যান। আবার ফিরে এসে শুনবার চেষ্টা করে, কি বলছে অধীর রমাকে?

শুনে হতাশ হয়ে পড়েন পিসিমা। অম্বি, অম্বি, অম্বি। শুধু অম্বির কথাই আলোচনা করছে দুজনে। রমাই বলে দেয়, অম্বি নিজের হাতে এভাবে সাজিয়ে দিয়েছে রমাকে। শুনে মনে মনে হাসে অধীর। অম্বির নানা গুণের কথা প্রাণ খুলে বলতে থাকে রমা। আর অধীরও অম্বির নামে সব গল্প আর সব ঘটনার বর্ণনাকে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনতে থাকে।

অধীর বলে—অম্বি বোধহয় নিজেকে খুব চালাক মনে করে।

রমা—বোধহয় কেন, সত্যিই অম্বির ধারণা যে, ওর চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ভূ-ভারতে নেই। সর্বদা আমাকে উপদেশ দিচ্ছে অথচ নিজে ·

অধীর—নিজে কারও সামান্য একটা অনুরোধের সম্মান রাখতেও রাজি নয়।

বলতে বলতে গম্ভীর হয় অধীরের মুখ। তারপর রমার মুখের দিকেই যেন একটা বেদনাহত দৃষ্টি তুলে বলতে থাকে—তোমাকে বলা উচিত নয়, তবু না বলে থাকতে পারছি না, আমি আশা করেছিলাম, আজ অন্তত অম্বি আসবেই।

রমা বলে—আমিও আশ্চর্য হয়েছি। তা ছাড়া আমারও মনটা এত রেগে গেল যে আমিও ওকে আসবার জন্য বললাম না।

অধীর—তোমার তবু একটা সুবিধা আছে রমা, অম্বির ওপর রাগ করতে পার। কিন্তু আমি যে অম্বির ওপর রাগ করতে পারছি না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে রমা।

অধীর বলে—তুমি বোধহয় আমাকে ঠাট্টা করছো রমা।

রমা বলে—হ্যাঁ, আপনাকে ঠাট্টা করাই উচিত। একথাটা আমাকে না বলে অম্বির কাছে বলে ফেলতেই তো পারেন।

আড়াল থেকে শুনে চমকে ওঠেন পিসিমা। হ্যাঁ, অম্বি নামে ঐ অজাত একটা মেয়ে বড় বেশি ছলনা বিস্তার করেছে। ঐ মেয়েটাই পথের কাঁটা।

ওকে পথ থেকে তাড়াতাড়ি সরাতে না পারলে পিসিমার সংকল্প ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। নিজেকে আরও কঠোর ক'রে নিয়ে প্রস্তুত হন পিসিমা। অধীরের মন থেকেই অম্বির নামের মোহ চূর্ণ করে দিতে হবে।

রমার মুখের নানা গল্প শুনে নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছে অধীর। এতদিনে অম্বির ইচ্ছার চক্রান্তটাকে চিনতে পেরেছে অধীর। রমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে অধীরের চোখের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অম্বি তার মনের গোপন একটা চেষ্টাকেই ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। অম্বির ইচ্ছা রমার বিয়ে হোক, এই রহস্যের আভাস এক দুঃসহ বিস্ময়ের আঘাতের মত অনুভব করেছে অধীর। কিন্তু কেন? ভালবাসা কি শুধু এই রকম একটা লুকোচুরি খেলার আবেগ? খামখেয়ালের উল্লাস? অধীরের জীবনের আশা আর আনন্দগুলি কি অম্বির ইচ্ছার হুকুম মেনে উঠবে বসবে আর ছুটে বেড়াবে? এই বিস্ময়ের চরম হিসাব নিকাশ করবার জন্যই উপেনের বাড়িতে দেখা দিল অধীর।

অধীরকে দেখতে পেয়েই ভয় পায় অম্বি। অধীরের চোখে যেন দুর্জ্ঞেয় একটা প্রশ্ন জলজল করছে। এবং সেই প্রশ্ন ধ্বনিত হওয়া মাত্রই বুঝতে পারে অম্বি, তার শেষ প্রয়াস সফল হয় নি। রমাও একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে অম্বিকে।

অধীর বলে—আমি তো আর দেরী করতে পারি না।

অম্বি বলে—ভুল করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

—কেন?

অম্বি বলে—আপনার ক্ষতি হবে।

অধীর—কিসে আমার ক্ষতি হয় বা না হয়, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

বাগানের কাছে বাঁশের খুঁটি বেয়ে নতুম মাধবীলতা অনেক উপরে ওঠে গিয়েছে আর নূতন বর্ষার জলো বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে দুলছে। এ হেন একটা ভয়ানক নিরালার এক কোণে অম্বি আজ অধীরের চোখের সামনে আটক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চলে যাবার সুযোগ পায় নি। বাড়ির ভিতর থেকেও কোন ডাক আসে না, কেউ ডাকলেও এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাবে না। ছুতো ক'রে যাবার উপায় নেই অম্বির। অধীরের মুখের ঐ স্পষ্ট দাবি যেন পরোয়ানার মত অম্বির কানের কাছে এসে অম্বিকে এই মুহূর্তে তৈরি হয়ে নিতে বলছে।

অম্বি বলে—আপনাকে আমার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করতে পারবে, এমন মেয়ে কি এই পৃথিবীতে নেই ?

অধীর—থাকতে পারে !

অম্বি—আমার উপর মায়া করতে আপনাকে যতটুকু ভাল লাগছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল লাগবে, এমন মেয়েও তো কত আছে।

অধীর চেঁচিয়ে উঠে—না, নেই। আমি তোমার চেয়ে বেশী বোকা নই অম্বি।

উপায় নেই। কোন যুক্তি, কোন অনুরোধ, কোন অজুহাত আর কোন ছলনার জোরে অম্বির প্রাণ অধীরের ঐ প্রতিজ্ঞার দাবিকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আর মিথ্যা বুঝিয়ে পালিয়ে যাবার পথ পাচ্ছে না।

কিন্তু, আর এই সব তুচ্ছ বাক্যে যুক্তি আর তর্কের দরকার কি ? একটি সত্য কথা বলে দিয়েই তো এই মুহূর্তে অধীরের মনের এই প্রতিজ্ঞার জোর চূর্ণ করে দেওয়া যায় ! উঁচু জাতের এতবড় বংশগর্বের মানুষ যে এখনও অম্বির এই শরীরটার রক্তমাংসের ইতিহাসের কোন খবরই রাখে না।

হঠাৎ অম্বির চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে। অধীরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে, যেন বুকের ভিতর মস্ত একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছে অম্বি। অম্বি বলে—আপনি তো জানেন, কত বড় বংশের কত উঁচু জাতের মানুষ আপনি ?

অধীর—জানি বৈকী।

অম্বি—আপনি তো জানেন যে, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে অনেক নীচ জাতের মানুষ আছে।

অধীর—জানি।

অম্বি—নীচ জাতের মানুষের মনও নীচ হয়ে থাকে। বিশ্বাস করেন নিশ্চয়ই ?

অধীর—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্বাস করবার জন্যই প্রমাণ খুঁজছি।

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ নীরব হয় অম্বি। থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে অম্বির দুই কালো চোখের তারা। আর, চোখের কঠোর দৃষ্টি যেন হঠাৎ বেদনায় ছলছল ক'রে ওঠে।

আশ্চর্য হয় অধীর—তুমি আজ আমাকে এসব প্রশ্ন করছো কেন অম্বি ?

উত্তর দেয় না অম্বি।

অধীর বলে—রমা বোধহয় তোমাকে বলেছে যে, আমি জাতপাতের মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য রিসার্চ করছি।

তবু উত্তর দেয় না অম্বি। মাধবীলতার ভেজা পাতা থেকে টুপটাপ ক'রে জলের ফোঁটা অম্বির খোঁপার উপর ঝরে পড়তে থাকে। অধীরের মুগ্ধ চোখ দুটো এক নতুন সন্দেহে যেন তীব্র হয়ে চমকে ওঠে।—তুমি, তুমি কি তোমার নিজের জাতের কথা ভাবছো অম্বি?

অম্বি—হ্যাঁ।

অধীর—তুমি কি উপেনবাবুর মত…মানে আমাদের মত জাতের মেয়ে নও?

অম্বি—না।

অধীরের এতক্ষণের সব আগ্রহ যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে মৃদু শান্ত স্বরে, যেন ছোট একটি বিস্মিত আর্তনাদের মত শব্দ ক'রে অধীর প্রশ্ন করে—তবে?

অপলক চোখে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে অম্বির প্রাণটাও যেন নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে শিউরে উঠে। ভয় পেয়েছে অধীর। উঁচু জাতের মানুষের ভালবাসা হঠাৎ নীচ জাতের ছায়া দেখে আর্তনাদ করে উঠেছে। ভালই হয়েছে। এই মুহূর্তে অধীরকে সব ভুল মোহ থেকে মুক্ত ক'রে দিতে পারবে অম্বি।

অধীরের মনকে হঠাৎ আঘাতে যেন চরম ক'রে চূর্ণ করার জন্যই নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দেয় অম্বি।—আমি ভয়ানক ছোট জাত। আমি অন্ত্যজা, অস্পৃশ্যা। আমার রক্তে দোষ আছে, আপনাদের পবিত্র পৃথিবীতে আমি একটা আবর্জনা।

অধীর নিঃশব্দে স্থির হয়ে শুনতে থাকে। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় অম্বি, একি? অধীরের দুই চোখ যেন মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। যেন এই জগতের এক বিস্ময়কে, এবং অধীরের জীবনের এক অন্বেষণের সত্যকে এতদিনে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে অধীর।

অধীর হাসে—তুমি ভয় দেখাচ্ছ অম্বি, কিন্তু ভুল করছো, তুমি আমার জীবনের সব অন্বেষণের জয়গান গাইছ। সত্য বলে বুঝতে চেয়েছিলাম যে কথাকে, তুমি তারই রূপ, তারই প্রমাণ। তুমিই আমার বিশ্বাস, আমার থিওরীর শেষ অধ্যায় আজ আমি লিখবো। আমার জিজ্ঞাসার তৃপ্ত তুমি। সবচেয়ে বড় বেদনার শান্তি তুমি। তুমি ভুলভাঙানো এক সুন্দর সত্যের

মূর্তি। জাত মিথ্যা, রক্ত মিথ্যা—তোমার মধ্যেই সার প্রমাণ পেলাম।

আরও লুব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে উঠেছে অধীরের অন্তরাত্মা। কিন্তু একেবারে অসহায়ের মত নীরব হয়ে যায় অম্বি। অধীরের এই প্রেমিকতা যেন স্বর্গের সুধার চেয়ে বেশি মধুর। কিন্তু এই প্রেম অম্বিকে আহ্বান করছে, আপ্পি আর আম্মির মনে দুঃখের আঘাত হানবার এক চক্রান্তে। মরতে পারে অম্বি, কিন্তু আপ্পি আর আম্মির কাছে হীন হতে পারে না। এই বাড়ির মায়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না অম্বি। এই সহজ সত্যটুকু বুঝতে পারছে না অধীর।

অম্বি বলে—না। তবু আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

অধীর—তবুও না?

কি আশ্চর্য! অম্বির এই পাথুরে হৃদয়ের পরিচয় কোনদিন পায়নি অধীর। এ যে পাথরের ফুল! কিন্তু কিসের আশায়, কোন মোহে, অধীরের এই আহ্বানকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবার শক্তি পাচ্ছে অম্বি? এ কোন্ রহস্য?

অধীর প্রশ্ন করে—কোথায় কার কাছে কোন আকর্ষণের লোভে আমার ডাক এমন ক'রে তুচ্ছ করতে পারছো অম্বি? এর কি কোন গোপন কারণ আছে?

অম্বি বলে—আছে, তোমার প্রতি আমি নিষ্ঠুরতা করতে পারি, এমন কারণও আছে, আকর্ষণও আছে, লোভও আছে।

উত্তপ্ত স্বরে অধীর প্রশ্ন ক'রে—শুনি, কি সেই আকর্ষণ?

অম্বি—শুনতে চাইবেন না, পায়ে পড়ি আপনার। আপনি শুধু বিশ্বাস করুন, আপনার স্বপ্নের চন্দ্রমল্লিকা মরে গিয়েছে।

ক্ষীণ সন্দেহ নিয়ে ফিরে যায় অধীর।

অধীরের মনের এই অবস্থারই সুযোগ দিলেন পিসিমা। কথাপ্রসঙ্গে আভাসে জানিয়ে দিলেন,—একটা ভাল খবর শুনেছিস অধীর? বেশ ভাল ঘরে অম্বির বিয়ে হচ্ছে। পাত্র বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ।

চমকে ওঠে অধীর, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু দিদিমাকেও অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। বিচলিত অধীরের যুক্তি বুদ্ধিও যেন এই দুঃসহ সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। মনটাকে সন্দেহের বশে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অম্বির সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করবার জন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে অধীরের মন। টেলিফোনের রিসিভার তুলে ধরে অধীর।

অধীরের ভাষাও যেন হঠাৎ তিক্ততায় উন্মত্ত হয়ে গরলে পরিণত হয়েছে। অম্বিকে স্পষ্ট করেই নিষ্ঠুর অভিযোগে আক্রমণ করতে কুণ্ঠিত হয় না অধীর—এমন তামাসার, এমন হীনতার কোন প্রয়োজন ছিল না। টাকা আমার আছে, চাইলেই পাবে। এখনও পেতে পার। কিন্তু টাকার কাছে বিকিয়ে যায় কারা? তুমি কনকধুতুরা, বিষ আছে তোমার ঐ সুন্দর হাসিতে আর নিঃশ্বাসে; তুমি আমার সারা জীবনের বিশ্বাসের সাধনাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে। আজ আমাকে নতুন ক'রে লিখতে হবে, শুরু করতে হবে আমায়—বলতে হবে পৃথিবীকে, জাত আছে, ছোট-জাত ' তাদের রক্তে ছোটত্ব আছে। তার প্রমাণ তুমি।

অম্বির ক্ষীণ প্রতিবাদের ভাষা অধীর শুনতে পায় না। কল্পনাও করতে পারে না অধীর, তার কথার আঘাতে এখন দূর ব্যারাকপুরের একটি কক্ষের নিভৃতে অম্বি নামে এক মেয়ের দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

অধীর বলে—কিসের আকর্ষণ? সে আকর্ষণ কি এতই সুন্দর যে তার জন্য তোমার কাছে আমার জীবনের সব অনুরোধ মিথ্যে হয়ে গেল?

অম্বি—তবে শোন।

কিন্তু অম্বির আবেদন শুনতে পায় না অধীর। টেলিফোন রেখে দিয়েছে অধীর। বার বার প্রশ্ন করেও উত্তর পায় না অম্বি।

চিঠি লেখে অম্বি।—তোমাকে সুখী করবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি চিরকাল আমার আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁষে পড়ে থাকতে চাই। এই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লোভ। কিন্তু তুমি আমাকে সুখী করতে পার। আমাকে যদি সুখী করতে চাও, তবে রমাকে বিয়ে কর।

রমাকে বিয়ে কর! অম্বির চিঠির এই প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হয় না অধীর। বিশ্বাসঘাতিকারা এই রকম আত্মত্যাগের ছলনা দেখায়। কিন্তু বুঝতে পারে না অম্বির যুক্তিগুলি। চিরকাল আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁষে পড়ে থাকবার আনন্দটুকু হারাতে চাই না। এ কথার অর্থ কি? তবে অম্বি কি বিয়ে করতে চায় না? তবে দিদিমা এ কোন্ কথা বললেন?

নিজেকে শান্ত করে নিয়ে টেলিফোনেই আবার অম্বিকে ডাকে অধীর। এবং পরমুহূর্তে সেই দুঃসহ সন্দেহের চরম মীমাংসা হয়ে যায়।

—আমার বিয়ে! অম্বি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ!

—কোথায়, কবে, কার সঙ্গে?

—বেশ এক টাকাওয়ালার সঙ্গে।

—কোথায় শুনলে?

— ভাল মুখ থেকেই শুনেছি।

—তবে শোন, কিন্তু একটি কথা দাও।

—কি?

—এমন বিয়ের লগ্নের আগে তুমি একবার আসবে আমার চোখের কাছে।

—কেন?

—এই পৃথিবীকেই একটা ঘটনা দেখিয়ে দেব।

—কি?

—তোমার পায়ের ধুলোর দাগ এই সিঁথিতে বরণ ক'রে নিয়ে তোমার চোখের সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এই ছোটজাতের মেয়ে, আর উঠবে না।

—অম্বি। অম্বি!

কোন উত্তর পায় না অধীর। কিন্তু অধীরের বুকে যেন তীক্ষ্ণ একটা আক্ষেপের খোঁচা লেগেছে। কি কুৎসিত সন্দেহ! কি ভয়ানক মূঢ়তা! নিজের ভুলের বেদনা সহ্য করতে না পেরে ছটফট ক'রে বেড়ায় অধীর। বার বার অম্বির চিঠির সেই লাইনটাই পড়ে, 'আমাকে যদি সুখী করতে চাও তবে রমাকে বিয়ে কর।

বার বার এই লাইনটিই পড়ে অধীর। হেসে ওঠে অধীরের চোখ। চিৎকার ক'রে ডাক দেয় অধীর—দিদিমা!

বটার মা'র সঙ্গে কথা বলছিলেন পিসিমা। রমার সঙ্গে অধীরের আসন্ন বিয়ের শুভ ঘটনার সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছিলেন। একটু আগেই দেখেছেন পিসিমা, উপেনের বাড়ির চাকর রাহু এসে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছে অধীরকে; আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন পিসিমা। ধারণা করেছেন, রমার চিঠি এসেছে। পিসিমাই যে ক'দিন আগে রমাকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন, তুমি বাছা মাঝে মাঝে অধীরকে চিঠি দিয়ে দুটো ভাল কথা লিখে নেমন্তন্ন করো। জানই তো, আজকালকার শিক্ষিত ছেলে, ওসব বড়ই ভালবাসে।

আশার আলো দেখতে পেয়েছেন পিসিমা। বটার মাকে বলেন—ঠিক, আমি যা ভাবছি তাই হয়েছে বটার মা। ভগবান বুঝি এতদিনে কৃপা করলেন।

পিসিমা অধীরের কাছে এসে খুশিভরা কণ্ঠে বলেন—কি রে ভাই ?

অধীর—তুমি কি চাও যে, আমি বিয়ে করি ?

—নিশ্চয়ই ।

—তবে শোন ।

পিসিমা এইবার যেদিন আসবেন সেদিন একেবারে শুভসংবাদ সঙ্গে নিয়ে আসবেন। উপেন আর চারুকে এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন পিসিমা। আর দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু অধীরের সম্মতির কথা নিয়ে কবে আসবেন পিসিমা, এই কথাই উৎসাহিতভাবে আলোচনা করেন উপেন আর চারুবালা। এবং হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখতে পান, সত্যিই পিসিমা আসছেন। অধীরও সঙ্গে আছে।

রমার পড়ার ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে থাকে অধীর, পিসিমা ধীরে ধীরে গম্ভীর মূর্তি নিয়ে উপেনের কাছে এগিয়ে আসেন।

উপেন বলেন—পিসিমাকে স্মরণ করা মাত্র যখন পিসিমা উপস্থিত হয়েছেন, তখন বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই শুভসংবাদ আছে।

তিক্ত ও কঠিন মুখ নিয়ে পিসিমা বলেন—হ্যাঁ শুভসংবাদ। আমাকে যখন ঠাকুর ঘরে ঢুকে বলতে হয়েছে··· ।

—কি ?

—বলিয়ে ছেড়েছে গো। অধীরের বিয়ের কথা ঠাকুরকে নিবেদন করতে হয়েছে। ঠাকুরের কৃপা চাইতে হয়েছে। চাইয়ে ছেড়েছে গো !

উপেন আর চারুবালা উৎসাহিত হয়ে হাসতে থাকেন। কিন্তু পিসিমার চোখ হতাশ উদাস ও বিষণ্ণ। পিসিমা হাঁপ ছেড়ে বলেন—অধীর বিয়ে করবে বলেছে।

চারু—দিনক্ষণের কথা ?

পিসিমা—তা জানি না, একটা দিন হলেই হলো।

চারু—পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ভাল ছিল।

পিসিমা—কিসের পরীক্ষা ?

চারু—রমার !

পিসিমা—রমার পরীক্ষা রমা দিক না কেন। অস্থির তো পরীক্ষা টরীক্ষা নেই।

চারু চেঁচিয়ে উঠেন—তার মানে অস্থি ? অস্থি মানে কি ?

পিসিমা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন—অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

পিসিমার কথা শোনামাত্র নিস্তব্ধ হয়ে আর শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন উপেন আর চারুবালা। পিসিমাকে এক অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতিকার মত মনে হয়। কিন্তু দেখা যায়, ভীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন পিসিমা।

চারুবালা বলেন—কিন্তু অধীর যদি জানে যে অম্বির জাতটা কি, তাহলে নিশ্চয়ই···।

পিসিমা বলেন—সে কি আর জানতে কিছু বাকি আছে। সবই জানে। যার জানাবার সেই জানিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত! অধীর কি বলে শুনবে? বলে, অম্বি তো এখন উপেনবাবুরই মেয়ে।

উপেন—তবে আপনার আর কি জানবার আছে?

পিসিমা—আমার কিছুই জানবার নেই। নাতি শুধু জানতে চায়, অম্বি রাজী আছে কি না।

চারুবালা—ধিক্কারের সুরে চেঁচিয়ে ওঠেন ওর রাজী হতে কি আর বাকি আছে না কি? জেনে শুনে ইচ্ছে করেই এই কাণ্ড করেছে। রাজী হয়েই আছে।

পিসিমা—তবু একবার অম্বিকে জিজ্ঞেস করে অধীরকে তোমরাই জানিয়ে দিও। আমি আর এর মধ্যে নেই। আর এই নাও।

অম্বির বিয়ের সেই পাতি-পত্র উপেনের হাতের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে পিসিমা চলে গেলেন, পৃথিবীকে ধিক্কার দিতে দিতে, সংসারের অদ্ভুত অনিয়মগুলিকে অভিশাপ দিতে দিতে।

বাইরের বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন পিসিমা। চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর কাঁদলেন। পিসিমার মনের রাজ্যেও যেন একটা ওলট-পালট হয়ে গেল হঠাৎ।

শ্যামবাজারের বাড়িতে আর ফিরলেন না পিসিমা। তাঁর নিজের মনের হীনতাকেও আজ যেন দেখতে পেয়েছেন পিসিমা, তাই নিজেকেই অশুচি বোধ করছেন।

মনে পড়ে পিসিমার, অধীরের সেই কথাগুলি, তোমার কোম্পানির কাগজগুলি কাড়তে চাই না, কিন্তু তোমার আশীর্বাদ কাড়তে চাই।

আবার ফিরে আসেন পিসিমা। নিস্তব্ধ উপেন আর চারুবালার কাছে এসে একটি কাগজের প্যাকেট সঁপে দিয়ে বলেন—এগুলি তোমার কাছেই রাখ।

উপেন আতঙ্কিতের মত তাকান—কেন ? পঞ্চাশ-হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, এসব কার জন্য ?

পিসিমা—অম্বিকে দিয়ে গেলাম। যখন হার মেনেছি, তখন ভাল করেই হেরে যেতে চাই। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি এখন কাশী যাব, তারপর কোথায় যাব জানি না।

চলে গেলেন পিসিমা।

এবাড়ির অন্তরে যেন এক ভয়ংকর পরাভবের অপমান রেখে দিয়ে পিসিমা সরে পড়লেন। বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে শুধু সহ্য করবার চেষ্টা করেন উপেন ও চারুবালা। এ কি কাণ্ড ? কোন্ নিয়ম ? রমাকে পছন্দ না ক'রে অম্বিকে পছন্দ করে, এ কোন্ প্রেমের চক্ষু ? শিক্ষিত উচ্চবংশীয় অধীর শিক্ষা দেখলো না, বংশও দেখলো না ? রূপও দেখলো না ? তবে দেখলো কি ?

প্রথমে অধীরের কথা আলোচনা করেন। অধীরের উপর শুধু অভিমানের মত একটা অভিযোগ ব্যথা দেয় চারুবালাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, অধীরের দোষ নয়। দোষ যার, অলক্ষ্যে দংশন দান ক'রে এই বাড়ির এতদিনের স্নেহের শোধ দিল যে সাপিনী, সে-ই মনের উল্লাস লুকিয়ে ঐ ঘরে বসে রয়েছে। পরের মেয়ে, একটা অজাতের মেয়ে এইভাবে এতদিনে কৃতজ্ঞতার শোধ দিল। আড়াল থেকে ছলনার জোরে একটা ভাল ছেলের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। রমা পারবে কেন ঐ সাপিনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ? বড় জাত আর ছোট জাতের পার্থক্য এই।

কি আশ্চর্য ! বলতে বলতে উপেন ছটফট করেন। যেন এই সর্বনাশটুকু করবার জন্যই ধীর স্থির শান্ত অথচ হীন একটা হিংসা একটা বাচ্চা মেয়ের মূর্তি ধরে এই পরিবারের বুকের কাছে দেখা দিয়েছিল। বাইশ বছর ধরে বড় হয়ে, এতদিনে তৃপ্ত হয়েছে এই হিংসা। তাদের নিজের মেয়েকে পৃথিবীর কাছে ছোট ক'রে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই হিংসাটা।

—মেয়ের মত নয়। সাপের মত। চিৎকার করে ওঠেন চারুবালা।

—ভুল হয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন। তারপরেই নিজেকে সংযত করে বলেন—যাক, আর দেরী করা উচিত নয়। অম্বিকে জানিয়ে দাও, জিজ্ঞাসা ক'রে নাও, তারপর নিঃশব্দে বিদায় ক'রে দাও। আমাদের আর চিৎকার ক'রে লাভ কি ?

কিন্তু চিৎকার ক'রে ওঠেন চারুবালা। কিন্তু আমাকে বাদ দাও। ও

মেয়েকে চেলির জোড়ে সাজিয়ে দিয়ে আমি উৎসব করতে পারবো না। আমার হাতে মঙ্গল-ঘট সাজানো চলবে না। আমি উলু দিতে পারবো না, আমি আশীর্বাদ করতে পারবো না। আমি ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, তুমি এই সাপের মতকে বিদায় ক'রে দিয়েছো।

ঘর থেকে ছুটে বের হলেন চারুবালা। কিন্তু অম্বি শুনতে পেয়েছে আম্মির আক্ষেপের কঠোর ভাষাগুলি। শুনে চমকে উঠেছে।

ছুটে আসে অম্বি। এবং চারুবালাকে ছুটে যেতে দেখেই বাধা দিয়ে ডাক অম্বি—আম্মি।

—চুপ! চুপ। আমি কারও আম্মি নই। সাপের মত তুই, রক্তে বিষ আছে তোর।

ছুটে যান চারুবালা। অম্বি আর্তনাদ ক'রে পিছু পিছু ছুটে যায়—আম্মি। আম্মি।

কিন্তু সর্বনেশে এক আঘাতের বেদনায় তীক্ষ্ণ স্বরে অম্বির গলা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। ভাঙা সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গিয়েছেন চারুবালা। ছুটে আসে রমা আর উপেন আর অধীর।

অচেতন ও দুর্বল অসাড় দেহ নিয়ে বিছানার উপর পড়েছিলেন চারুবালা।

অধীরের টেলিফোনের ডাক শুনে ছুটে এসেছেন অধীরের ডাক্তার বন্ধু। মাথায় আঘাত পেয়েছেন চারুবালা। ডাক্তার বলেন—রক্ত চাই। 'বি' টাইপ রক্ত।

কিন্তু চাইলেই, এবং টাকা খরচ করতে তৈরি হলেও রক্ত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হলো। ডাক্তারের টেলিফোনের জিজ্ঞাসার উত্তরে রক্তব্যাঙ্ক সংক্ষেপে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানিয়ে দেয় স্টক-এ এখন সব টাইপের রক্ত নেই। 'এ' আছে 'এ-বি' আছে, আর 'ও' আছে। 'বি' একেবারেই নেই। চিন্তায় পড়লেন ডাক্তার। চলে গেলেন, এবং ফিরে এলেন রক্ত আহরণ ও সঞ্চার করবার যন্ত্রসজ্জার সঙ্গে নিয়ে।

আর দেরী করলে চলবে না। এই মুহূর্তে রক্ত সঞ্চার করতে হবে চারুবালার দেহে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রক্ত দেবার জন্য উপেন এগিয়ে আসেন। ডাক্তার আপত্তির ভঙ্গীতে বলেন, আপনি বুড়োমানুষ, আর কেউ নেই?

কিন্তু উপেনের অনুরোধে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেই বলে—চলবে না।

রমা এগিয়ে আসে। রমার রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে দেখে মন্তব্য করেন

চলবে না। আর কেউ নেই? দেরি করলে চলবে না না। কুইক।

অম্বি এগিয়ে আসতেই উপেন চমকে উঠে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অম্বি বাধা মানে না। অম্বির দুই চক্ষুর কঠোর দৃষ্টি দেখে উপেন হঠাৎ কুণ্ঠিত ভাবে চোখ ঘুরিয়ে নেন।

অম্বির দেহের উপরেব ডাক্তারের শোণিতগ্রাহী যন্ত্র পিপাসিতের মত মুখ এগিয়ে দেয়। রক্তের নমুনা পরীক্ষা ক'রে খুশী হয়ে ওঠে ডাক্তারের চক্ষু। মিল মিল পাওয়া গিয়েছে। এই তো, সুন্দর 'বি' টাইপ রক্ত! অম্বির রক্তের কণিকা চারুবালারই রক্তের কণিকার একই মাত্রার উত্তাপ দিয়ে গড়া।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেন—সুন্দর মিলে গেছে। চলবে। কিন্তু আপনার শরীরও যে দুর্বল মনে হচ্ছে। অনেকখানি রক্ত টানতে হবে, ভয় করছে না তো?

অম্বি বলে—আপনি আর একটুও দেরি করবেন না ডাক্তারবাবু।

কি আশ্চর্য, অম্বির সারা মুখে কি-যেন এক পরম তৃপ্তির আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

অম্বির দেহ থেকে রক্তধারা আহরণ করে ডাক্তার। তারপর অন্য ঘরে গিয়ে সংজ্ঞাহীন চারুবালার দেহে রক্ত সঞ্চার করেন। সমাপ্ত হয় ডাক্তারের কাজ।

যাবার সময় খুশী হয়ে বলে যান ডাক্তার। আর আশঙ্কা করবার কিছু নেই।

ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করেন চারুবালা। উপেন বলেন—এ কি রকম ব্যাপার হলো? এ কেমন রক্তের মিল?

অধীর—আপনি কি আশ্চর্য হয়েছেন?

উপেন—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মিললো না, রমার সঙ্গে মিললো না, মিললো গিয়ে…

অধীর মৃদু হাসি হাসে।—আপনি কি মনে করেন, রক্তের মধ্যেও জাত আছে?

চারুবালা হঠাৎ চোখ মেলে তাকান—কি বলছো তোমরা?

অধীর বলে—আচ্ছা, আমি এবার আসি।

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায় অধীর।

চারুবালা—কি কথা বলছিল অধীর?

উপেন বলেন—অধীর নয়, আমিই বলছিলাম। আবার একটা অপমান সইতে হলো চারু।

—কি ? কে অপমান করলো ?

— অম্বি। অম্বির রক্তের মধ্যে ডাক্তার তোমার রক্তের মিল খুঁজে পেয়েছে।

—কি ? অম্বি রক্ত দিয়েছে ? উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করেন চারুবালা।

উপেন— হ্যাঁ।

চারু—কেন ?

উপেন—কেন জানি না। জানে অম্বি, জানেন তোমার ভগবান, জানে এই সংসারের যত অদ্ভুত অনাসৃষ্টির নিয়ম-কানুন। শুধু তুমি জান না, আর আমি জানি না।

অবসন্নের মত আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়েন চারুবালা। চারুবালার চোখ ছলছল করে।

উপেন বলেন—হার হলো, সব দিক দিয়ে হার হলো চারু। অম্বি দেনা শোধ ক'রে দিল, আর ওকে বলবার কিছু নেই, ওর কথা ভুলে যাও।

চারুবালা বলেন—হ্যাঁ, ভুলেই যেতে চাই।

যেন নরম হয়ে আসছে চারুবালার মনের কঠোর বিক্ষোভগুলি। চারুবালা ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলতে থাকেন—দোষ মেয়েটার নয়, দোষ আমাদের ভাগ্যের। এমনই হয়ে থাকে। দয়া ক'রে আমাকে বাঁচিয়েছে অম্বি, ওর ওপর রাগ করবার অধিকারও রইল না।

হঠাৎ প্রশ্ন করেন চারুবালা—অম্বি কোথায় ?

—ঐ ঘরে। ডাকবো ?

—না। তুমি জিজ্ঞাসা করে এস।

—কি ?

—আর কি চায় অম্বি ? আমাদের জব্দ করবার আর কোন শখ যদি থাকে মনে বলে ফেলুক এখনি।

উপেন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন।—দেখ, আর কোন কথা বলাই উচিত নয়। শুধু যেটুকু কর্তব্য আছে, তাই কর।

চারু—জিজ্ঞাসা করে এস, কবে বিদায় নিতে চায়। তারপর অধীরকে জানিয়ে দাও।

যাবার আগে অম্বির বিছানার কাছেই এসে একবার দাঁড়ায় অধীর। অবসন্নভাবে যেন একটা তন্দ্রা চোখে নিয়ে শুয়ে আছে অম্বি। অম্বিকে প্রশ্ন

করে অধীর—কি ব্যাপার ?

অগ্নি—আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে অধীরবাবু, আমি বিশ্বাস করি। আর আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ কি জানেন, আমি এখনও বেঁচে আছি।

অধীর—কথার অর্থ ?

অগ্নি—আমিই আগ্নির এই কষ্টের কারণ, আপনি পিসিমাকে বৃথাই পাঠিয়েছেন, আমি বিয়ে করবো না।

অধীর—তাহলে আমাকে তোমার আর বলবার কিছু নেই ?

অগ্নি—আছে।

অধীর—বল।

অগ্নি—আমাকে ঘেন্না করে চলে যান, আর আপনি সুখী হোন।

অধীর—চলে যাচ্ছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, তোমাকে ঘেন্না করে যেতে পারলাম না। আমি তোমাকে ভালবেসে ভুল করিনি, কিন্তু তুমি আমাকে ভালবেসে ভুল করেছো।

অগ্নি—হ্যাঁ, ভুল করে ভালবেসেছি অধীরবাবু, বুঝতে পারিনি।

অধীর হাসে।—তুমি নিশ্চিন্ত হও অগ্নি, দুঃখ করো না, তোমার সেই ভুলের কথা ভেবেই আমি সুখী হতে পারব। এ ছাড়া সুখী হবার আর কোন পথ নেই।

অগ্নি দুহাতে চোখ ঢাকা দিয়ে বলে—ভুলে যাও।

উত্তর না পেয়ে আরও ব্যাকুল হয়ে অগ্নি বলতে থাকে।—তুমি সুখী হবে, রমাকে বিয়ে কর। আমার কথা রাখ।

অগ্নির চিঠিকে দুমড়ে মুচড়ে অগ্নির বিছানার উপর ফেলে দেয় অধীর।—এই অনুরোধ ক'রে বৃথা আমাকে অপমান করো না অগ্নি। রমা বেচারাকে ঠকাবার পরামর্শ আমাকে দিও না। তার চেয়ে ভাল, আমিই জীবনে ঠকে যাই।

চলে যায় অধীর। কিন্তু অগ্নি বুঝতে পারে না যে অধীর চলে গিয়েছে। অগ্নি বলে—কিন্তু আমাকে ক্ষমা করে যাও। আগ্নি আর আগ্নির মুখের হাসি নষ্ট করতে পারবো না আমি, আমার এই দুর্বলতা ক্ষমা কর।

দরজা পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ান এবং শুনে চমকে ওঠেন উপেন। এ কি ? কার সাথে কথা বলছে অগ্নি।

শুনতে থাকেন উপেন, অধীরের পায়ের শব্দ হনহন ক'রে বাইরে বারান্দার উপর দিয়ে যেন ছুটে চলে যাচ্ছে।

বাইরের অন্ধকার থেকে একটা দমকা বাতাস ঘরে এসে ঢোকে। ফরফর ক'রে দুমড়ানো একটা চিঠি ঘরের ভিতর থেকে উড়ে এসে উপেনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে।

চমকে ওঠেন উপেন। চিঠি পড়েন উপেন। চিঠির ভাষা বলছে—তুমি ভুল করো না, রমাকে বিয়ে কর, তাহলেই আমি সুখী হবো।

পড়েই বিস্ময়ের অপলক চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে থাকেন এবং পরমুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে উপেন চেঁচিয়ে ওঠেন—হেরেছি চারু, সত্যই হেরে গিয়েছি। অম্বির কাছে আমাদের জীবনের সব ভুলের অহংকার হার মেনেছে।

চিঠি পড়েন, উঠে বসেন এবং চোখ বন্ধ করেন চারুবালা।

উপেন বিচলিত হয়ে বলে—বল চারু, একি মেয়ের মত একটা প্রাণের কথা, না মেয়ের চেয়েও···

চারুবালা—দেখ এখন, স্বীকার কর, যাকে মেয়ে বলে মানতে ভয় করেছিলে, সে-ই তোমার মেয়ের চেয়েও··।

উপেন ব্যাকুলভাবে বলতে থাকেন—হেরে মেনেছি চারু। মানতেও বড় আনন্দ হচ্ছে, অম্বি আমাদের ফাঁকি ধরিয়ে দিয়েছে। অম্বি! অম্বি!

উপেন ছটফট করতে করতে অম্বির ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ান, তারপর ডাক দেন—আয়। একবার কোনমতে কষ্ট ক'রে তোর আম্মির কাছে আয় অম্বি।

অপরাধিনীর মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চারুবালার বিছানার কাছে দাঁড়ায় অম্বি! চারুবালার চোখ দুটো ঝকঝক করে। অপলক চোখে অম্বির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই হঠাৎ, জলে ভেজা রোদের মত এক ঝলক স্নিগ্ধ হাসির আভা ফুটে উঠে চারুবালার চোখ-মুখ জুড়ে যেন থমথম করতে থাকে। চারু বলেন—অধীর তোকে বিয়ে করতে চায়। তুই রাজী আছিস তো?

অম্বি বলে—না।

—কেন?

—অমি বিয়ে করতে চাই না।

—কেন?

—রমার বিয়ে হোক।

—কিন্তু তোরও তো বিয়ে হওয়া চাই।

—না চাই না।! আমি যে তোমাদের···।

—বল, চুপ করে রইলি কেন ? বল, তুই আমাদের কে ?

কেঁদে ফেলে অম্বি—আমি তোমাদের মেয়ের মত, চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকতে চাই। আমি চলে গেলে তোমাদের দেখবে কে বল ?

বেদনাভরা লজ্জায় আঘাতে আহত হয়ে চমকে ওঠেন চারুবালা ও উপেন।

উপেন বলেন—আমাদের অনেক ভুল হয়েছে অম্বি, কিন্তু তুইও এখন ভুল করছিস। বিয়ে তোকে করতেই হবে, এবং অধীরের সঙ্গেই হবে।

—কেন আপ্পি ?

উপেন—কেন আবার কি ? আমরা হাসতে চাই, আবার কাঁদতেও চাই ! তোকে সুখী করতে চাই, আবার তোকে ছেড়ে দেবার দুঃখে কষ্ট পেতেও চাই। তুই তো বুঝবি না, এ কেমন দুঃখ। তুই যে আমাদেরই ·।

—আপ্পি ! চেঁচিয়ে ওঠে অম্বি। উপেনের মুখের দিকে জলভরা দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে যেন বিদ্রোহিনীর ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন শেষ বোঝাপড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে অম্বির সমস্ত অন্তর। উপেনের মুখের ঐ ভাষাকে সহ্য হয় না। হাত দিয়ে উপেনের মুখ চেপে ধরে অম্বি—বলো না আপ্পি, আর ওকথা বলো না· সহ্য করতে পারবো না।

চারুবালা—শোন অম্বি।

উপেন—আরে, তুই যে আমদেরই মেয়ে।

শুনে শিউরে ওঠে, তারপরেই যেন স্তব্ধ হয়ে উপেনের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে অম্বি। তারপরেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে চারুবালার পিঠের উপর মুখ লুকোয় অম্বি, গুণগুণ ক'রে কাঁদতে থাকে। সারা জীবন উৎকর্ণ হয়ে ছিল অম্বির প্রাণ যে সত্যের ঘোষণা শোনবার জন্য, এতদিনে এই অদ্ভুত এক লগ্নে সেই সত্যের ধ্বনি শুনতে পেল অম্বি। মেয়ের মত নয়, আমাদেরই মেয়ে। আঃ সারা জীবনের একটা অভিমানের জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

চারুবালা অনুযোগ করেন—ছিঃ, এ কি করছিস অম্বি ? সব মেয়ের বিয়ে হয়, বাপ-মাকে ছেড়ে থাকতেও হয়।

অকস্মাৎ রমা বিস্মিত চক্ষু নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে—একি ? অম্বি কাঁদছে কেন ?

চারুবালা হাসেন—বিয়ের কথা শুনে কাঁদছে।

রমা আশ্চর্য হয়—বিয়ে ? কার বিয়ে ?

চারু—অম্বির।

রমা—কার সঙ্গে।

চারু—অধীরের সঙ্গে।

ঝক্ ক'রে হেসে ওঠে রমার কৌতুকদীপ্ত দুই চক্ষু। রমা বলল—তোমরা বিশ্বাস করছো বুঝি, অম্বি কাঁদছে?

চারুবালা বলেন—চুপ কর তুই।

রমা—আমি বলছি হাসছে, নিশ্চয়ই হাসছে।

এগিয়ে এসে জোর করে অম্বির মুখ তুলে ধরে রমা। হ্যাঁ, অম্বির চোখ সত্যিই জলভরা; কিন্তু তারই মধ্যে দেখা যায়, অম্বির দুই ঠোঁটে যেন এক কৃতার্থ জীবনের হাসি সলজ্জ আভাস দিয়ে ফুটে উঠেছে। যেন একটা শিশুর কচি মুখের হাসি; যেন বহুদূর হতে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বাপ-মার কোলের কাছে লুটিয়ে পড়েছে, আর সেই আনন্দ সইতে না পেরে হেসে উঠেছে।

অম্বির মুখের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রমা হাসে—আমি আগেই জানতাম।

সীমন্ত সরণি

যাঁরা এই সেদিনও বলেছেন, এণাক্ষীর মত ভাগ্যবতী মেয়ে খুব কমই দেখা যায়, তাঁরাই এখন বলছেন, এণাক্ষীর মত দুর্ভাগ্য যেন কোন মেয়ের না হয়, সে মেয়ে যেমন মেয়েই হোক না কেন।

শুধু পাড়ার মহিলারা নয়, বাড়িতে যাঁরা আছেন, এণাক্ষীর মাথার সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে যারা চির এয়োতি হও বলে আশীর্বাদ করেছিলেন, সেদিনের আশীর্বাদ-মুখর সেই সব মহিলারাও মুখভার করে বলাবলি করেন, কে জানে লগ্নের মধ্যে কোন দোষ ছিল, কিংবা কার চোখের নজরে কোন হিংসার বিষ ছিল, যে জন্যে মেয়েটার এই দশা হলো।

বিয়ের পর নতুন জামাই শুধু একটি দিনের জন্য এসেছিল, আর জ্বর গায়ে নিয়ে সেই যে চলে গেল, সত্যি চলেই গেল। জামাই-এর চিঠি আর এল না। সাতদিন পরে এল শুধু একটা টেলিগ্রাম। কী নিষ্ঠুর সংবাদ স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিলো সেই টেলিগ্রামের হিজিবিজি লেখা। মনোময় আর নেই, সাতদিনের অসুখের পর শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে চিরকালের মত নীরব হয়ে গিয়েছে মনোময়।

পাড়ার মানুষ শুনলো, নিশিকান্তবাবুর জামাই মারা গিয়েছে। এণাক্ষীর মা কিন্তু আর শুনতে পেলেন না, বিধবা হয়েছে তাঁর আদরের মেয়ে, একটি মাত্র মেয়ে এণা! কারণ, তিনি তিন বছর আগেই, শুধু মনোময়ের সঙ্গে এণার বিয়ের আশার কথাটা শুনেই চিরকালের মত চলে গিয়েছেন।

খবর শুনে নিশিকান্তবাবুর বাড়িতে করুণ কান্নার ঝড় উথলে দিলেন যাঁরা, তাঁরাও সবাই বিধবা! একজন দুজন নয়, সব শুদ্ধ পাঁচজন! এণাক্ষীর দুই পিসি, এক জেঠি, এক মাসী, আর এক খুড়িমা।

হাজারিবাগের নবাবগঞ্জের এক কিনারায় নিশিকান্তবাবুর এই বাড়িটাকে অনেকেই ঠাট্টা করে থাকে। বাড়ি তো নয়; একটা বিধবা মহল। তবু এণাক্ষীর মা ভাগ্যটাকে ভাল বলতে হবে; বেচারা এরকম একটা বিধবামহলে জীবনের অনেকদিন পার করে দিয়েও সধবাজীবন নিয়েই সরে পড়তে পেরেছে।

এইবার কিন্তু বিধবামহল নামটা বর্ণে বর্ণে সার্থক হলো। একটি মাত্র মেয়ে, যার আসছে মাসেই শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার কথা ছিল, তার জীবনটা এখানেই থমকে পড়ে রইল। এণাক্ষীও আজ বিধবা। ঐ পাঁচজন বিধবা মহিলার মত এণাক্ষীর সিঁথিটাও আজ শূন্যতার সাদা বরণ করে নিয়েছে। টেলিগ্রাম এল যেদিন, সেদিনই সিঁদুরের কৌটা পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

ঐ তো, একটি মাত্র সিঁদুর কৌটা ছিল এই বাড়িতে। এটা অবশ্য এক বছর আগের একটা আবির্ভাব। এণাক্ষীর বিয়ে হয়েছে, ঘটনাটার বয়স এক বছরের বেশি নয়।

এই এক বছরের মধ্যে এণাক্ষীর শ্বশুরবাড়ি যাবার কোন কথা ওঠেনি। এণাক্ষীর শ্বশুরবাড়ি থেকে মনোময়ের বাবা হৃষীকেশবাবুও লিখেছিলেন, এখন আর এখানে এণার আসবার কোন দরকার নেই। এখন হাজারিবাগেই থাকুক এণা। এখন এখানে এলে এণার কিছুই ভাল লাগবে না; আমাদেরও মনে কষ্ট হবে। জেল থেকে খালাস পেয়ে ফিরে আসুক মনোময়। তারপর মনোময় নিজেই গিয়ে এণাকে নিয়ে আসবে।

বিয়ের উৎসবটা হাজারিবাগের এই বাড়িতেই হয়েছিল। ফুলশয্যাটা বরের বাড়িতে। ফুলশয্যার উৎসবের ঘরে একগাদা বউদির বাচালতা নীরব হতে হতে রাতটাই ভোর-ভোর হয়ে গিয়েছিল। সকালবেলা, যখন ফুলশয্যার ফুল শুকোয়ওনি, তখনই স্বপ্নালু তন্দ্রার আবেশ আচমকা ছিঁড়ে দিয়ে মনোময়কে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। আর সময় নেই, এখনি রওনা হতে হবে। আজ সকালের ট্রেনেই! আজ মনোময়ের মামলাটার তারিখ। আদালতে আজই হাজির হতে হবে।

একটা বই লিখে রাজদ্রোহ করেছে মনোময়; সেই জন্যে এই মামলা। ব্রিটিশ সিংহকে রক্তলোলুপ ক্রুর বলেছে বইটা। তিন মাস আগেই গয়ার একটা লাইব্রেরী থেকে আর মনোময়ের বাড়ি থেকে সব বই গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। মনোময়ও গ্রেপ্তার হয়েছিল, তারপর জামিনে ছাড়া পেয়েছিল।

কি দরকার ছিল এখনই বিয়ে করবার? মামলার রায় বের না হতেই বিয়ে করবার জন্য মনোময় এত ব্যস্ত হয়ে উঠলোই বা কেন! শুধু জরিমানা নয়, কয়েকমাসের সশ্রম কারাবাস যে অবধারিত, এটা অনুমান করা মনোময়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। উকিলবাবু তো বললেনই, একেবারে রেহাই পাবে না মনোময়; শুধু জরিমানাও নয়। মনে হচ্ছে অন্তত দুটো বছর ঠুকে দেবে। জজমশাই হালে রায়বাহাদুর হয়েছেন, রাজভক্তি দেখাবার সুযোগটা ভাল করে সার্থক না করে ছাড়বেন না। দেখি, চেঁচামেচি করে রায়বাহাদুরী মনটাকে একটু ঘাবড়ে দিয়ে মেয়াদটা এক বছরের মত করাতে পারি কিনা।

তবে এরকম একটা তাড়াহুড়ো ব্যাপার করে বিয়েটা হয়ে গেল কেন?

তাড়াহুড়োর হেতু মনোময় নয়, মনোময়ের ইচ্ছের কোন ব্যস্ততাও নয়। মনোময় তো জানেই, এণাক্ষীর সঙ্গে জীবনের পরিণয় হয়েই গিয়েছে। মন্ত্রপড়া বিয়েটা একদিন হয়েই যাবে। দু'বছর ধরে ভালবাসার আনন্দে এণাক্ষী যে মনোময়ের মনের সঙ্গিনী হয়েই গিয়েছিল। শুধু বিয়েটা বাকি। সে জন্যে আরও কিছুদিন অপেক্ষার কষ্ট অনায়াসে সহ্য করা যায়।

তাড়াহুড়োর হেতু হল এণাক্ষী। এণাক্ষীর অধৈর্য। এণাক্ষীরই ইচ্ছার একটা অশান্ত আক্রোশ। না, আর অপেক্ষা করবার কোন মানে হয় না। দু'বছর ধরে চুপ করে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে এণাক্ষী। মনোময়ের একটা চাকরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল, মনোময়ের এই উপদেশ মেনে নিতে আপত্তি করেনি এণাক্ষী। কিন্তু আর নয়, চাকরি তো হয়েছে। অশোক অ্যাকাডেমির হেডমাষ্টার হয়েছে মনোময়!

এণাক্ষী জানতো, নিশিকান্তবাবুও জানতেন, মনোময়ের জীবনে চাকরি করবার কোন দরকার হয় না। গয়ার বিখ্যাত বাঙালী জমিদার হৃষীকেশবাবুর বিষয় সম্পত্তির বিপুলতার কাহিনী কে না শুনেছে? এহেন জমিদারের একমাত্র ছেলে যদি চাকরি করতে চায় তবে সেটা যেন একটা সখের বাতিক বলেই সন্দেহ করতে হয়। এণাক্ষীও বলেছিল—এটা তোমার অদ্ভুত বাতিক; একটা খামখেয়াল।

মনোময় বলেছিল—না এণা, বাতিক নয়, খামখেয়ালও নয়। আমি একটা মনুষ্যোচিত পরিচয় পেতে চাই।

—তার মানে?

—তুমিও ভেবে দেখ। লোকে বলবে, এক জমিদারপুত্রের সঙ্গে এণাক্ষীর বিয়ে হয়েছে; শুনতে কি তোমার খুব ভাল লাগবে? আমি কি জমিদারপুত্র? আমার মনুষ্যত্বের আর কোন পরিচয় নেই?

হেসে ফেলেছিল এণাক্ষী, মনোময়ের কথা শুনতে ভালই লেগেছিল—বেশ তো, আমি তাড়াহুড়ো করবো না; কিন্তু একটা চাকরি-টাকরি পেতে তুমি একটু তাড়াহুড়ো করবে।

—নিশ্চয়। আশ্বাস দিয়েছিল মনোময়।

তিন বছর আগে ঘোর বর্ষার একটা দুর্যোগময় দিন, এক পান্থশালার বাতির আলোতে যার সঙ্গে প্রথম দেখা, তাকে সেই প্রথম দেখাতেই ভাল লেগেছিল এণাক্ষীর, যদিও খুব ভাল করে তার মুখটা দেখতে পায়নি। গয়া

থেকে হাজারিবাগে আসবার পথে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে চৌপারণ নামে বস্তিটার কাছে যে হলদে রঙের ডাকবাংলোতে শিকারীর ভিড় প্রায় লেগেই থাকে, সেই ডাকবাংলোর ঘরের কোণে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসেছিল এণাক্ষী। ভয়ে শুকিয়ে এসেছে মুখটা, যদিও গায়ের শাড়িটা বৃষ্টির জলে ভেজা। শাড়ীটা চবচবে হয়েই আছে, একটুও শুকোয়নি। বারান্দার উপর মানুষের ভিড়। কালো আদমির চেয়ে সাদা আদমিরই ভিড় বেশি। দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে একদল গোরা মিলিটারী এসেছে, এক হাতে রাইফেল, আর এক হাতে বুলেটের ব্যাগ, গোরা মিলিটারীরা চট-চট করে বুট ঠুকে বারান্দার উপর পায়চারি করে বেড়ায়। জঙ্গলের ভিতর কোথায় যেন ওদের শিকারের ক্যাম্প করা হয়েছে। একদল কুলি, মাচান বাঁধবার কাজে খাটছে যারা, তারাও এসে ভিড় করেছে ; তবে বারান্দার উপর নয়। বারান্দার সামনে কাঁকর ছড়ানো রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়ে কুলির দল ভিজছে।

এক একটা বিদ্যুতের ঝিলিক ; তার পরেই যেন আকাশ ছিঁড়ে খাওয়া একটা আক্রোশের গরগর গর্জন ; তারপরেই গলা মেঘের ঝরঝর কান্নার ঢল ঝড়ের বাতাসের মারে যেন আছাড় খেয়ে মাঠের মাটির আর জঙ্গলের মাথায় লুটিয়ে পড়েছে।

মোটর বাস এখন আর যাবে না। কখন যাবে তারও কোন ঠিক নেই বস্তির কাছে সড়কের উপর থম্‌কে আছে গয়া-হাজারিবাগ সার্ভিস বাস। কারণ অ্যাক্সেল ভেঙ্গেছে।

রাত্রি নটার আগে দ্বিতীয় কোন বাস্ আসারও সম্ভাবনা নেই। তাও এই ভয়ানক বৃষ্টির বাধা তুচ্ছ করে সার্ভিসের দ্বিতীয় বাস আসতে পারবে কিনা সন্দেহ।

অথচ, কি চমৎকার বিকালের আলোর মধ্যে গয়া থেকে রওনা হয়েছিল এই বাস! ছুটন্ত বাসের ভেতর বসে বুদ্ধগয়া মন্দিরের চূড়ের মূর্তিটাও কত স্পষ্ট দেখা গেল। শেরঘাটির তালকুঞ্জের কাছে বাসটা যখন থামলো, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যার আভাও কী সুন্দর রঙীন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিল আকাশের কোণে কোথাও কোন মেঘ-মেদুরতা ছিল বলে মনে পড়ে না।

গাড়ির আক্সেল ভাঙলো চৌপারণ বস্তির কাছে এসে, ঠিক যখন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় হতে সুরু করেছে, আর থমথমে মেঘে ভয়াল হয়ে উঠেছে আকাশটা।

গয়ার কাকার বাড়িতে আরও অনেকবার বেড়াতে এসেছে এণাক্ষী ; কি

কখনও একা একা মোটর বাসে যাওয়া আসা করেনি ; হাজারিবাগ থেকে পরিচিত কেউ না কেউ সঙ্গে এসেছে ; আর গয়া থেকে পরিচিত কেউ না কেউ সঙ্গে থেকে এণাক্ষীকে আবার হাজারিবাগ পৌঁছে দিয়েছে।

এই প্রথম, পরিচিত কাউকে সঙ্গে না নিয়েই গয়া থেকে হাজারিবাগ ফিরছে এণাক্ষী! কাকিমা আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু এণাক্ষীই কাকিমার আপত্তিকে শান্ত করে দিয়েছে।—অচেনা অজানা জায়গায় তো যাচ্ছি না। তা ছাড়া কত বারই তো হাজারিবাগ-গয়া করলাম ; নতুন কোন জায়গায় নয়। মাঝপথে কোথাও বাস বদল করবার দরকার হয় না। একা যেতে এত ভয় করবারই বা কি আছে ?

কে জানে কেন, বাবা খুব তাড়া দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছেন, যেন আর একটি দিনও দেরি না করে হাজারিবাগে ফিরে আসে এণাক্ষী। কেন, কিসের জন্যে এত তাড়া ? কাকিমাও চিঠি পড়ে আশ্চর্য হলেন, সেসব কিছুই চিঠিতে লেখেননি এণাক্ষীর বাবা। কাকিমা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন—আমার এই ভাসুরঠাকুর মশাইকে তো বেশ ভাল করে চিনি, ওরই তো দাদা। এটা ওদের বংশের অভ্যাস। কোন দরকার নেই, তবু তাড়া। ঘুমিয়ে পড়বার জন্য তাড়া দেয় আবার ঘুমিয়ে পড়লে উঠে পড়বার জন্য চেঁচিয়ে তাড়া দেয়। এই যে, তোমার কাকা ভদ্রলোক কদিন আগে টেলিগ্রাম করে আমাকে বর্ধমান থেকে তাড়িয়ে আনলেন, তার কারণ কি জান ?

—কি ?

—গয়ার অবস্থা খুব উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল।

—তার মানে ?

—খুব কলেরা দেখা দিয়েছিল।

কাকিমার কথা শুনে, তার মানে কাকার উদ্বেগ আর তাড়াহুড়োর গল্প শুনে হেসে ফেলেছিল এণাক্ষী। সন্দেহও হয়েছিল, বাবাও কি তবে এরকমই একটা নিতান্ত অনর্থক কারণে এণাক্ষীকে তাড়াতাড়ি হাজারিবাগে ফিরে যাবার জন্য তাড়া দিয়েছেন ? কোন উদ্দেশ্য নেই, তবু তাড়া, বাবার চিঠিটার সম্পর্কে এরকম অভিযোগ করতে ইচ্ছে হয় না, তবু মনের ভিতরে যেন একটা অভিযোগের ছায়া ছটফট করে। চিঠিটার শেষটা পড়তে একটুও ভাল লাগে না, বেশ একটু অস্বস্তিও হয়। মিছিমিছি সে লোকটার নাম আবার এই চিঠির মধ্যে উল্লেখ করে কেন বাবা ? জয়দেব গিরিডি গিয়েছে, বেশ করেছে ; এই সংবাদটা এণাক্ষীর কাছে একটা সংবাদই নয়। জয়দেবের অভ্রের খাদে একটা দুর্ঘটনা

হয়েছে, এই খবরও এণাক্ষীর জীবনের কোন দরকার নয়। দুর্ঘটনার খবরটা এস-ডি-ও'কে জানিয়ে দিলেই তো হয়। এণাক্ষীর কাছে লেখা চিঠিতে সে খবরের উল্লেখ না করলেও চলে।

হ্যাঁ, জানে এণাক্ষী, জয়দেবের সঙ্গে নানারকম কাজ-কারবারের কথা আলোচনা করেন নিশিবাবু। গিরিডি থেকে হাজারিবাগে এসে জয়দেবও একবার না একবার নিশিবাবুর সঙ্গে না দেখা করে পারে না। কিন্তু এণাক্ষীর ভাবতে একটুও ভাল লাগে না, জয়দেবের সঙ্গে নিশিবাবুর চেনা-শোনা সম্পর্কটা এত মাখামাখি ভাবের একটা সম্পর্ক হয়ে উঠেছে। ঐ ঢ্যাঙা চিমড়ে, আর শক্ত একটা মূর্তি, খাদ থেকে অভ্র তোলে আর অভ্র বেচে পয়সা করে; বয়সে নিশি-বাবুর অর্ধেক বয়সও নয় বোধহয়; এহেন জয়দেবের সঙ্গে নিশিবাবুর এত মাখামাখিই বা হয় কেন? চিঠিতে যদি ইচ্ছে করে জয়দেবের কথা লিখে থাকেন বাবা, তবে খুবই ভুল করেছেন বলতে হবে।

যাই হোক, নিশিবাবুর চিঠিটা, কিংবা নিশিবাবুর চিঠির ভাষাটা এখন এণাক্ষীর মনের কোন উদ্বেগ নয়। প্রশ্ন হলো, সারা রাতের মধ্যে বাসটা যদি নতুন অ্যাক্সেল পেয়ে আর মেরামত হয়ে আবার রওনা হতে না পারে, কিংবা দ্বিতীয় সার্ভিসের বাস এসে না পড়ে, তবে কি উপায় হবে? সারারাত কি এই ডাকবাংলোর এই বারান্দার এই চেয়ারের উপর বসে থাকতে হবে?

সত্যিই বসে থাকতে পারতো এণাক্ষী, আর মুখটা এরকম একটা ভয় কাতর ভাব নিয়ে এত শুকনো হয়ে যেত না, যদি ডাকবাংলোটা সত্যিই একেবারে নির্জন হতো। মানুষ আছে বলেই ভয় করছে এণাক্ষীর। আর এই মানুষগুলি সারা রাতের মধ্যে এখান থেকে নড়বে কিংবা সরবে বলেও বিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না। ড্রাইভারটা যদি এত ভদ্রতা না করে আর সহানুভূতি না দেখিয়ে এণাক্ষীর জন্যে ডাকবাংলোতে ঠাঁই না করিয়ে দিত, তবে বরং অন্যত্র এর চেয়ে একটু বেশি নিরাপদ বোধ করতে পারতো এণাক্ষী। হালুয়াই-এর দোকানটার দাওয়াটাতে মাটির মেজের উপরে চুপ করে বসে আর মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে, ঘি-এর কড়াই চাপানো দগদগে আগুনের উনোনটার দিকে তাকিয়ে রাতটা পার করে দিতে পারা যেত। হালুয়াই-এর বউটার সঙ্গেও মনের মত দুটো গল্প-টল্প করবার সুযোগ পাওয়া যেত; দেখে তো বেশ অল্পবয়সেরই মনে হলো বউটাকে।

এণাক্ষী না হয় ভয় পেয়েছে; কিন্তু দু'জন দেশী সাহেব, যাদের হাতে

বন্দুক আছে, যাঁদের শিকারী বলে মনে হচ্ছে; তাঁদের চেহারার মধ্যে এরকম একটা কেঁচো-কেঁচো কাতরতার ভাব কেন? এঁরাও কি ভয় পেলেন? দেশী সাহেব দুজন বারান্দার কোন চেয়ারেই বসতে সাহস পাচ্ছেন না। অথচ কত চেয়ার খালি পড়ে আছে। মিলিটারী সাহেবদের লাল মুখের হাসি আর কটমট-দৃষ্টি যেন দেশী সাহেব দুজনেরই একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। বারান্দা থেকে নেমে সিঁড়ির একটা ধাপের উপর দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃষ্টির ঝাপটা গায়ে লাগছে, তবু বারান্দার উপর উঠে দাঁড়াবার কোন চাড় নেই।

বুঝতে পেরেছে এণাক্ষী; আজ এখানে এত শিকারীর ভিড় কেন? গয়াতে থাকতেই, এই এক মাস ধরে দামুয়া নামে ঐ জঙ্গলটারই ভিতরে একটা অদ্ভুত রহস্যময় আবির্ভাবের নানা গল্প শুনেছে এণাক্ষী। গল্পগুলি হাজারিবাগ থেকে গয়া পর্যন্ত যত গাঁ গঞ্জ আর বস্তির জীবনে একটা কৌতূহলমধুর আতংক ঘনিয়ে তুলেছে। গল্পগুলির দৌড় বোধহয় দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছে। তা না হলে আজ মিলিটারী সাহেবগুলো এখানে এসে ভিড় করবে কেন?

একটা সিংহ দেখা দিয়েছে। প্রায় রোজই কেউ না কেউ সিংহটাকে দেখতেও পাচ্ছে। এই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কেশর, এত বড় হাঁ, একটা প্রচণ্ড সাদাটে জান্তবতা দামুয়া জঙ্গলের আশেপাশে ছুটোছুটি করছে।

রাতের বাস সার্ভিসের ড্রাইভার দেখেছে, চৌপারণ থানার চৌকিদার দেখেছে, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে গিয়ে বরহি বস্তির মুদিও দেখেছে। সন্ধ্যাবেলা তাড়ির হাঁড়ি নামাতে গিয়ে এক কানা পাশি তালগাছের উপরে চড়ন্ত অবস্থাতেই দেখেছে, সিংহটা তাল গাছের প্রায় গা ঘেঁষেই ছুটে চলে গেল। শিকারীরা দিনের বেলাতে ক্ষেতের কাদা আর নদীর বালুর উপর বিচিত্র পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়েছে, সত্যিই তো, এ তো বাঘের পায়ের দাগ বলে মনে হচ্ছে না।

জন্তুটা যে মোটেই বাঘ নয়, নিশ্চয়ই সিংহ, তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। কারণ জন্তুটার হিংস্রতার মধ্যেও মহত্ত্ব আছে। জঙ্গলের কাছাকাছি বুড়ো বটের ভিড়ের কাছে শীতলপুরে জেলা বোর্ডের যে হাসপাতালের বারান্দায় রোজই রাতের বেলায় একটা গ্যাসবাতি জলে, সেই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর গোয়ালটাকে দয়া করেছে সিংহটা, কিন্তু আস্তাবলটাকে ক্ষমা করেনি। গোয়ালের ভেতর ছিল শুধু একটা অসহায় কচি বাছুর। বাছুরটাকে কিছু বলেনি সিংহটা। কিন্তু আস্তাবলের ভেতর থেকে ডাক্তারবাবুর সেই টাট্টু ঘোড়াটাকে,

যেটা শীতলপুরের মেলায় ভিড়ের মধ্যে চাট্‌ ছুঁড়ে একটা বুড়ো ভিখিরীকে প্রাণে মেরে ফেলেছিল, সেটারই পিছনের পা দুটোকে সাংঘাতিক জখম করে চলে গিয়েছে সিংহটা।

পালকি-চড়া নতুন বর-কনেকে কিছু বলেনি সিংহটা; কিন্তু সাইকেল-চড়া মহেশ দারোগাকে তাড়া করেছিল। মহেশ দারোগা মানুষটা তো সুবিধের নয়। তিনকড়ি মাহাতো একটা মিথ্যে মামলার ভয় থেকে বাঁচবার জন্যে হালের একটা বড় মহিষ বেচে দিয়ে ঐ সাইকেলটা কিনেছিল, আর মহেশ দারোগাকে ঘুষ দিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কই? সিংহ শিকার করতে যাবার কোন উৎসাহ যে কারও হাবেভাবে দেখা যাচ্ছে না। সাহেবগুলো বাস্কেট খুলে বড় বড় মাংসের টুকরো বের করছে আর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কেউ বা আবার পকেটের ভিতর থেকে ছোট একটা বোতল বের করে মুখের ভিতরে তরলধারা ঢালছে আর ঢেঁকুর তুলে হাসছে। দুটো সাহেব আবার চায়ের সরঞ্জাম বের করছে! স্টোভ ধরাচ্ছে, জল গরম করছে।

এভাবে, এত অস্বস্তির মধ্যে আর এত ভয়ে ভয়ে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে শরীরটা যে সত্যিই কাঠ হয়ে যাবে।

বোধহয় পুলিশের কোন লোক; বর্ষাতি জড়ানো মূর্তি; টর্চের আলো ফেলে কাদাটে কাঁকরের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এসে ডাকবাংলোর বারান্দার সিঁড়ির উপর উঠে দাঁড়ালো; তারপর বারান্দার উপরে উঠে মিলিটারী সাহেবগুলোর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

একজন সাহেব শিস দিয়ে পুলিশের মত সেই লোকটাকেই ডাকলো মনে হলো। হাত তুলে নীচের সিঁড়ির ধাপগুলিকে দেখিয়ে দিয়ে লোকটাকে কি যেন বললে সাহেবটা। বোধহয় বারান্দা থেকে নেমে যেতে বলছে। কিন্তু লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে, এক পা-ও সরে না গিয়ে, আর বারান্দার উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের বর্ষাতিটা খুলে ফেললো।

বারান্দার দেয়ালের একটা আংটায় কেরোসিনের যে ল্যাম্প বাতিটা জ্বলছে, সেই বাতিটারই ঘোলা-ঘোলা আলোতে দেখতে পাওয়া যায়, লোকটা পুলিশ নয়। গায়ে উর্দি টুর্দিও নেই। কামিজ আর ধুতি পরা নিতান্ত বাঙালী গোছের এক ভদ্রলোক। বেশ অল্পবয়সের ভদ্রলোক বলে মনে হয়; কারণ ধুতির কোঁচাটা কামিজের পকেটে গোঁজা। শেষে বুঝতেও পারা গেল ভদ্রলোক

বাঙালীই। দেশী সাহেবদের দিকে তাকিয়ে বাংলাতে কথা বলা আরম্ভ করেই একবার চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক, তার পরেই হিন্দীতে আলাপ শুরু করলেন।

বেশ জোরে চেঁচিয়ে আর হেসে হেসে কথা বলাই বোধহয় ভদ্রলোকের অভ্যাস। যাই হোক, ভদ্রলোক চেঁচিয়ে কথা বলছে বলেই এতদূর থেকেও শুনতে পাচ্ছে এণাক্ষী, এত বড় সিংহ-রহস্যের কাহিনীটাকে যেন ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছেন ভদ্রলোক।

—শের নেহি, শের বাব্‌রভি নেহি; বিল্লীসে থোড়াসা উচা এক বুড্ঢা হুঁড়ার।

একটা সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন রাগী সিংহেরই মত গর-গর করে ওঠে।—হুঁড়ার? ইউ মীন হায়েনা? নো লায়ন?

—নো লায়ন।

দেশী সাহেব দুজন কিন্তু কাতর হাসি হেসে মিলিটারি সাহেবদের আপত্তির ভাবটাকেই সমর্থন করবার জন্য মাথা নেড়ে ভদ্রলোকের কথার প্রতিবাদ করে —নো নো, নেভার নেভার। ইট ইজ এ লায়ন স্যার।

সাহেব বলেন—কোন সন্দেহ নেই যে ওটা একটা লায়ন, মে বি লায়নেস। কিন্তু হায়েনা কখনও নয়।

ভদ্রলোক বলেন, তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, ওটা একটা বুড়ো হায়েনা। কে জানে কি কারণে, বোধহয় চামড়ার কোন রোগে গায়ের রংটা ধবল হয়ে গিয়েছে।

সাহেব বলেন—এরকম চোখকে ডাক্তার দিয়ে একবার পরীক্ষা করানো উচিত। গয়াতে কি চোখ স্পেশ্যালিষ্ট কোন ডাক্তার নেই?

ভদ্রলোক বলেন—ব্রেণ স্পেশ্যালিষ্ট ডাক্তার আছে।

—ওয়েল!

—ওয়েল!

একি? সাহেব যে মারমূর্তি ধরেছেন! আর ভদ্রলোকও যে কামিজের আস্তিন গুটিয়ে ফেলেছেন। আর, দেশী সাহেব দুজন সিঁড়ির ধাপ ছেড়ে দিয়ে একেবারে কাঁকরের উপর নেমে পড়েছেন।

কী সর্বনাশ! বারান্দার এখানে-ওখানে যতগুলো সাহেব ছিল, সবাই একসঙ্গে গোঁ ধরে আর মারমুখি হয়ে ছুটে গিয়ে ভদ্রলোককে ঘিরে ধরেছে।

এবার যে গুলি-গোলা চলবে। ভদ্রলোক যে একা-একা গোরা মিলিটারীর এই ক্ষেপা রাগের কামড়ে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন।

—আপনি এদিকে চলে আসুন। হঠাৎ আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে এণাক্ষী। চেয়ার ছেড়ে উঠে আর একটা হাত তুলে আতঙ্কিত আবেদনের একটা ইশারাও জানায় এণাক্ষী।

হ্যাঁ, এণাক্ষীর এই আতঙ্কের ডাক ভদ্রলোকের কানে পৌঁছেছে। চমকে উঠেছে ভদ্রলোক। মুখ তুলে এণাক্ষীর দিকেই তাকিয়েছে।

গোরা মিলিটারীর ক্ষিপ্ত মূর্তিগুলি হাত ছুঁড়ে আর ধমক দিয়ে যেসব কথা বলছে, তার সবটা না বুঝতে পারলেও কিছুটা বুঝতে পারে এণাক্ষী; যা মুখে আসছে তাই বলে ভদ্রলোককে গালাগাল দিচ্ছে ওরা। হে ভগবান, ভদ্রলোক যেন তাই বলে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে এতগুলো ক্ষেপার সঙ্গে · না, ভদ্রলোক যেন একেবারে হতভম্ব হয়ে আর স্তব্ধ হয়ে শুধু এণাক্ষীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

বারান্দার ক্ষিপ্ত গতিটা হঠাৎ যেন অচল অবস্থার মত থিতিয়ে পড়তে থাকে। একটা স্তব্ধতা থমথম করে। ভদ্রলোকের নীরবতা আর হতভম্ব ভাব দেখে গোরা মিলিটারীর ক্ষেপা রাগের গ্যাসও বোধহয় অনেকখানি উবে গিয়েছে।

তারপর আর কোন সমস্যার দৃশ্য দেখা যায় না। একেবারে হেঁটমাথা হয়ে আর আস্তে আস্তে পা চালিয়ে ভদ্রলোক এণাক্ষীর দিকে আসতে থাকে। হাঁফ ছাড়ে এণাক্ষী।

কিন্তু হাঁফ ছেড়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়েই যে আবার অস্বস্তি। অচেনা ভদ্রলোক একেবারে এণাক্ষীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। এইবার নিশ্চয় কোন একটা কথা বলবেন ভদ্রলোক, আর সেই কথার উত্তর দিতে হবে। যদি কোন কথা না বলে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন ভদ্রলোক, তবে তো আরও বিপদ। এণাক্ষীর কথা বলতে হবে। দুজনার কেউ কোন কথা না বলে দুজনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা যে তার চেয়েও বিশ্রী অস্বস্তি; সহ্য করাই অসম্ভব হবে।

কাছে এসে দাঁড়ান ভদ্রলোক। এণাক্ষী কিন্তু এবার আর কোন কথা বলতে পারে না। ভদ্রলোকের মুখের দিকে এবার আর চোখ তুলে তাকাতে পারে না। শুধু চেয়ারটা একহাত দিয়ে ছুঁয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আর বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অঝোর বৃষ্টির শব্দ শুনতে থাকে এণাক্ষী।

গায়ে চবচবে ভেজা শাড়ি জড়ানো, এণাক্ষীর সেই আতঙ্কিত একলা চেহারার অসহায়তা এত স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েও কোন কথা বললেন না ভদ্রলোক! একটু দূরে সরে গিয়ে ভদ্রলোকও বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কতক্ষণ ধরে এই অদ্ভুত অস্বস্তিটা সহ্য করতে হয়েছে, বুঝতে পারেনি এণাক্ষী। দ্বিতীয় সার্ভিসের বাসটা সত্যিই এল কিনা, জোর বৃষ্টির এমন ভয়ানক ঝমঝমে শব্দের মধ্যে তা'ও বোঝবার উপায় নেই, বাস এসে থাকলেও শব্দ শোনা যাবে না কিন্তু অ্যাক্সেল-ভাঙ্গা বাসের ড্রাইভার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছে, দ্বিতীয় বাস এলেই খালাসীকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেবে, এণাক্ষীর জন্য একটা সীট যোগাড় করে রাখবে।

এণাক্ষীর এই উৎকর্ণ অপেক্ষার প্রাণটাই যেন হঠাৎ একটা আর্তনাদ চাপতে গিয়ে মুখের উপর রুমাল চেপে কাঁপতে থাকে।

মাগো!

চারটে লাল মুখ এণাক্ষীর একেবারে চোখের কাছে এসে হাসছে। দেখতেই পায়নি এণাক্ষী, কখন ঐ চারটে মূর্তি বারান্দার ঐ-প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে চলে এল।

চারজন গোরার একজনের হাতে এক পেয়ালা গরম চা। হেসে হেসে এণাক্ষীকে চা সাধছে গোরাটা—গরম চা পিও, গুড গার্ল!

এণাক্ষীর সেই মুহূর্তের আতঙ্কিত দৃষ্টিটাও চকিতে দেখতে পায়, সেই চারটে কটকটে লালমুখের এক পাশে একটা শান্ত গম্ভীর মুখে সেই ভদ্রলোকও এণাক্ষীর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এণাক্ষী এবার বোধহয় নিজের ভীরু চোখ দুটোকেই চেপে ধরতো। কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন—চা খান।

আশ্চর্য হয়ে মুখ তোলে এণাক্ষী। ভদ্রলোক আবার বলেন—আপনি নিশ্চিন্ত মনে চা খান।

এণাক্ষীর এই আতঙ্কিত মনের কঠোর সতর্কতার বুদ্ধিটাও যেন এলোমেলো হয়ে যায়। কিছুই বুঝতে না পেরে কিছুই বলতে পারে না এণাক্ষী।

ভদ্রলোক বলেন—আমি বলছি, কিছু ভাববেন না, আপনি স্বচ্ছন্দে চা খেয়ে ফেলুন!

তবু নিরুত্তর এণাক্ষী।

ভদ্রলোক বলেন—আমি তো আছি। আপনি চা খান।

যেন একটা প্রতিজ্ঞাময় অস্তিত্বের আশ্বাস। বেপরোয়া হয়ে গোরা মিলিটারীর হাতের এই মতলবের চা স্বচ্ছন্দে খেয়ে ফেলতে অনুরোধ করছেন ভদ্রলোক।

এণাক্ষী হঠাৎ বলে ফেলে—আপনিই তাহলে চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিন।

গোরা মিলিটারীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এণাক্ষীর হাতের কাছে এগিয়ে দেন ভদ্রলোক। এণাক্ষীও চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নেয়।

চারটে লালমুখ একটু তপ্ত হয়ে ওঠে। ভ্রূকুটিও করে তারপর কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। তারপরেই হো হো করে হেসে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে একটা বিদ্‌ঘুটে উল্লাসের ভঙ্গী করে।—হ্যাভ ইওর গুড টাইম, ক্লেভার হর্স।

বলতে বলতে চলে যায় হো-হো উল্লাসের চারটে গোরা মিলিটারী।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু চা খায়নি এণাক্ষী। চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ভদ্রলোককেই অনুরোধ করেছিল। —আমার চা খাওয়া অভ্যাস নেই। আপনিই বরং খান।

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন—আমি খেতাম ঠিকই, যদি এই চা ওরা আমাকে সাধতো। সুতরাং—।

এণাক্ষীও হাসে—আমারও চা খেতে কোন সাধ নেই।

চায়ের পেয়ালাটা মেজের উপরে রেখে দিতেই শুনতে পেল এণাক্ষী। মোটর বাসের খালাসী এসে ডাকছে—চলিয়ে দিদি।

এণাক্ষী—বাস এসেছে?

খালাসী—জী হাঁ।

আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি এণাক্ষী। পিছু ফিরে আর তাকায়ওনি।

হাঁ, দ্বিতীয় সার্ভিসের বাসটা যখন চলতে শুরু করলো, তখন একবার ডাকবাংলোর বারান্দার দিকে তাকিয়েছিল এণাক্ষী।

সেই ভদ্রলোকেরই নাম যে মনোময়, এই সত্যটুকু জীবনে অজানা হয়েই থাকতো, যদি মনোময় তার নিজেরই জীবনের একটা দুর্বার ইচ্ছার তাগিদে সেই সত্যটুকু এণাক্ষীকে জানিয়ে না দিত। শুধু নামটুকু নয়, মনোময়ের বুকটাকেও বুকের কাছে পাওয়ার সৌভাগ্য জীবনে দেখাই দিত না।

ডাকবাংলোর বারান্দায় সেই প্রথম দেখার পর তিনটে মাস পার হয়ে গেল, তবু সেই মানুষটার নামধামের কোন পরিচয় জানতে পারেনি এণাক্ষী। কেমন করেই বা জানবে? কাকে জিজ্ঞাসা করবে! কিন্তু এই তিন মাস ধরে মনটা যেন নিঃশব্দে একটা গোপন পিপাসার দুরন্ত উৎপাত সহ্য করেছে। ভদ্রলোকের নামটা জানবার জন্য মাঝে মাঝে ছটফট করে উঠেছে মন।

সেই প্রথম দেখার বিস্ময়টা চুপচাপ ভুলে যেতে পারা যেত, ভদ্রলোকের নাম জানবার জন্যে কোন ইচ্ছার নেশা মনের মধ্যে নিশ্চয় দেখা দিত না। কিন্তু ভুলতে পারা যায় না, তাইতো এই ইচ্ছার জ্বালা। বড় ভুল হয়েছে, ভদ্র-লোকের পরিচয়টা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। নিজের পরিচয়টা দেওয়া উচিত ছিল। দরকারের চেয়ে বেশি দুটো কথা বলে ফেললেই বা কি দোষ হতো? হয়তো হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় অচেনা মেয়ের হাতটাই ধরে ফেলতেন ভদ্রলোক। তাতেই বা কি এমন দোষ হতো?

এণাক্ষীর মনটা যখন গোপনে একজন অচেনা মানুষের হাতের ছোঁয়াকে এতটা অভ্যর্থনা করে ফেলেছে, ঠিক তখন একটি চিঠি এল। এণাক্ষীর নামে লেখা একটি খামের চিঠি। লিখেছেন মনোময়।

চিঠিটা বলছে, অনেক চেষ্টা করে একজন অচেনা অজানা মেয়ের নাম ধাম যোগাড় করেছে মনোময়, এই চেষ্টার কথা শুনে লজ্জা পাবে এণাক্ষী, হয়তো বিরক্তও হবে। তবু, চিঠি না লিখে থাকতে পারেনি মনোময়।

বাঃ, খুব বুদ্ধিমান। একজন অচেনা মেয়ের নাম-ধামের পরিচয় যোগাড় করবার জন্য কেন এত চেষ্টা, আর চিঠি লেখবার কেন এত ইচ্ছা, সেটুকু বুঝতেই পারছেন না। কিন্তু এত ভয়ে ভয়ে চিঠি লেখবার কোন দরকারই ছিল না। সোজা লিখে ফেললেই তো হতো, তিনমাস হয়ে গেল তবু আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি। বার বার তোমাকেই মনে পড়ছে এণা।

কিন্তু এণাক্ষী সব কুণ্ঠা লজ্জা ভয় ছেড়ে দিয়ে প্রথম চিঠিতেই লিখে ফেলতে পারে—জানি না কেন, আপনার কথা আমি চেষ্টা করেও ভুলে যেতে পারছি না।

তারপর আর শুধু চিঠি নয়। আর শুধু কল্পনার জানাজানি নয়। মনোময় হাজারিবাগে এসেছে। নিশিবাবুর এই বাড়িতে নিজেই এসে নিশিবাবুর কাছে নিজের পরিচয় শুনিয়েছে। নিশিবাবু শুনে চমকে উঠেছেন—তুমি হৃষীকেশবাবুর ছেলে? আমি তো ভাবতেই পারিনি যে…।

কি যে ভাবতে পারেননি নিশিবাবু তা তিনিই জানেন। তাঁর কথার মধ্যে শুধু অভাবিত বিস্ময়ের একটা খটকা যেন আচমকা বেজে ওঠে।

ঘরের ভিতর থেকে আচম্‌কা বের হয়ে এসে এণাক্ষী বলে—চৌপারণ ডাকবাংলোতে সেদিন ইনিই কাছে ছিলেন বলে···। এণাক্ষীও আর বলতে পারেনি যে, ইনি কাছে ছিলেন বলে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল।

নিশিবাবু বলেন—শুনে খুশি হলাম। মনোময়কে চা দাও এণা।

হঠাৎ গেটের দিকে তাকিয়ে নিশিবাবু বলেন—আমি চলি। জয়দেব এসে দাঁড়িয়ে আছে।

জয়দেব! এণাক্ষীর হঠাৎ ভ্রূকুটিতে সেই পুরনো বিদ্বেষটাই যেন রাগ করে শিউরে ওঠে। এণাক্ষীর চোখের একটা ধন্য আশার উৎসবের মধ্যে উঁকি দেবার জন্যই যেন একটা বিশ্রী চেষ্টা একজোড়া হিংসুটে চোখ নিয়ে সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তারই নাম জয়দেব। নিশিবাবুকে কেন যে যখন-তখন ডাকতে আসে জয়দেব, তা জয়দেব আর জয়দেবের ভগবানই জানেন। কিন্তু এণাক্ষী একটুও পছন্দ করে না যে, জয়দেব এখানে আসে।

যাই হোক্, শুধু চা খেয়ে চলে যাওয়া একজন হঠাৎ আগন্তুক অতিথির মনের মত খুশি মন নিয়ে নয়, মনোময় চলে গেল জীবনেরই একটা আশ্চর্য আশার তৃপ্তিভরা মন নিয়ে ; এণাক্ষী মনোময়কে ভালবাসে।

এণাক্ষীও জানলো, আর জানবার কিছু নেই। এ যে আশার অতিরিক্ত প্রাপ্তি। এই মনোময়েরই ভালবাসার উৎসব একদিন হেসে হেসে হাজারিবাগে এসে, এই বাড়ি থেকেই এণাক্ষীকে হাত ধরে আর সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাবে।

এই তো সেদিনও পাড়ার কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছে, নিশিবাবু তাঁর মেয়েটার বিয়েও দেবেন না, মেয়েটাও বিয়ে করবে না, কাজেই বিধবামহলে একটা বিধবা গোছের চিরকুমারীও মৌরসী স্বত্ব নিয়ে পড়ে থাকবে।

নিষ্ঠুর মন্তব্যটা কানাকানি হতে হতে একদিন এণাক্ষীরই কানের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনটে রাত ঘুমোতে পারেনি এণাক্ষী। শুধু তিনটে রাতকে নয়, মনে হয়েছিল কে যেন এণাক্ষীর সারা জীবনটাকেই দুঃস্বপ্নের ভয় দেখিয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে হাসছে।

পরের চারটি দিন গম্ভীর হয়ে আর উতলা মনটাকে একটু শান্ত করে নিয়ে ভাবতে পেরেছিল এণাক্ষী, মন্তব্যটা নিষ্ঠুর আনন্দে হাসলেও মিথ্যে আনন্দে হাসেনি। এণাক্ষীর বিয়ে হবে না, এটাই হলো ধ্রুব সত্য। পঁচিশ বছর বয়সের এই জীবনটার সামনে বা আশে-পাশে কোন আশার সংকেত নেই, কোন মমতার ডাক নেই ; এণাক্ষীর আর বিশ্বাস করবার সাধ্য

নেই যে, সত্যিই একদিন বিধবা মহলের একটা ধিঙ্গি কুমারী মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে।

তবে আর মিথ্যে মনটাকে ভাবিয়ে তুলে লাভ কি? যা হবার নয়, তা হবেই না। যা হতে চলেছে, তাই হবে। আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভাল। মনের খাতা থেকে সব আশার জমা একেবারে শূন্য করে দিয়ে একটা বিধবা-গোছের চিরকুমারীর রিক্ত রুক্ষ একঘেয়ে জীবন বরণ করবার জন্যই তৈরী হয়েছিল এণাক্ষী।

কিন্তু এণাক্ষীর জীবনে অবধারিত সেই রিক্ত রুক্ষ ভবিষ্যতটাকে যেন রঙে চুবিবে দেবার অঙ্গীকার হয়ে এণাক্ষীর চোখের কাছে দেখা দিল মনোময়। সমবেদনার ভাণ করে নির্মমতা করেছিল যে মন্তব্যটা সেটা এবার জব্দ হিংসুখের ভীরু ইতরতা হয়ে মরেই যাবে। গয়ার বিখ্যাত জমিদার হৃষীকেশবাবুর একমাত্র ছেলের সঙ্গে নিশি রায়ের মেয়ের বিয়ে, এত বড় বিস্ময়ের ঘটনা সহ্য করতে না পেরে হিতৈষীদেরও অনেকে যে বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যাবেন, তাও বুঝতে পারা যায়।

মনোময়ের চাকরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে। মনোময়ের ইচ্ছার এই দাবিটা মেনেই নিয়েছিল এণাক্ষী। দাবিটা মেনে নিতে খুব ভাল লাগেনি ঠিকই, কিন্তু দু'বছরের অপেক্ষার জীবনটাকেও ভালই লেগেছিল। দু'বছরের মধ্যে আরও দু'বার হাজারিবাগে এসেছিল মনোময়। মনোময়ের চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে, এমন কি একবার মনোময়ের খুব কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল এণাক্ষী। হুড্রু জল-প্রপাতের সেই ছবিটা, একটা পেন-এণ্ড ইঙ্ক, যেটা ফ্রেমে বাঁধা হয়ে দেয়ালের ঝুলছিল। সেটারই কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব মন দিয়ে দেখছিল মনোময়। এণাক্ষীও এগিয়ে গিয়ে মনোময়ের বাঁ পাশে, প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। না, ছবিটার দিকে নয়, মুখ তুলে সে একটা সুন্দর মুখ দেখবারই নিবিড় আগ্রহের আবেশে মনোময়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল এণাক্ষী।

মনোময়—কে এঁকেছে ছবিটা?

এণাক্ষী—তোমার এণাক্ষীই এঁকেছে।

মনোময় চলে যাবার পরে সারাদিন বার বার এই ছবিটারই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এণাক্ষী। যেন এণাক্ষীর প্রাণের একটা আক্ষেপ বার বার এণাক্ষীকে টেনে এনে ছবিটার কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে বাতাসে মনোময়ের নিশ্বাস ঝরে পড়েছিল, যেন সেই বাতাসের ছোঁয়াটুকু

বার বার বরণ করবার জন্য ছবিটার কাছে ছুটে আসছে এণাক্ষী। আক্ষেপটা সেই আক্ষেপ, কি দোষ ছিল সে মানুষের হাতটা ছুঁয়ে ফেলতে, যে মানুষ এণাক্ষীর জীবনের এত কাছে চলেই এসেছে? রাগ হয় নিজেরই ওপর, মনোময়ের চলে যাবার পরে এণাক্ষীর মূর্খ ইচ্ছাটা ভাঙে, আজও আবার একেবারে খালি হাতে চলে গেল মনোময়। যতক্ষণ কাছে ছিল মনোময় ততক্ষণ একবারও মন পড়েনি! যেন একটা চোরা লজ্জা এণাক্ষীর ইচ্ছাটাকে ভুলিয়ে রেখেছিল।

এই লজ্জাটাকেই বার বার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। ভালবাসা কেন এত ভীরু হবে? আর কদিন পরে যে মানুষ এণাক্ষীর স্বামী হয়ে সবারই চোখের সামনে এণাক্ষীর হাত ধরবে, তার মুখের এত কাছে থেকেও এণাক্ষীর মুখটা অলস হয়ে রইল কেন?

মনোময়ের মুখটাইবা এত অলস হয়ে রইল কেন? এণাক্ষীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ধার ধারবার যে কোনই দরকার ছিল না মনোময়ের। মনোময় কি বিশ্বাস করে না যে, আজ এণাক্ষীকে জোর করে বুকের উপর জড়িয়ে ধরলেও ভুল করা হবে না, একটুও অন্যায় হবে না?

চিঠী লেখা আর চোখে দেখা আর মুখোমুখি কথা বলা—ভালবাসার প্রাণটাকে বুকে করে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু মনে হয়, একটা পিপাসা যেন ব্যথিত হয়ে রয়েছে। নিজের কাছে তো আর নিজের মনটাকে গোপন করা যায় না। গোপন করেই বা লাভ কি? ভালবাসার একটা স্পর্শময় অনুভবের সুখ বরণ করবার জন্য এণাক্ষীর বুকের ভিতরে একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাস দুরন্ত হয়ে উঠেছে। অপেক্ষার মেয়াদ ফুরোবে কবে?

হ্যাঁ, বিয়ের দিনে বহু মানুষের চোখের সামনেই মনোময়ের হাতের উপর হাত রাখতে হয়েছিল। মাঘ মাসে মাঝরাতের একটা লগ্নতে বিয়ে; মনোময়ের হাতটা একেবারে ঠাণ্ডা, সে হাতের ছোঁয়ার সুখে মন ভরে না এণাক্ষীর। ওটা যেন ঠিক মনোময়ের হাত নয়; ওটা কনকনে শীতের রাতের মন্ত্রটারই হাত।

কিন্তু বাসরের রাতটাও যে ফাঁকি দিল! বোধহয় সেই চোরা লজ্জায় মূর্খতারই ভুলে মনোময়ের সঙ্গে শুধু একটা গল্প করতেই ফুরিয়ে গেল রাতটা। বাসরঘরের মায়াময় কুহকের মধ্যে দুজনেরই চোখ যেন শুধু জেগে থাকার আনন্দেই বিভোর হয়েছিল।

গয়াতে ফুলশয্যার রাতটাও যে ফাঁকি দিল! ঘরের ভিড় সরে যাবার

পর রাত আর কতটুকুই বা বাকি ছিল? শুধু গল্প করে নয়, যেন একটা পরম নিশ্চিন্ততার আবেশে অলস হয়ে গিয়েছিল এণাক্ষীর প্রাণটা। ঘুমিয়ে পড়েছিল এণাক্ষী। কখন যে এমন একটা ভুলের ঘুম এসে এণাক্ষীর চোখের পাতা বুজিয়ে দিয়েছিল, তা বুঝতে পারেনি এণাক্ষী। জেগে উঠলো যখন, তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। মনোময় একটা বালিশকে দুহাতে জড়িয়ে আর বুকের উপর চেপে ধরে ফুলশয্যার এক পাশে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

বন্ধ দরজার বাইরে যেন একগাদা ঠাট্টার হাসি কলকল করছে। কপাটের গায়ে মাঝে মাঝে টোকা পড়ছে। বুঝতে পারা যায়, সীমা বীণা লীনা আর কেতকীর দুরন্ত ঠাট্টার টোকা। দরজার কপাট খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় এণাক্ষী।

মনোময় চলে গেল পাটনা। তারপর আদালত ঘর থেকে সোজা জেলঘর। সেই দিন ঘরের নিভৃতে একা একা বসে আর চোখের জল মুছে মনের ভুলটাকে, চোরা-লজ্জার নিষ্ঠুরতাকে সবচেয়ে বেশি ধিক্কার দিয়েছিল এণাক্ষী। বিয়ে হলো, তবু আরও এক বছরের অপেক্ষা সহ্য করতে হবে! ভালবাসার যে মানুষ সত্যিই স্বামী হয়ে গেল, তারই বুকের উপরে মাথাটা একবার লুটিয়ে দিতে ভুলেই গিয়েছে এণাক্ষী। তার হাতটাও একবার ধরা হয়নি। সেই পুরনো পিপাসাটাই আজ যেন অনুতাপের জ্বালায় পুড়তে থাকে। ছিঃ, ভাবতে অদ্ভুত লাগে, নিজেকে ক্ষমা করতেও পারে না, ডাকবাংলোর সেই প্রথম দেখার রাত থেকে সুরু করে, ফুলশয্যার রাত, যেন অস্পৃশ্যতায় অভিশপ্ত একটা ভালবাসার ইতিহাস। সত্যিই যে মনোময়কে ছোঁয়নি এণাক্ষী।

কিন্তু আর এই ভুল করেনি এণাক্ষী। এই ভুল ভাঙ্গাবারই জন্য এণাক্ষী যেন প্রতিজ্ঞা করে একটা বৎসরের অপেক্ষা সহ্য করেছে। কল্পনাতেও আর কোন লজ্জাকে প্রশ্রয় দেয়নি এণাক্ষী। প্রস্তুত হয়েছে, এইবার আর ভুলে-থাকা নয়; আর একটি দিনও আলগা হয়ে থাকা নয়। ফিরে আসুক মনোময়; ফিরে আসার পর প্রথম দেখার দিনেই, তখন রাত থাকুক বা সকাল থাকুক, মনোময়ের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে এত দিনের ভুলের আর ফাঁকির শোধ তুলতে হবে।

মিথ্যে হয়নি এণাক্ষীর এই ব্যাকুলতার আশা। পাটনার জেল থেকে খালাস পাওয়ার তিন দিন পরেই হাজারিবাগের এই বাড়িতে দেখা দিল মনোময়ের হাসি-হাসি মুখটা। আগেই কথা হয়ে আছে, এণাক্ষীকে এইবার গয়ায় নিয়ে যাবে মনোময়। যেখানেই নিয়ে যাক, এণাক্ষীর প্রাণ যে প্রস্তুত

হয়েই আছে। কিন্তু না⋯গয়ার গল্প আজ আর নয়; চাকরির গল্প, স্বদেশী ব্রতের যত অদ্ভুত গল্প⋯আজ আর শোনবার জন্য এণাক্ষীর একবিন্দু আগ্রহ নেই। আজকের এই সন্ধ্যাটাও তো আর চৌপারণ ডাকবাংলোর সেই সন্ধ্যাটার মত আতঙ্কের আর অসহায়তার সন্ধ্যা নয়। এই সন্ধ্যার আকাশে একবিন্দু মেঘ নেই; বরং মস্ত একটা চাঁদ আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করছে। ঘরের নিভৃতে মুখোমুখি বসেও মনোময়কে একটা মুখের কথাও বলতে দেয়নি এণাক্ষী। এণাক্ষীর এক বছরের অপেক্ষার দুঃখটা যেন দুরন্ত পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে এণাক্ষীকে মনোময়ের বুকের উপর লুটিয়ে দিয়েছিল। এণাক্ষীর শরীরটাও কোন লজ্জার বালাই আর রাখেনি। একটুও আশ্চর্য হয় না মনোময়; কোন কুণ্ঠা না রেখে, এণাক্ষীর ব্যাকুলতার উপহার দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে সুখী হয়েছিল।

কিন্তু পরের দিনই এণাক্ষীর গয়া যাবার পরিকল্পনাটাই হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়ে গেল। মনোময়ের জ্বর হয়েছে। জ্বরটা সামান্য। তবু মনোময় যেন একটু চিন্তিতভাবে বলে—আমি আজই গয়া চলে যাব। তুমি পরে যেও।

—তা হয় না। হয় তুমি এখানে থাকবে, নয় আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

—আমাকে বোধহয় একবার পাটনাতে যেতে হবে; সেখানে কিছুদিন থাকতেও হবে বোধহয়। বুকটা একবার পরীক্ষা করাবার দরকার হয়েছে। পাটনা জেলের ডাক্তারই বলেছিলেন, ছাড়া পেয়েই সব কাজের আগে যেন ডাক্তার সমাদ্দারকে দিয়ে বুকটা পরীক্ষা করাই। কাজেই⋯।

এণাক্ষীর চোখ ছলছল করে—কাজেই মানে কি?

—আমি এখন একাই চলে যাই। তুমি এখন এখানেই থাক লক্ষ্মীটি। বেশি দিন নয়; বড় জোর আর পনরটা দিন। আমি আবার এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

সেই মনোময় আর আসেনি। এসেছিল শুধু একটি টেলিগ্রাম।

আর সন্দেহ করবারও কিছু নেই। বিধবা-মহলের মানুষগুলি বিলাপ করে করে যে কথাটা বলেন, সেটা একটা খাঁটি সত্যেরই প্রতিধ্বনি। এমন দুর্ভাগ্য যেন কোন ডাকাত মেয়েরও না হয়।

এণাক্ষীর ভাগ্যটারই দোষ। ভাগ্যটা অপয়া। এণাক্ষীর প্রাণটাই অপয়া। তা নাহলে এমন করে কি কেউ বিধবা হয়? নিশি রায়ের মেয়েকে এখন কেউ

যদি মানুষখাকী বলে গাল দেয়, তবুও বোধহয় একটুও রাগ করবে না এণাক্ষী।

প্রতিবেশী নিন্দুকের সেই নিষ্ঠুর মন্তব্যটা যতটা সর্বনাশ আশা করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি সর্বনাশ সত্য হয়ে উঠেছে। বিধবা গোছের চিরকুমারী হয়ে নয়, সত্যিই সিঁদুর-মোছা একটা খাঁটি বিধবা হয়ে এই বিধবামহলে পড়ে থাকতে হবে।

আপত্তি নেই এণাক্ষীর। তিন বছরের ভালোবাসার আশা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভাগ্যটা নিজেই যখন বিধবা হয়ে গেল, তখন একটা বিধবা চেহারা হয়ে পড়ে থাকতে আর দুশ্চিন্তা কিসের?

একটুও দুশ্চিন্তা নয়। বরং নতুন করে যেন একটা ব্রত খুঁজে পেয়েছে এণাক্ষী। জীবনের এই বিধবা দশটাই যেন পরিস্কার সাদাটে শূন্যতায় চিরকাল ধবধব করে। পিসিমাও নিরম্বু উপোস করেন না। কিন্তু এণাক্ষী করে। মামী পান খাওয়ার অভ্যাসটা এখনও জয় করতে পারে নি। কিন্তু এণাক্ষী পান খাওয়া দূরে থাকুক, কোন মশলাও মুখে দেয় না। খুড়িমা সরুপাড়ের ধুতি মাঝে মাঝে পারেন, কিন্তু সাদা থান ছাড়া কোন কাপড় ছোঁয়ও না এণাক্ষী। আয়নাতে মুখ দেখাও ছেড়ে দিয়েছে এণাক্ষী। একবার গোঁ ধরেছিল, চুলও কেটে ফেলতে হবে। জেঠিমা হাতে ধরে অনেক অনুনয় করে আর বুঝিয়ে এণাক্ষীকে আত্মসংহারের মত এই নিদারুণ চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করতে পেরেছেন।

ভাগ্যে দোষ ছিল, নয়তো বিয়ের লগ্নটাতেই দোষ ছিল, কিংবা কারও হিংসুটে দৃষ্টির অভিশাপ ছিল—হয়তো সবই সত্যি। বিধবা মহলের করুণ আক্ষেপ আর বিলাপের ভাবাটা যে-সব অভিযোগ করে, সে-সবও হয়তো ভুল অভিযোগ নয়। কিন্তু এণাক্ষী জানে, এই সব আক্ষেপ আর বিলাপ অনেক কিছু সন্দেহ করতে পেরেও এণাক্ষীর জীবনের আসল অভিশাপটাকে ধরতে পারে নি। এণাক্ষীর এই শরীরটাই অপয়া।

একটা নিষ্ঠুর হিংস্র অভিশপ্ত শরীর। বাইরে থেকে দেখে যে শরীরটাকে ফোটা ফুলের মত একটা ঢলঢলে সুন্দরতার শরীর বলে মনে হয়। তা না হলে এমন কাণ্ড হবে কেন? তিন বছরের ভালোবাসার মধ্যে কোন ভুল ছিল না। সে ভালবাসাকে অপয়া বলবার কোন যুক্তি নেই। সে তিন বছরের মধ্যে মনোময়ের শরীরটা কোনদিন সামান্য একটুও অসুস্থ হয়েছে বলে শুনতে পায়নি এণাক্ষী। কিন্তু যেদিন এণাক্ষীর এই শরীরের ইচ্ছেটা লোভের রাক্ষসীর মত মনোময়কে ছুঁয়ে দিল, দুহাতে জড়িয়ে ধরলো, সেদিন থেকেই

যে······সেই ছোঁয়ারই বিষ সহ্য করতে না পেরে সাতদিনের জ্বরে বিদায় নিয়েছে মনোময়। এ শরীরের ছোঁয়ার ভিতরে এমন ভয়ানক অভিশাপ লুকিয়ে আছে, আগে জানতে পারলে যে অনেক দিন আগেই এই জীবনের চেহারাটাকে বিধবা করে রেখে দিতে এণাক্ষী। এত বড় একটা পাপের কাণ্ড করবার সুযোগ পেত না শরীরটা।

কিন্তু নিশি রায়ের ব্যস্ততার চেহারা দেখলে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। দেখে মনে হয় না যে, হঠাৎ বজ্রপাতের চেয়েও ভয়ানক এই আকস্মিক দুর্ভাগ্যের আঘাত পেয়ে একটুও মনমরা হয়ে গিয়েছেন বা মুসড়ে পড়েছেন কিংবা উদাস হয়ে গিয়েছেন ভদ্রলোক।

এক বছরও পার হয়নি, একমাত্র মেয়ে বিধবা হয়েছে, কিন্তু বাপের প্রাণটা যেন নতুন একটা আশার কাজে মেতে উঠেছে। একটা কাপড়ের দোকান করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন নিশি রায়। সকাল-সন্ধ্যা ছুটোছুটি করছেন। কলকাতায় যাচ্ছেন আর আসছেন। বার বার ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। লোকজন নিয়ে দোকানঘর সাজাচ্ছেন। কাপড়ের গাঁট ভর্তি ট্রাক এসে নতুন দোকানের সামনে থামছে। চালান হাতে নিয়ে আর গাঁট গুণে গুণে চালানের হিসেব চেক করেছেন নিশি রায়।

নিশি রায়ের এই ব্যস্ততার উপর কারও কোন সহানুভূতি আছে বলে মনে হয় না, একমাত্র গিরিডির জয়দেব ছাড়া। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায়, নিশি রায়ের সহানুভূতিতে নিশি রায়ের যত আজে বাজে কাজের দায়ে জয়দেবই ছুটোছুটি করে খাটছে।

লোক জানে, নিশি রায়ের এই কাপড়ের দোকানও ফেল করবে। আজ পর্যন্ত কত কিছুই তো করলেন নিশিবাবু! এই সহরে আর নবাবগঞ্জের এই বাড়িতেই একটানা পাঁচ বছর ধরে আছেন। আর, এক একটা কারবারে হাত দিচ্ছেন। কিন্তু এমনই অপয়া হাত যে, কারবারটার প্রাণ শেষ হয়ে যেতে বাকি ছটা মাসও লাগে না। একবার এক জমিদারের এষ্টেটের পাঁচটা বড় বড় বিল ইজারা নিয়ে মাছ ছেড়েছিলেন নিশি রায়। মাছের পোনা আনবার জন্যে মালদহে গিয়েছিলেন। কয়েক লক্ষ, অনেকে বলেন কোটিরও ওপর, রুই কাতলা আর মৃগেলের চারা ছেড়েছিলেন। কিন্তু সে-সব চারা-মাছ বেঙাচির চেয়ে সামান্য একটু বড় হয়েছিল। তারচেয়ে বেশি বড় আর হলোই না। তা ছাড়া, সে-সব বিচিত্র বেঙাচি গোছের লক্ষ লক্ষ জীবও পরের বছরের বর্ষাতে বাঁধভাঙা বিলের জলের স্রোতের সঙ্গেই ভেসে গেল।

বেনারস থেকে কয়েক ওয়াগন আম আমদানি করেছিলেন নিশি রায়। খুব ভাল জাতের আম। কিন্তু সে আমও এই শহর পর্যন্ত পৌছোয়নি। হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনেই রেল লাইনের ধারে পচা আমের গাদা দশদিন ধরে পড়েছিল।

তবু এত বড় একটা বিধবা মহলের দায় যেন প্রশান্ত চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন নিশি রায়। খরচ চালাবার চিন্তাটা যেন একটুও দুশ্চিন্তা নয়। চলে যাচ্ছে খরচ। লোকের চোখে রহস্য হয়েই ঠেকে; ফেল পড়া কারবারের এত আঘাত, এত টাকা নষ্ট হয়েছে, তবু নিশি রায়ের সংসারে কোন অভাবের কিংবা টানাটানির ক্লেশ নেই। কত টাকা জমিয়েছিলেন আর কত টাকা হাতে নিয়ে এই সহরে এসেছিলেন ভদ্রলোক? পাঁচ বছর ধরে সংসারের খরচ চালাচ্ছেন, কারবার পত্তন করেছেন আর নষ্ট করেছেন, তবু বসে পড়ছেন না? বাড়ি ভাড়া নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন; কোন ডাক্তার, কোন মুদী, কোন গোয়ালা আর ফলওয়ালা বলতে পারবে না যে নিশি রায়ের কাছে এক পয়সা পাওনা বাকি পড়ে আছে।

শুধু বাইরের লোক নয়, ঘরের লোকও কি কিছু জানে? কিছুই না। ঘরের লোকের চোখে এটা কোন রহস্য বলেও ঠেকে না। ঘরের মানুষেরা বরং মাঝে মাঝে নিশি রায়ের এই কারবারী ব্যস্ততাকে একটু দমিয়ে দেবারই চেষ্টা করে। এই বয়সে এত খাটবার দরকার কি? দুধ ঘি না হলেও চলে যাবে। এতবড় বাড়িতে না থাকলেও চলবে। পিসিমা তো মাঝে মাঝে রাগ করেই বলেন—তুমি তোমার খাটুনি আর হয়রানি একটু কমাও তো দাদা। আগে নিজের শরীরটাকে একটু দেখ। তারপর আমাদের এই কটা পোড়া-কপালের দিকে নজর দিও।

পিসিমা আর খুড়িমা অনেক সাধলেন, চল এণা, অন্তত আজকের মত একবার চল। যদি শুনতে ভাল না লাগে, তবে চলে আসিস।

মদনগোপালের মন্দিরে কীর্তন শুনতে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন পিসিমা আব খুড়িমা। কিন্তু এণাক্ষীর আপত্তির রকম দেখে চুপ করে গেলেন।

বাড়ির সীমার বাইরে ভুলেও কোনদিন পা বাড়ায় না, এমন কি বাইরের বারান্দার উপরে গিয়ে দাঁড়াতেও যেন এণাক্ষীর মনে আপত্তি আছে। আপত্তিটা বড় কঠোর। এই এক বছরের মধ্যে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে এণাক্ষী কোনোদিন বাইরের আকাশটাকেও একবার দেখেছ কিনা সন্দেহ। সংসারের

সব আলো বাতাস ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যেন খুব ছোট অথচ খুব কঠোর একটা শূন্যতার ঠাঁই তৈরি করে নিয়েছে এণাক্ষী। তার বাইরে যাবার কোন দরকারই আছে বলে মনে করে না।

এক বছরের মধ্যে এই, মাত্র কাল সন্ধ্যায়, মদনগোপালের মন্দিরে কীর্তন শুনতে যেতে রাজী হয়েছিল এণাক্ষী। অনেক সাধাসাধির পর রাজি হয়েছিল। জেঠিমা খুব অনুনয় করে বলেছিলেন—যা, একবার ঘুরে আয়। কীর্তন না শুনিস, অতন্ত মন্দির পর্যন্ত গিয়ে একটু বেড়িয়ে আয়। বাইরের হাওয়া একটু গায়ে লাগুক। ঘরে বন্ধ থেকে থেকে যে যক্ষ্মারোগীর মত সিঁটিয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছিস।

সাদা হয়ে যেতেই তো চায় এণাক্ষী। যক্ষ্মারোগীরই মত এই অপয়া শরীরের সব রক্তের লাল যেন ধুয়ে যায়। বাইরের হাওয়ার ছোঁয়া থেকে স্বাস্থ্য কুড়োবার কোন শখ নেই এণাক্ষীর মনে।

কিন্তু মামীমা বলেছেন, কীর্তন শুনলে নাকি মনটাও একটু ভাল হবে। তার মানে, মনের যত ভাবনার ভার একটু হালকা হয়ে যাবে। কীর্তনের গান ভাবনা ভুলিয়ে দেয়।

কিন্তু কীর্তনের গান যেন এণাক্ষীর ভাবনার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। হোক না চমৎকার সুকণ্ঠের গান, হোক না সুন্দর সুর আর সুন্দর ভাষা, হোক না রাধা আর কৃষ্ণের পরম প্রেমলীলার ব্যাখ্যা, সে কীর্তনের গান যেন এণাক্ষীর এই সাদা সিঁথিটার উপর একটা নির্মম বিদ্রূপের উৎপাত। যা ভুলে থাকতে চায় এণাক্ষী, তাই মনে করিয়ে দেয়, বুকের ভিতর ছেঁড়া স্বপ্নের যে জ্বালাটা শান্ত হতে চাইছে, সেই জ্বালাকে অশান্ত করে দিতে চায় কীর্তনের গান। তবু অনেকক্ষণ ধরে গানের যত বিরহ-বিলাপ সহ্য করেছিল এণাক্ষী। কিন্তু মিলনের উল্লাসটা সহ্য করতে পারেনি। অশান্তিটা যেন যন্ত্রণা হয়ে উঠেছিল। আর এক মুহূর্তও দেরী না করে চলে এসেছিল এণাক্ষী।

মনটাকেও সাদা করতে চায় যে, তার জীবনে ওসব গান শোনা উচিত নয়। হোক না দেবতার কথা, তবু শুনে দরকার নেই। নিজের জীবনের জগতে কোকিল ডাকা মধুমাস যখন মিথ্যে হয়েই গিয়েছে, তখন দেবতার লীলার কথা শোনার ছুতো করে কোন কুঞ্জবনের কুহুরব আর মধুপের গুঞ্জন শুনে লাভ নেই।

মনটাকে এত সাদা করে দিতে গেলে যে মনোময়ের ছবিটাও মুছে যেতে পারে, সে ভয় কি নেই এণাক্ষীর মনে?

বোধহয় নেই। কারণ এই ভয়কে ভয় বলেই মনে করে না এণাক্ষী, বরং তাই তো চায় এণাক্ষী, মনে-প্রাণে বিধবা হয়ে যাওয়াই ভাল। মনোময়ের স্মৃতিটাও সাদা হয়ে গেলে ভাল! তা না হলে শূন্যতাও যে সম্পূর্ণ হয় না।

কিন্তু স্বীকার না করে পারে না, স্মৃতি সাদা করে দেওয়া এত সহজ নয়! সব ভুলে গিয়ে, সাদা থানে বাঁধা-ছাঁদা একটি শরীর নিয়ে আর রুক্ষ চুলগুলিকে এগিয়ে দিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেও সে ঘুমের স্বপ্নটা সাদা হয়ে যায় না। ধড়ফড় করে জেগে উঠতে হয়েছে, চৌপারণ ডাকবাংলোর বারান্দার আলোটা যেন দপ করে জ্বলে উঠেছে।

মনোময়ের কথা প্রায়ই মনে পড়িয়ে দেয় আর একটা মানুষ। যার বিরুদ্ধে এণাক্ষীর মনে অনেকদিন আগে থেকেই একটা সন্দেহময় বিদ্রোহ আছে, যার নাম জয়দেব।

বিধবা মহলের বিলাপের মধ্যে বিশেষ একটা যে অভিযোগ শোনা যায়, সেই অভিযোগটাকে নিতান্ত মিথ্যা বলে মনে করতে পারে না এণাক্ষী। কার নজরে বিষ ছিল, যে-জন্য এণাক্ষীর স্বপ্নে-পাওয়া এত বড় সৌভাগ্যটা মিথ্যে হয়ে গেল? ভুলতে পারে না এণাক্ষী, এই বাড়িতে প্রথম যেদিন এসেছিল মনোময়, এণাক্ষীকে ভালবাসার কথা বলেছিল, সৌভাগ্যের সেই প্রথম শুভ দিনে আর ঠিক সেই সময়ে এই বাড়ির ঘরের দিকে তাকিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল জয়দেব। জয়দেবের চোখের সেই দৃষ্টিতে কি ভয়ানক বিষ ছিল কে জানে? কে জানে, হয়তো জয়দেবের সেই নজরের বিষটাই মনোময়ের মৃত্যু ঘটিয়ে ছেড়েছে।

মাঝে মাঝে মনটাকে খুব শান্ত করে আর শান্ত যুক্তি দিয়ে নিজেরই এই সব ধারণার বিড়ম্বনা দূর করতে চেয়েছে এণাক্ষী। জীবনটা দুঃখ পেয়েছে, আশা ছাই হয়ে গেল, তাই মনটা যত যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে এত দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই ভয়গুলিও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তাই জয়দেব নামে ঐ ভদ্রলোক, যার সঙ্গে এণাক্ষীর একটা সামান্য আলাপ-করা চেনাশোনার সম্পর্কও নেই, মনোময়ের সঙ্গেও যার কোনদিন একটা চোখে দেখা সম্পর্কও ছিল না, তাকেও সন্দেহ করবার চিন্তা চলে আসে।

জয়দেবের পরিচয় বলতে এণাক্ষী শুধু এইটুকুই জানে যে, ভদ্রলোক গিরিডিতে থেকে নিজের কারবার করেন, কিন্তু যখন-তখন হাজারিবাগে এসে বাবার কারবারের কাজে একটু খেটে দিয়ে চলে যান। এটা কোন অদ্ভুত ব্যাপার নয়, দুঃসহ বলেও মনে হয়নি এণাক্ষীর।

কিন্তু বাবার কারবারের কাজে এত সাহায্যের খাটুনি খেটে দেবার এত সাধ আর এত গরজ কেন ভদ্রলোকের? এই তিন বছরের মধ্যে এই বাড়ির কাছে এসে এক পেয়ালা চা-এর অভ্যর্থনাও পায়নি জয়দেব। পাবেই বা কি করে? এই বাড়ির বারান্দার উপরে এসেও তো কোন দিন দাঁড়ায়নি জয়দেব। এমন কি গেটের কাছে এসে রাস্তার উপর যখন দাঁড়িয়েছে, তখনও কোন হাঁক-ডাক করেনি।

নিশিবাবুও জয়দেবকে কোন দিন ডাক দিয়ে বলেননি যে, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন জয়দেব? এখানে এসো বসো।

ঘরের জানালা দিয়ে কিংবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিশিবাবু শুধু দেখেছেন, জয়দেব এসে চুপ করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে; নিশিবাবুই হাঁক দিয়ে বলেছেন—আর একটু দাঁড়াও জয়দেব, আমি এখনই যাচ্ছি।

তারপরেই কাঁধের উপরে চাদরটা তুলে নিয়ে বের হয়ে গিয়েছেন নিশিবাবু; জয়দেবের সঙ্গে কাজের গল্প করতে করতে···কিন্তু কোথায় যে গিয়েছেন আর কি করতে গিয়েছেন, সে সব খবর অবশ্য কিছুই জানে না এণাক্ষী। সে-সব খবর এণাক্ষীর জীবনের পক্ষে জানবার মত কোন দরকারীও নয়।

কিন্তু সেই প্রশ্নটা মনের ভিতরে হঠাৎ উৎপাত ঘটিয়ে এমন একটা সন্দেহ সৃষ্টি করে, যে সন্দেহটার স্পর্শকে অশুচি বলে বোধ হয়েছে এণাক্ষীর। জয়দেব নামে এই লোকটা কেন এত ব্যস্ত হয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে, বাবার কারবারের কাজে খাটবার জন্য ওর এই গরজটাই বা কিসের গরজ? বিশ্রী কোন ইচ্ছার দুঃসাহস নয় তো?

সত্যিই, সন্দেহ না করে পারেনি এণাক্ষী; জয়দেবের এই সব ভালমানুষী ছুটোছুটির আড়ালে একটা ইচ্ছা লুকিয়ে আছে। দূরে দূরে থেকে এইভাবে নিশি রায়ের কাজের দরকারে খেটে দিয়ে গিরিডি চলে যাওয়া, এটা যে এই বাড়ির একটু কাছাকাছি হবারই একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় চেষ্টা।

জয়দেবের আনা যাওয়ার এই ব্যাপারটাকে যখনই একটা মতলবের চেষ্টা বলে সন্দেহ হয়েছে তখনই লোকটার সম্পর্কে একটা কঠোর ঘৃণার ভাব এণাক্ষীর মনের ভিতর যেন রুষ্ট সাপের মত ফুঁসে উঠেছে। নিশি রায়ের মেয়েকে যেন জঙ্গলের রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা ডানা-ভাঙ্গা পাখি বলে মনে করেছে জয়দেব, যেন বার বার যাওয়া-আসা করলেই পাখিটা নিজেই ডাক দিয়ে বলবে, আমাকে তুলে নাও। নিশি রায়ের মেয়েকে কত সুলভ

একটা প্রাপ্য বলে ধারণা করেছে গিরিডির এই মাইকা মারচেণ্ট লোকটা? নিশি রায়ের মেয়ের কাছে আসবার জন্ত চেষ্টা করতে পারে, যেন পৃথিবীতে এমন কোন মানুষই আর নেই। যেন বার বার এভাবে যাওয়া-আসা করলেই নিশি রায়ের মেয়ে বিশ্বাস করে ফেলবে যে, জয়দেব ছাড়া আর কোন মানুষই পৃথিবীতে নেই।

যদি বুঝতে পারতো জয়দেব, ভুল করে নিতান্ত একটা দুরাশাকে সে আশা করছে, তবে হয়তো এমুখো আর হতো না; নিশি রায়ের কাজে খেটে দেবার ছুতো করে এত আসা-যাওয়াও আর করতো না।

কিন্তু বুঝতে পারেন না কেন ভদ্রলোক? নিশি রায়ের মেয়ে যে ওর মুখের দিকে কোনদিন ভাল করে তাকায়ওনি, একটা সামান্ত সাধারণ ভদ্রতার কথাও বলতে চেষ্টা করেনি, এই স্পষ্ট সত্যটাও তো ওর কাছে অস্পষ্ট নয়?

আরও আশ্চর্য, মনোময়ের সঙ্গে এণাক্ষীর বিয়ে হয়ে যাবার পরেও দেখা গিয়েছে, জয়দেবের ঐ নীরব আসা-যাওয়ার আর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবার অদ্ভুত অভ্যাসটা একটুও দমে যায়নি। যেন একটা নির্বিকার উৎসাহ আসে আর চলে যায়।

মাঝে মাঝে মনে মনে হেসেও ফেলেছে এণাক্ষী। ভদ্রলোক যেন সত্যিই গীতার কর্মযোগী পুরুষ। হার জিতে কোন ভেদ মানেন না। রোদও যা বৃষ্টিও তা। আশা আর হতাশায় সমান অবিচল।

মাঝে মাঝে লজ্জা পেয়ে নিজের মনের সন্দেহটাকেও সন্দেহ করেছে এণাক্ষী। ছিঃ, নিতান্ত ভুল সন্দেহ। কতরকমই তো অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ আছে পৃথিবীতে; জয়দেব হয়তো তাদেরই একজন। বাবার কারবারের কাজে একটু সাহায্যের খাটুনি খেটে দেওয়া হয়তো ওর একটা শখের অভ্যাস। বেলায় বাবা ললিতবাবুরও তো এরকম একটা শখের অভ্যাস আছে। রোজই সকালে তিন মাইল পথ হেঁটে পাহাড়ের কাছে মল্লিকবাবুদের ফুলের বাগানটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই আবার ফিরে আসেন। বাগানের বেড়া থেকে একটা বুনো গোলাপকেও কোন দিন হাতে তুলে নেন না, স্পর্শও করেন না। ফুলের ওপর ললিতবাবুর কোন লোভ আছে, এমন ধারণা করবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

—ও কি? কিসের শব্দ। বারান্দার উপর খুটখাট শব্দ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে?

আজ আর কীর্তন শুনতে না গিয়ে চুপ করে বাইরের ঘরের ভিতরে একটা পড়ে থাকতে এতক্ষন ভালই লাগছিল এণাক্ষীর। বাড়িতে অন্য ঘরেও এখন আর কেউ নেই। নিশিবাবু গিয়েছেন তাঁর কারবারের কাজে; বিধবা মহলের আর সব মানুষগুলি গিয়েছেন মদনগোপালের মন্দিরে বিখ্যাত এক ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তনিয়ার গলার গানে শ্রীরাধার দশ দশার হাসি-কান্না শুনতে। বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ; শূন্যতাকেই বেশি ভাল লাগবে বলে, মামীমা আর খুড়িমার সব অনুরোধ তুচ্ছ করে বাড়িতে থেকে গিয়েছে এণাক্ষী।

এই সময়, এণাক্ষীর এই একলা পড়ে থাকা শান্তিটাকেই হিংসে করে কিসের শব্দ কোথা থেকে এসে বারান্দার উপর খুটখাট্ করে ঘুরে বেড়ায়? কার পায়ের শব্দ?

ছিঃ, ভাবতে গিয়ে এণাক্ষীর মনের পুরনো ঘৃণাটা যেন আতঙ্কিতের মত শিউরে ওঠে। আজ একেবারে সোজা বারান্দার উপর এসে উঠতে আর ঘুরে বেড়াতে এত সাহস পেল কেমন করে সেই চতুর ছায়াটা, যেটা গেট পার হয়ে এক-পা এদিকে এগিয়ে আসবার সাহস পায়নি কোনদিন? নিশি রায়ের মেয়ের জীবনটাই আজ একলা হয়ে গিয়েছে, তাই জেনেই কি আজ অত দুঃসাহস পেয়ে গিয়েছে ভীরু লোভের সেই শক্ত মূর্তিটা, যার নাম জয়দেব? কী সজাগ দৃষ্টি, কত চেষ্টা করে খবর রাখে; ঠিক জেনে নিয়েছে, বাড়িতে এখন এণাক্ষী ছাড়া আর কেউ নেই। এ হেন মতলবের একটা লোককেই বিশ্বাস করেন বাবা, তাঁর ধারণা এই যে, লোকটা শুধু তাঁর কারবারের কাজে একটু খেটে দিয়ে যাবার জন্যেই যখন তখন গিরিডি থেকে চলে আসে।

না, দরজা খুলবে না এণাক্ষী। লোকটি যদি কেঁদে-কেটে অস্থির হয় তবুও না। যদি ভদ্র ছদ্মবেশটা ছেড়ে দিয়ে একেবারে অভদ্র দুর্বৃত্তের মত চিৎকার করে আর ভয় দেখিয়ে ডাকতে থাকে, তবুও, না। কোন সাড়া দেবে না এণাক্ষী।

কিন্তু ডাক শুনেই চমকে ওঠে আর আশ্চর্য হয়ে যায় এণাক্ষী। জয়দেবের দুঃসাহসী মতলবের ডাক নয়; নিতান্ত একটা স্নিগ্ধ ছেলেমানুষী আশার কণ্ঠস্বর—কাকিমা আছেন? কাকিমা? আমি পরমেশ।

পরমেশ? ছোট পিসিমার বড় জায়ের ছেলে, যে পরমেশ রেঙ্গুনে থাকতো, সেই পরমেশ এসেছে।

এই পরমেশকে কোনদিন চোখে দেখেনি এণাক্ষী। শুধু ছোট পিসিমার কাছে পরমেশের কথা শুনেছে—পরমেশ যদি আজ বিদেশে পড়ে না থাকতো

এণা, তবে কি আমি এখানে এসে ঠাঁই নিয়ে দাদার দুর্ভোগের বোঝা ভারী করতাম? পরমেশের মা আমাকে যেমন ঘেন্না করেন, পরমেশ তেমনই আমাকে ভালবাসে। আমি জানি, ওর বাবা আর মা-র উপর ওর যত না টান, আমার উপর তার চেয়ে বেশি টান। রেঙ্গুন যাবার আগে আমাকে বলেছিল, তুমি ভেব না কাকিমা, রেঙ্গুন থেকে আমি ফিরে আসি, তারপর তুমি আমার কাছেই থাকবে। ততদিন, তুমি এ-বাড়িতে যদি থাকতে না পার, যদি বাবা আর মা তোমাকে কোন কটুকথা বলে, তবে সোজা হাজারিবাগে তোমার দাদার কাছে চলে যেও।

বুঝতে অসুবিধে নেই, সেই পরমেশ রেঙ্গুন থেকে ফিরেছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, পরমেশের নামে খুবই সত্যি কথা বলেছিলেন ছোট পিসিমা। রেঙ্গুন থেকে ফিরিই পরমেশ তার শ্রদ্ধার কাকিমারই খোঁজ নিতে এসেছে।

ঘরের দরজা খুলে দেয় এণাক্ষী। পরমেশ বলে—আমি আমার কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। নিশিবাবু হলেন আমার কাকিমার দাদা।

এণাক্ষী বলে—হ্যাঁ, জানি, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

ঘরের ভিতরে এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়েই পরমেশ বলে—আমি কিন্তু আগে কখনও হাজারিবাগে আসিনি। আপনাদের এ বাড়ির কাউকে কখনো দেখিনি, তাই ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে, কাকিমা বোধহয় আপনার ·।

এণাক্ষী—আপনার কাকিমা আমারই পিসিমা। কিন্তু আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে, পিসিমা এখন বাড়িতে নেই।

—কোথাই গিয়েছেন?

—কীর্ত্তন শুনতে।

—তাহলে তো বুঝতেই পারছি, কীর্তনের ব্যাপার, কাকিমার ফিরতে তো মাঝরাত হবে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

হেসে ফেলে এণাক্ষী—না, মাঝরাত নয়। তবে, অন্তত তিন চার ঘণ্টার আগে ফিরবেন না।

—আজ তাহলে আমি উঠি। কাল আসবো। কাকিমাকে বলবেন, আমি এসেছিলাম।

—আসুন, কিন্তু···।

কি-যেন বলতে গিয়ে এণাক্ষীর গলায় স্বর কুণ্ঠীত হয়ে পড়ে। কথাটা নিতান্ত সামান্য একটা কথা, বলা দরকার কিনা বুঝতেও পারে না। না বলাও

উচিত হবে কিনা, তাও যেন বুঝে উঠতে পারছে না এণাক্ষী।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় পরমেশ—আপনি কিছু বলছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি এলেন, অথচ আপনাকে এক কাপ চা দিতেও পারলাম না।

পরমেশ হেসে ফেলে—সেটা কি আর এমন গুরুতর অপরাধ? কিন্তু…

পরমেশের বক্তব্যটাও যেন একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে কুণ্ঠীত হয়ে যাচ্ছে।

এণাক্ষী—কিছু বলছেন?

পরমেশ—হ্যাঁ, এক পেয়ালা চা দিতে কেন যে পারলেন না, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—যেতে দিন এসব কথা।

পরমেশ এইবার একটু আশ্চর্য না হয়ে পারে না—কথাটা সামান্য কথাই বটে, কিন্তু…আপনি বলতে আপত্তি করে কথাটা সত্যিই একটা রহস্যের মত করে দিলেন। আমার অবশ্য না শুনলেও চলতে পারে। কিন্তু…

—না, না, কিছু নয়। আপনি মিছিমিছি বাড়িয়ে ভাববেন না।

পরমেশ হাসে—না, বাড়িয়ে কিছু ভাবছি না। সব বাড়িতেই মাঝে মাঝে এরকম একটা অপ্রস্তুত অবস্থার ব্যাপার ঘটে থাকে। হয় চা নেই চিনি নেই; হয়তো চা আছে চিনি নেই। কিংবা চা চিনি দুইই আছে কিন্তু দুধ নেই। এক পেয়ালা চা তখন সত্যিই একটা সমস্যা হয়ে ওঠে।

এণাক্ষীও হেসে ফেলে—আপনি দেখছি, খুব ছোট করে ভেবে ফেলছেন।

—তার মানে?

এণাক্ষীর মুখটা হঠাৎ গম্ভীরতায় মেদুর হয়ে ওঠে। তার মধ্যে একটা বিরক্ত ভাবের ছায়াও যেন মৃদুভাবে কাঁপে।

এণাক্ষী—সেই জন্যই তো আপনাকে আগে বলে দিয়েছি, যেতে দিন এসব কথা। আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না।

—কিন্তু, আপনি এত কথা না বলে সেই সামান্য কথাটা এতক্ষণে বলে দিলেই তো পারতেন।

—কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তাহলেই বুঝবেন, কেন আপনাকে এক পেয়ালা চা দিতে পারলাম না।

বিব্রতভাবে তাকিয়ে থাকে পরমেশ। চোখের দৃষ্টিটা একটু বিষন্ন। সে বিষণ্ণতাও যেন আস্তে আস্তে করুণ হয়ে যাচ্ছে। কুণ্ঠীতভাবে পরমেশ বলে—আমি তো জানি, নিশিবাবুর আর্থিক অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয় যেজন্যে…

—কি বললেন ?

—না সেজন্য কিছু নয়। যা সম্ভব নয়, মানুষ সেটা ইচ্ছে থাকলেও যে সম্ভব করতে পারে না।

—কি সম্ভব নয় ?

—এই যে এক কাপ চা দেওয়াও সম্ভব হলো না, এটা আপনাদের পক্ষে দুঃখের কথা ঠিকই, কিন্তু লজ্জার কথা একটুও নয়। ছেলেবেলায় আমাদেরও এমন দিন গিয়েছে যখন দেখেছি, কোন ভদ্রলোক বাড়িতে এলে তাঁকে এক পেয়ালা চা দেওয়া আমাদের পক্ষে কত অসাধ্য ছিল। বাবা তখন মাইনে পেতেন পঁচিশ টাকা ; অথচ আমরা তখন ভাই-বোন মিলে পাঁচজন। তার ওপর ছোট-কাকা রোগে অশক্ত। আমার এই কাকিমাকেও তখন দেখেছি, নিজে না খেয়ে ডালের বড়া দুটো আমার জন্যেই তুলে রেখে দিয়েছেন ; ইস্কুল থেকে ফিরে এসে আমি যেন কিছু খেতে পাই, সেই জন্যে।

—আপনি ভুল বুঝেছেন পরমেশবাবু। আমাদের অবস্থাটা কোন সমস্যা নয়। বাড়িতে অন্য কেউ থাকলে আপনাকে চা দিতে কোন অসুবিধে হত না। চা চিনি দুধ, সবই আছে।

—তবে ?

—আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। তার মানে, আমি ওসব জিনিস ছুঁই না।

—কেন ?

—মানা আছে।

—কে এমন অদ্ভুত মানা করলো ?

—ভাগ্য।

—কি বললেন ?

—ওসব জিনিস আমার ছুঁতে নেই, পরমেশবাবু।···আচ্ছা, ছোট পিসিমাকে বলবো, আপনি কবে আবার আসবেন ?

পরমেশ তবু দাঁড়িয়ে থাকে। এতক্ষণে যেন একটা হঠাৎ উপলব্ধির কঠোর আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পরমেশ। এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে। নিশি মায়ের এই মেয়ে একটা ধবধবে সাদা শূন্যতা।

লজ্জিত অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে বিড়বিড় করে পরমেশ।—মাপ করবেন। আমি বুঝতে না পেরে অভদ্রের মত আপনাকে বিরক্ত করেছি।

চলে যায় পরমেশ।

বাড়িটা আজও আবার নীরব হয়েছে ; পাঁচ-মাসের আগের সেই দিনটারই মত নীরব। কারণ বাড়িতে কেউ নেই। সবাই সেই সঙ্গে পাড়ার আরও অনেক মহিলা এক মাতাজীর উপদেশ শুনতে এক ক্রোশ দূরের একটা আশ্রমে গিয়েছেন। কিন্তু আজকে সন্ধ্যাটা ঠিক সেদিনের সন্ধ্যাটার মত নয়। সে সন্ধ্যার নবাবগঞ্জের সড়কের দুপাশের গাছের মাথায় শুধু জোনাকীর আলো মিটমিট করছিলো! আজ আকাশে ঢলঢলে একটি আধখানা চাঁদ। জানালার উপর বেয়ে ওঠা লতাটা ঝিরঝিরে বাতাসের ছোঁয়ায় কেঁপে কেঁপে দুলছে। আর জানালারই কাছে একটি টেবিলের ওপর মাথাটা নামিয়ে নিয়ে একেবারে নিঝুম হয়ে বসে আছে এণাক্ষী। এণাক্ষীর খোঁপাটা যেন আধখানা চাঁদেরই আলোর মায়াতে স্নান করবার জন্য এলিয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে এণাক্ষী। কান্নাটা যেন বিনা দোষে জব্দ হওয়া একটা জীবনের কান্না। বুঝতে পেরেছে এণাক্ষী, সাদা থানের এই সাজটা এখন একটা মিথ্যা অহঙ্কারের সাজ। একটা ছদ্মবেশেই বলা যায়। প্রাণটাও যে আর সাদাটে শূন্যতা নয়। টেবিলেরই উপর ফুলের যে স্তবকটা নানা রঙের মায়া ছড়িয়ে হাসছে, সেটা যে পরমেশেরই দেওয়া উপহার। এমন পরিণাম যে কোনদিন কোন কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি এণাক্ষী, আবার একদিন কারও রঙীন উপহারের কাছে এভাবে মাথা পেতে বসে থাকতে হবে! ভালবাসার কোন ইচ্ছা নেই, কোন চেষ্টা নেই, এমন একটা প্রাণ ভালবেসেই বা ফেললো কেমন করে? একবার ভালবেসে জীবনটা যে আঘাত পেয়েছে, সে আঘাতের স্মৃতিটাও এত ফিকে হয়ে যায় কেমন করে?

কেমন করে হলো, বুঝে উঠতে পারে না এণাক্ষী। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই, যা আবার কপালে সম্ভব বলে মনে হয়নি, তাই সম্ভব হয়েছে। পরমেশের ভালোবাসাকে তুচ্ছ করবার শক্তি নেই এণাক্ষীর।

তুচ্ছ করে লাভই বা কি? প্রথম দিনের সেই দেখার পরের দিনই যখন আবার এবাড়ির সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠতেই বাইরের বারান্দার উপর অজানা আগন্তুকের পায়ের শব্দও বেজে উঠতে শুনেছিল এণাক্ষী; তখন দু'চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল, যদিও তখনও বারান্দার উপর কোন আগন্তুকের ছায়া এণাক্ষীর চোখেও পড়েনি। ঘরের ভেতরে বেতের মোড়াটার উপর স্থির হয়ে বসে, দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো সেই ছবিটারই দিকে তাকিয়ে, যেন একটা আনমনা আবেশের মধ্যে সব ভাবনা ডুবিয়ে দিয়ে এণাক্ষীর বধির আত্মাটা

শুধু স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এই টাউন থেকে দশ মাইল দূরে, শালের জঙ্গলের ভিতরে কল্‌কল করে যে ঝরণাটা, তার নাম বোকারো ঝরণা। লোকে বলে এই ঝরণারই জল নদী হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কয়লার ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া সেই বোকারের শালবনের দিকে চলে গিয়েছে। এই ঝরণারই ছবি; এণাক্ষীর নিজের হাতের আঁকা একটা পেন অ্যাণ্ড ইঙ্ক। ঝরণার গা-ঘেষা একটা পাথরের উপর বসে একটা হরিণ যেন মুগ্ধ হয়ে ঝরণার গান শুনছে।

আজও চেষ্টা করলে মনে করতে পারে এণাক্ষী, কবে আর কিজন্য ছবিটা আঁকা হয়েছিল। শুধু চেষ্টা করে নয়, আপনা হতেই মনে পড়ে যায়; পুরনো সুস্বপ্নের ছবি যেমন জাগা চোখের উপরে হঠাৎ ভেসে ওঠে। অনেকদিন আগে, এ শহরে এসে ঠাঁই নেবার পর তখন একটা মাসও পার হয়নি, বোকারো ঝরণা দেখতে গিয়ে এণাক্ষীর মনটা যেন একটা অদ্ভুত মায়ার আবেশে ডুবে গিয়েছিল। ঐ কালো পাথরটার উপর স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ বসেছিল এণাক্ষী। ঝরণার জলের কল্‌কল্ শব্দের গানটা যেন এণাক্ষীর বুকের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। উঠতে ইচ্ছে করে না; চলে যেতে ইচ্ছে করে না। শুধু এইভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

ছবিটা আঁকবার পর, এণাক্ষীর চোখ দুটো হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চমকে উঠেছিল, সে-কথাও মনে পড়ে বইকি। দেখতে ওটা বোকারের ঝরণার ছবি বটে, কিন্তু এণাক্ষীর জীবনের একটা পিপাসিত ব্যাকুলতার ছবি বললেও ভুল বলা হবে না।

ছবিটাও যে ধন্য হয়েছিল একদিন। মনোময় এসে ঐ-ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল; ছবিটার বুকের উপর মনোময়ের নিঃশ্বাসের বাতাস ঝরে পড়েছিল। মনে হয়েছিল এণাক্ষীর, ছবির বুকের কালির আঁচড়গুলি রঙিন হয়ে গিয়েছিল। তারপর···তারপর ভাবতে গেলে সবই যে ঝাপ্‌সা মনে হয়! ছবিটাকেও যেন দেখতে পাওয়া যায় না। কে যেন ধুয়ে মুছে ছবিটাকে একেবারে সাদা করে দিয়েছে।

বারান্দার উপরে অজানা আগন্তুকের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠেছে এণাক্ষীর চোখের এই ঝাপ্‌সা দৃষ্টিটাই। আজ আবার এমন অসময়ে কে এল? এই শব্দ যে কালকের সন্ধ্যার সেই শব্দটারই প্রতিধ্বনির মত। সত্যিই কি পরমেশ এসেছে?

ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়েছিল এণাক্ষী; কিন্তু কি আশ্চর্য, রাগ করতে পারেনি; একটুও বিরক্ত হতে পারেনি। শুধু একটু আশ্চর্য হতে হয়েছিল,

পরমেশের মত মানুষেরও কাণ্ডজ্ঞান এত কম হয় কেন? ছোট পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে হলে সকাল বেলাতেই আসা উচিত ছিল। সন্ধ্যাবেলা, যখন বাড়িতে কেউ থাকে না বলে জানাই আছে পরমেশের, তখন আবার এখানে আসবার দরকার কেন হলো? নিশি রায়ের মেয়ের বিধবা চেহারাটা এত স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েও যে মানুষ এখানে আসে, সে খুব বুদ্ধিমান মানুষ নয়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল এণাক্ষী, না, আজ আর কোন কথা নয়, শুধু একটি কথা বলে পরমেশের ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে—আপনার কাকিমা এখন বাড়িতে নেই। সকাল বেলাতে এলে দেখা পাবেন।

ঠিক এই সামান্য কয়েকটা কথা গম্ভীরভাবে বলেছিল এণাক্ষী। কিন্তু বলে কোন লাভ হয়নি। এণাক্ষীর গম্ভীর ভাষার সামান্য বক্তব্য শুনে পরমেশের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়নি, কিংবা পরমেশের চোখের দৃষ্টির ব্যস্ততাও উদাস হয়ে যায়নি। বরং হেসেই ফেলেছিল পরমেশ।—কাকিমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

—কবে?

—এই তো, মন্দিরের কীর্তন সভাতে গিয়ে কাকিমার সঙ্গে দেখা করে তারপর সোজা এখানে এসেছি।

—বাবা এখন বাড়িতে নেই।

—তা'ও জানি। আপনার বাবার সঙ্গেও দেখা হয়েছে।

আর কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এণাক্ষী। কিন্তু পরমেশ হঠাৎ তার মুখের হাসির সব চঞ্চলতা যেন শান্ত করে দিয়ে এণাক্ষীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে, যেন একটা করুণ দুঃসাহসের মৃদুস্বরের মত আস্তে আস্তে কথা বলে—আমি আসাতে আপনি কি সত্যিই বিরক্ত হলেন?

এণাক্ষী—না, কিন্তু…

—বলুন।

—কি বলবো বুঝতে পারছি না, বললে আপনি হয়তো আমাকে অভদ্র বলে মনে করবেন।

—কিছুই মনে করবো না। আপনি বলুন।

—আমার কাছে আপনার তো কথা বলবার কিছু নেই, কোন দরকারও নেই। কাজেই—।

—কিন্তু আপনার কথা শুনতে যে আমার ভাল লাগে।

এণাক্ষীর চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ কঠোর হয়ে ওঠে।—এসব কথা বলা

আপনার একটুও উচিত হচ্ছে না।

পরমেশের মুখটা করুণ হয়ে যায়। মাথা হেঁট করে, যেন একটা হঠাৎ-আহত স্বপ্নের অপমান আর যন্ত্রণা লুকিয়ে ফেলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে পরমেশ। তারপরেই বলে—কিছু মনে করবেন না। ভুল করে একটা কথা বলে ফেলেছি। আচ্ছা, চলি।

এণাক্ষী—বসুন।

আশ্চর্য হয় পরমেশ। আশ্চর্যের কারণ, এণাক্ষীর চোখের অদ্ভুত দৃষ্টিটা। যেন নিজেরই উপর রাগ করে অনুরোধের কথাটা বলে ফেলেছে এণাক্ষী। পরমেশের কুণ্ঠিত মূর্তিটার দিকে না তাকিয়ে এণাক্ষী সত্যিই যেন একটা ধূর্ত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে রাগ করে কথা বলে।—কাল আমি আপনাকে এমন কোন কথা বলিনি, যে-কথা শুনতে কারও ভাল লাগতে পারে। হ্যাঁ…অচেনা মানুষের সঙ্গে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছি, আর সেই জন্যেই আপনি বোধহয় মনে করেছেন যে কি মনে করেছেন জানি না…কিন্তু আপনাকে দোষ দেবই বা কি করে?

—কি বললেন?

—কিছু মনে করবেন না। আমি কিন্তু বেশি কথা বলতে পারবো না।

—সত্যিই আপনি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু আমি কিছুই মনে করছি না। আমি যাই।

এণাক্ষী হঠাৎ মাথা হেঁট করে যেন হঠাৎ জব্দ হয়ে যাওয়া একটা বিদ্রোহের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই, যেন নিজের বুকের ভিতরের একটা দুঃসহ ভীরুতার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা বলে—হ্যাঁ, আজ চলে যান পরমেশবাবু, কাল আসবেন।

—কাল কখন আসবো?

—যখন ইচ্ছে।

শুধু কাল নয়, পর পর রোজই এসেছে পরমেশ। আর বুঝতেও কিছু বাকি নেই, কেন আসে পরমেশ। পরমেশ যেন একটা একলা পড়ে থাকা জীবনের পিপাসা। কিন্তু পৃথিবীতে এত ছায়া থাকতে আর কোন ছায়ার কাছে নয়, এণাক্ষীর এই সাদাটে জীবনের ছায়াটারই কাছে ছুটে আসে। বোকারো ঝরণার পেন অ্যাণ্ড ইঙ্কের কাছে দাঁড়িয়ে পরমেশও মুগ্ধ হয়ে হেসেছে। একদিন বলেও ফেলেছে পরমেশ—এই হরিণটার দশা আমারই মত।

—কেন ?

—ঝরণাটায় শব্দ শুনেই মুগ্ধ ; অথচ ঝরণার জল যে ··।

এণাক্ষী হাসে—মন্দ কি ?

পরমেশ—কি বললে ?

এণাক্ষী—এই ভাল। এর চেয়ে বেশি আর দরকারই বা কি ?

পরমেশ—নিশ্চয় দরকার।

এণাক্ষী—না।

পরমেশ হাসে—তাহলে বল যে, বেচারার অবস্থার জন্য ঝরণাটির মনে কোন দুঃখ নেই।

এণাক্ষী—না, দুঃখ করবার কিছু নেই।

পরমেশ—এ কিরকম কথা হলো ?

এণাক্ষী—ভালবেসেছ যখন, তখন আর দুঃখ করবে কেন ?

পরমেশ—ভালবাসার পর আর কিছু নেই ?

এণাক্ষী—না।

পরমেশ—ওটা ফাঁকির কথা।

এণাক্ষী—না।

পরমেশ—চক্ষুলজ্জার কথা।

এণাক্ষী—মোটেই না।

পরমেশ—তবে একটা ভয়ের কথা।

এণাক্ষী—তা হতে পারে।

পরমেশ—ছিঃ, আর কিসের ভয় এণা ? আমার মধ্যে ভয় করবার মত তুমি কি দেখলে বল ?

এণাক্ষীর চোখ ছলছল করে।—তোমাকে ভয় নয়। তুমি বিশ্বাস কর, তোমাকে ভয় নয়।

কে জানে জীবনের কোন ভয়ের কথা বলতে চাইছে এণাক্ষী। কিন্তু পরমেশের চোখ যেন এণাক্ষীর ভীরুতামধুর এই মুখের দিকে তাকিয়ে আরও মুগ্ধ হয়ে ওঠে। এণাক্ষীর ভালবাসা যেন পরমেশের জীবনের একটা জয় করা অর্জন। এণাক্ষীর এই কঠোর সাদাটে শূন্যতার প্রতিজ্ঞাটা নিজেকে মিথ্যে করে দিয়ে পরমেশের ভালবাসা স্বীকার করে নিয়েছে ; বিধবা হয়ে আর একটা একলা জীবন হয়ে পড়ে থাকবার জন্য মানত করেছিল যে মেয়ে, সেই মেয়ের প্রাণ আজ রঙীন ফুলের মালঞ্চ হয়ে গিয়েছে। এইবার একদিন ছোট কাকিমাকে বলে

আর দরকার হয়তো নিশিবাবুকেও বলে নিয়ে একটি শুভদিনে দীপ জেলে দিলেই হয়।

তার আগে, এণাক্ষীর কাছ থেকেও জেনে নিতে চায় পরমেশ ; আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? সত্যিক কি আর অপেক্ষা করবার দরকার আছে?

যে জীবনবীমা কোম্পানীর কাজ করে পরমেশ, সেই কোম্পানী এই হাজারিবাগেই নতুন অফিস করেছে। আশে পাশের চারটি জেলার কাজ চালাবার কেন্দ্র এই অফিসটারই প্রধান অফিসার পরমেশ।

পরমেশও এখন আর হেসে হেসে ঠাট্টা করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না— আমিও কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলাম এণা, হাজারিবাগ যে আমার ভালবাসারও হেডকোয়ার্টার হয়ে উঠবে?

পরমেশ যে কদিন হাজারিবাগের বাইরে থাকে, সে-কদিন এণাক্ষীর জীবনটা দুঃসহ একটা শূন্যতার মধ্যে একলা হয়ে যায়। প্রতীক্ষাটাও যেন রামায়ণের শবরীর প্রতীক্ষার চেয়েও অন্তহীন। কবে ফিরবে পরমেশ? কবে আবার দেখতে পাওয়া যাবে, এই ঘরের ভিতরে ঐ চেয়ারে বসে এণাক্ষীর মুখের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে পরমেশ?

কিন্তু এণাক্ষীর প্রাণটা যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যেই কাঁদছে। একটা কঠিন প্রতিজ্ঞার বেড়া দিয়ে এণাক্ষী একটা ভুলের পাপকে আটক করে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এই ভালবাসাই বেঁচে থাকুক, এর মধ্যে এণাক্ষীর অপয়া শরীরটা যেন আর ঢুকে পড়তে না পারে। ভালবাসার রংটুকু বুকের ভেতরই থাকুক, সে রং যেন সিঁথিটাকে ছুঁয়ে না দেয়। পরমেশ যেন এণাক্ষীকে বিয়ে করতে না চায়। এণাক্ষীও যেন কোন মুহূর্তের দুর্বলতায় ভুলে এমন কথা না বলে ফেলে, এবার আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও পরমেশ।

পরমেশ যাকে ভালবেসেছে, সে তো এই বিধবা মূর্তিটাই। এই পাঁচ মাসের মধ্যে পরমেশের গায়ে এণাক্ষীর সাদা থানের আচলটাও লাগেনি।

ছুঁয়ে ফেলার আর ছোঁয়া নেবার কোন লোভের দাবিকে এই শরীরের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি এণাক্ষী, মনটাকে যতই উতলা করে দিক না কোন সে লোভের দাবি।

পরমেশও কি অবুঝের মত ভুল সন্দেহ করে রাগ করবে?

·

পরমেশের পায়ের শব্দ শুনেই চমকে ওঠে এণাক্ষী। হ্যাঁ, ভুলে যায়নি

পরমেশ, ঠিক সময়েই এসেছে, আজ যে পরমেশকে স্পষ্ট করে বলে দেবার কথা, আর কতদিন অপেক্ষা করবে পরমেশ? কাকিমার কাছে এইবার ইচ্ছের কথাটা বলে ফেলতে পারে কিনা পরমেশ?

ঘরের ভিতর ঢুকেই পরমেশ সোজা টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। আধখানা চাঁদের আলোতে আজ পরমেশের চোখের দৃষ্টিটাও যেন অদ্ভুত রকমের বিহ্বল হয়ে উঠেছে। বোধহয় এখনি এণাক্ষীর খোঁপাটাকে ছুঁয়ে ফেলবে পরমেশ। ধড়ফড় করে উঠে বসে এণাক্ষী। চেয়ার ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ায়।

পরমেশ বলে—আজ আর আমাকে ভয় করো না এণা!

—না, তোমাকে একটুও ভয় করি না।

—তবে কাকে ভয়?

—নিজেকে।

—কেন? কিসের ভয়?

—তোমার ক্ষতি হবে এই ভয়।

—আমার আবার কি ক্ষতি হতে পারে?

—সে বড় ভয়ানক ক্ষতি। তুমি বুঝতেই পারবে না, কেন তোমার এমন ক্ষতি হলো আর কে-ই বা তোমার ক্ষতি করলো।

—যত সব আজগুবি কল্পনা, উপোস করে করে মনটার এই দুর্দশা ঘটিয়েছ।

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে এণাক্ষী।—তুমি আমায় মাপ কর পরমেশ, তুমি চাইলেও আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।

—এ কি-রকমের অদ্ভুত কথা বলছো এণা?

—অদ্ভুত কথা নয় পরমেশ, আমার জীবনের ভয়ানক অভিশাপের কথা।

—কিসের অভিশাপ?

—আমি বিধবা।

—কিন্তু আমি তো তা মনে করি না। আমার সেকথা মনেও হয় না।

—আমি একটা বিধবা-মহলের বিধবা। বিধবা হয়ে থাকাই আমার চিরকালের অদৃষ্ট।

—এটা তোমার কুসংস্কার।

—কুসংস্কার হলেও উপায় নেই পরমেশ। আমার ভয় ভাঙবার নয়, আমি আবার বিধবা হতে পারবো না।

—ছি ছি; এত বাজে ভয়ও মানুষের মনে আসে?

—আমার কাছে যে একটুও বাজে ভয় নয়।

—আমি বলবো, এটা তোমার একটা বাজে চক্ষুলজ্জা কিংবা লোকলজ্জার ভয়। বিধবা মেয়ে বিয়ে করেছে, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষের চোখে এরকম একটা নিন্দের দৃষ্টি ফুটে উঠবে, এই হলো তোমার ভয়।

এণাক্ষীর চোখের করুণ দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে ওঠে।—বিশ্বাস কর, ও ভয় আমার কাছে ভয়ই নয়। যদি প্রমাণ পেতে চাও, তবে তাও পেতে পার। নিশি রায়ের বিধবা মেয়ে তোমাকে ভালবাসে, এ কথাটা দশজনের সামনে চেঁচিয়ে বলে দিতে পারি, কোন চক্ষুলজ্জা আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গিয়েছে পরমেশের যুক্তিময় মুখরতা। এণাক্ষীর ভালবাসার একটা অদ্ভুত সত্যের কথা শুনে পরমেশের চোখের দৃষ্টিটা বিস্ময়ে ভরে উঠতে থাকে। পরমেশকে ভালবেসেও পরমেশের কাছে আসতে পারবে না, এই শাস্তিটাকে সারা জীবন আঁকড়ে থাকতে চাইছে এণাক্ষী। কিন্তু বুঝতে পারছে না, পরমেশকেও যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

—না এণাক্ষী।

—কি ?

—স্বীকার করছি, তোমার ভালবাসা কোন চক্ষুলজ্জা বা লোকলজ্জাকে ভয় করে না। কিন্তু, ওরকম একটা কুসংস্কারকে ভয় করবে কেন ? তোমার ওসব বাজে ভয়ের বাধা আমি মেনে নিতে পারি না।

—বেশ মেনে নিচ্ছি, আমার ভয়টা একটা নিতান্ত বাজে আর নিতান্ত মিথ্যে কুসংস্কারের ভয়। কিন্তু ভেবে দেখ, বিয়ের পর যদি সত্যিই তুমি · ।

ঝাপ্‌সা আর উতলা আর ভেজা-ভেজা চোখ দুটোকে দু'হাত দিয়ে ঘষে নিয়ে এণাক্ষী যেন সেই অভিশাপের ভয়টাকেই একটা উতলা সত্ত দিয়ে চেপে ধরে— তুমি তাহলে আমাকে এখনই অনুমতি দিয়ে দাও যে···।

—কিসের অনুমতি ?

—যদি সত্যিই তুমি আমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মত চলে যাও, তবে আমিও চলে যাব।

—একথার মানে কি ?

—আমি বিষ খাব।

—এ কথার কোন মানে হয় না।

—বেশ তো, কোন মানে হয় না, আমার এই সামান্য দাবিটাকে মেনে

নিয়ে এখনই অনুমতি দাও, আমিও যেন সেই যন্ত্রণা আর ঘেন্নার একলা জীবন নিজের হাতে শেষ করে দিই। তুমি খুশি হয়ে অনুমতি দাও।

—এমন অদ্ভুত, এমন নিষ্ঠুর, এমন বিশ্রী অনুমতি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কেন?

—আমি থাকবো না বলে তোমাকেও মরতে বলবো, আমাকেও কি একটা কুসংস্কারের মানুষ বলে তুমি মনে করলে?

—আমি যদি বলি, তুমি কুসংস্কারেরই মত একটা বিশ্বাসের বশে একথা বলছো?

—একথা বলতে তুমি পার না।

—পারি।

—কেমন করে?

—তোমার বিশ্বাস, বিয়ে না করে, শুধু ভালবাসা দিয়ে কাউকে আপন করে রাখা যায় না। তোমার ধারণা, আমি এখনও তোমার আপনজন হইনি। তোমার ধারণা, যদি বিয়ে না হয়, তবে ভালবাসাটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।

—এরকম তর্ক করলে ·।

—তর্ক নয়, তুমি বুকে হাত দিয়ে বল, আমাকে ভালবাসেতে পারনি।

—বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি ভালবেসছি।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার তো বিয়ে হয়নি।

—সেটা কে না জানে?

—তবে আর বিশ্বাস করতে পারছো না কেন যে, বিয়ে না করেও ভালবাসা থাকতে পারে।

—থাকতে পারে। অসম্ভব নয়।

—বিয়ে না হলেও তুমি আমাকে এ জীবনে কখনো ভুলে থাকতে পারবে কি?

—সম্ভব নয়।

—তাহলে আর কেন আপত্তি করছো পরমেশ? চিরকাল আমার ভালবাসা নাও, কিন্তু আমাকে নিও না।

এণাক্ষীর জলভরা চোখের এই মিনতি যেন একটা করুণ বেদনার কুহক। পরমেশর জীবনটাকে অদ্ভুত এক মায়া দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকতে চায়। তা না হলে এণাক্ষীর বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন হয়ে যাবে।

এণাক্ষীর জীবনের এই করুণ বেদনায় কুহকটাই যেন এণাক্ষীর জলভরা চোখের এই মিনতি। পরমেশের কাছ থেকে চিরকালের ভালবাসার প্রতিশ্রুতি পেতে চাইছে। তা না হলে সুখী হতে পারবে না, শান্তি পাবে না এনাক্ষী।

এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে বুকের ভিতরে যেন একটা বেদনার্ত কান্নার আর্তনাদ শুনতে পায় পরমেশ। এণাক্ষীর এই মুখটাকে আর চোখের কাছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, এণাক্ষীর ভালবাসার ভাষা আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না; পরমেশের জীবনটা যে দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে একলা হয়ে গিয়ে ছটফট করছে। এ রিক্ততা সহ্য করা যে অসম্ভব। জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বের আনন্দটাই যে ঝরে গিয়ে পরমেশের প্রাণটাকে নিঃস্ব করে দিল।

এমন পরিণাম কল্পনায় দেখতেও ভয় করে। এই তো, পরমেশের চোখের মত কাছে, এণাক্ষী যে চিরকালের প্রতিশ্রুতিরই মূর্তিটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রতিশ্রুতিকে চিরকালের মত বরণ করে নিতে অসুবিধা কোথায়? নিতে না পারলে পরমেশের জীবনটাই বা থাকবে কি নিয়ে? বিয়ে হবে না, শুধু এই সত্যটা জেনে এক মুহূর্তের মধ্যে ভালবাসার সত্যটা স্বার্থের মত ছোট হয়ে গিয়ে পালিয়ে যাবে, এমনটা হতে দিলে যে পরমেশ নিজেকেই আপমান করবে। এণাক্ষীর ভালবাসার তুলনায় কত নীচু হয়ে যাবে পরমেশের ভালবাসা! শুধু ভালবাসা! শুধু তাই বা কেন? নিজেকেও যে ঠকাতে হবে।

ওই এণাক্ষী এখনই যদি মরে যায়, তবে পরমেশ কি তার বেঁচে থাকা জীবনের কোন মুহূর্তে এণাক্ষীকে ভুলে থাকতে পারবে? সেই অদেখা এণাক্ষীকেও যে মনে মনে চিরকাল ভালবাসতে হবে! তবে আর···।

পরমেশের চোখ দুটো যেন নিজেরই বুকের ভিতর থেকে উথলে ওঠা এক পরম বিশ্বাসের ছোঁয়া পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমি মেনে নিলাম, অদৃষ্টের ইচ্ছাটাকেই মেনে নিলাম। বিয়ে না হোক, কিন্তু ভালবাসা হারিয়ে ফেলতে পারবো না। অসম্ভব।

এণাক্ষীর চোখ দুটোও জ্যোৎস্নাময় হয়ে হেসে ওঠে। এণাক্ষীর প্রাণটাই যেন সব কান্নার জল মুছে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে আর কিছু বলবার নেই।

পরমেশ বলে—আজ তাহলে আসি।

—এস, কিন্তু একটা অভিযোগ আছে।

—কি?

—তুমি মাঝে মাঝে আসতে বড় বেশি দেরি করে দাও।

—মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়, তাই। তা না হলে···।

—হ্যাঁ, মনে থাকে যেন, তা না হলে, একটা দিনও বাদ দিতে পারবে না। আসতেই হবে।

পরমেশ হাসে—না এলে যে আমারই ক্ষতি।

চলে যায় পরমেশ। ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর অপলক চোখ তুলে দেখতে থাকে এণাক্ষী।

গেটের কাছে গাছের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন নিশি রায়। কিন্তু, নিশি রায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কে? জয়দেব?

সেই মুহূর্তে জানালার কাছ থেকে সরে গিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে যায় এণাক্ষী।

পাড়ার পাঁচজনে নানারকম কথা বলছে, তাই বোধহয় ছোটপিসিমা কথাটা জিজ্ঞেস না ক'রে আর থাকতে পারলেন না।—পরমেশ তো প্রায় রোজই এখানে আসছে; কিন্তু পরমেশ কি তোমাকে কোন কথা স্পষ্ট করে বলেনি এণা?

—কি কথা?

—কোন ইচ্ছের কথা।

—না।

—তবে?

—পরমেশবাবু শুধু আসবেন আর চলে যাবেন। এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করো না।

—তুমি কিছু বলনি?

—না।

—কেন?

—কিছু বলবার দরকার নেই।

—কেন? বয়স থাকলে বিধবা মেয়েরও তো আজকাল বিয়ে হয়।

—তা হয়। কিন্তু তোমাদের বিধবা মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।

—কেন হতে পারে না?

—অপয়া বলে হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়।

—এটা কিন্তু একটা রাগের কথা হলো। এমন রাগের কোন মানে হয় না।

—মানে না থাকাই ভাল।

কিন্তু পরমেশ যে আসে আর যায়, সেটা কি ভাল দেখাচ্ছে?

—আমাকে বুঝতে খুব ভুল করেছো পিসিমা। আমি অপয়া হতে পারি কিন্তু পাগল নই।

—কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে, তুমি একটা পাগলামিই করছ এণা। বিয়েই যদি তুমি না করো তবে···।

—তবে কি কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারে না?

—কিন্তু শ্রদ্ধা করলেই বিয়েটা হয়ে যাওয়া ভাল নয় কি?

—না হলেও চলতে পারে।

—এ রকম কোন নিয়ম শাস্তরে আছে নাকি?

—না থাকলেও করে নিলেই হয়। দোষ কি?

—বেশ কথা! আমি তা হলে পরমেশকে কিছুই বলব না?

—না।

ছোট পিসিমা পরমেশকে কোন কথা বলেননি, কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেননি। কিন্তু যে নিময়টাকে ঠাট্টা করে এণাক্ষীকে কথা শোনালেন ছোট পিসিমা, সেই নিয়মটাও কত সত্য হয়েছে। আগে যেমন রোজই এসে হেসে হেসে দেখা দিত পরমেশ, আজও ঠিক তেমনই হেসে হেসে দেখা দেয়। কখনও বাইরে ঘরের ভিতরে থেকে, কখনও বা বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে, আর কখনও বা বাগানের মাটিতে নেমে আর বেড়িয়ে বেড়িয়ে, পরমেশ আর এণাক্ষীর ভালবাসার বাস্তবতার আনন্দটা হেসে হেসে গল্প করে।

কেউ জানে না, তাই নিন্দেটাও বড় বেশি রটে বেড়ায়। নিন্দেটা তো জানে না যে জীবনের একটা অভিশাপের ভয় থেকে বাঁচবার জন্য সিঁথিতে সিঁদুর দিতে চাইছে না নিশি রায়ের বিধবা মেয়ে; সিঁদুরকে বুকের ভিতরেই লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

কিন্তু তাই বলে কি নির্জলা উপোস ছেড়ে দিতে পেরেছে এণাক্ষী? না. খাওয়া-দাওয়া আর আচার-বিচারের সেই সাদাটে শুচিতা তেমনই অটুট আছে। আজও কোন রঙীন আসনে বসে না এণাক্ষী। শরীরের কোন যত্ন দূরে থাকুক, বরং ভয়ংকর একটা তুচ্ছতা দিয়ে শরীরটাকে শাসিয়ে রেখেছে এণাক্ষী। কেউ তো জানে না যে, এই শরীরটাকেই কত ভয় করে এণাক্ষী, তাই সন্দেহ করতে তাদের মনে বাধে না, আর নিন্দে করতেও মুখে বাধে না।

কিন্তু এটা একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের ব্যাপার, বাইরের মানুষের চোখে যে ঘটনাটা এত দৃষ্টিকটু হয়ে ঠেকেছে; ঘরের মানুষদের মনে যে ঘটনাটা এত বড় একটা অস্বস্তি হয়ে উঠেছে, সে ঘটনাটা যেন নিশি রায়ের চোখেই পড়েনি।

পরমেশ আর এণাক্ষী গল্প করে করে বাগানে ঘুরে বেড়ায়; দৃশ্যটা যেন রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া কোন ঘটনার দৃশ্য নয়। একটা গল্পের দৃশ্য মাত্র। সে দৃশ্য দেখে সন্দেহ করবার, ভাবনা করবার, কিংবা পছন্দ বা অপছন্দ করবার কোন কথাই যেন নিশি রায়ের মনে দেখা দেয় না। নিশি রায়ের দৃষ্টিটা যেন একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি, না দুঃখিত না সুখিত।

এণাক্ষীর সঙ্গে কোন কথা বলবারও সুযোগ পান না নিশি রায়; এতই তাঁর ব্যস্ততা। দিনের পর দিন পার হয়েছে; মাসের পর মাস পার হয়েছে, পরমেশকে কতবার বাইরের ঘরে বসে থাকতে দেখেছেন নিশি রায়। কিন্তু দু'মিনিট সময় করে বসে বা দাঁড়িয়ে পরমেশের সঙ্গে কথা বলবারও সুযোগ পাননি।

কেমন আছ পরমেশ? শুধু এই একটি সহাস্য সম্ভাষণ, এর বেশি কিছু বলবার মত কোন ভাষাও যেন খুঁজে পাননি নিশি রায়।

অনেকদিন পরে একদিন, সেদিন হঠাৎ বেশ জোরে, প্রায় একটা উৎসাহিত চিৎকারের মত স্বরে কথা বলে ফেললেন নিশি রায়—জয়দেব আর আমি দুদিনের জন্য ধানবাদ চললাম এণা। কাপড়ের দোকানটা বিক্রী করে দিলাম। দেখি, একটা কয়লার ডিপো করতে পারি কিনা।

এণাক্ষীর জীবনের এটাও একটা বিদ্রূপ, আজও নিশি রায়ের মুখে সেই লোকটার নাম শুনতে হচ্ছে, সেই জয়দেবের নাম, যার চোখের ভীরু দৃষ্টিটাকে অপয়া বলে চিরকাল সন্দেহ করে এসেছে এণাক্ষী। নামটা শুনলেই বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি আজও এণাক্ষীর মনটাকে বিরক্ত করে তোলে। কিন্তু এ অস্বস্তি মিটে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না।

কিন্তু অনেক দিন পরে, আজ এই প্রথম, যে অস্বস্তিটা অনেকক্ষণ ধরে এণাক্ষীর মনের উপর একটা দুর্বহ ভার হয়ে পড়েছিল, সে অস্বস্তিটা কিছুতেই সরে যাচ্ছে না। কি হলো পরমেশের? এই একমাসের মধ্যে একটা দিনও এখানে আসেনি পরমেশ। কেন আসতে পারেনি? সময় হলো না কেন? একটা চিঠিও দিতে পারলো না কেন পরমেশ? অথচ, বাইরে যায়নি, এই শহরেই আছে পরমেশ। গোয়ালা বীরবল কালই তো বলেছে, আজ পরমেশ বাবুকা কোঠিমে দশ সের দুধকা রাবড়ি পৌঁছায়া। দোস্ত লোক খাবেন।

দোস্ত লোক খাবেন? এত বড় বান্ধবতার সংসার কবে পেয়ে গেল পরমেশ? কারা এই সব দোস্ত? তার মধ্যে গলায় হার দোলানো আর ভেলভেটের চটি পায়ে দেওয়া কোন মূর্তি নেই তো? এমন অসম্ভব?

ছোটপিসিমা হঠাৎ একটু ব্যস্ত হয়ে আর কাছে এসে যেন ধন্য হয়ে যাওয়া একটা নিশ্চিন্ততার আনন্দে হেসে হেসে বলেন—শুনেছ বোধহয় এণা, আমি এবার থেকে পরমেশর কাছে থাকবো।

এণাক্ষী—কেন?

—দাদা তোমাকে কিছু বলেন নি?

—না।

—আমি যে আজই পরমেশের বাসায় চলে যাব।

—কেন?

—সদানন্দবাবুর মেয়ে সুব্রতার সঙ্গে পরমেশের বিয়ে।

এণাক্ষীর চোখের তারায় যেন একটা আতঙ্কের বিদ্যুৎ রক্তাক্ত জ্বালা ছড়িয়ে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস চেপে প্রশ্ন করে এণাক্ষী—কবে?

—সেটা ঠিক করে এখনও জানায়নি পরমেশ। বোধহয় তিন চারদিনেরই মধ্যে।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে এণাক্ষী। এতক্ষণের অস্বস্তিটা এইবারে যেন নিরেট পাথর হয়ে গিয়েছে।

বুঝতে পারে না এণাক্ষী, এভাবে বাইরের ঘরের জানালার গরাদ ধরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে এই স্তব্ধ চেহারাটা। মুখের উপর গুঁড়ো বৃষ্টির ছিটে এসে লেগেছে, তাই হঠাৎ চমকে ওঠে আর চোখ ফিরিয়ে দেখতে পায়—জানালারই উপর একটা চিঠি পড়ে আছে। কে রেখে গেল চিঠিটা? দুখনের মা বোধ হয়।

ভেবে বুঝতে হয় না, দেখেই বোঝা যায়, চিঠিটা লিখেছে পরমেশ।

হ্যাঁ, সব কথাই লিখেছে পরমেশ। সুব্রতারই সঙ্গে পরমেশের বিয়ে হবে, কিন্তু…

এর মধ্যে অদ্ভুত একটা কিন্তুময় সত্যের কথাও লিখেছে পরমেশ।—কিন্তু তোমাকে কি ভুলতে পারবো? কখনো না। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না, এ বিশ্বাস এখনও আমার আছে!

হেসে ফেলে এণাক্ষী, চোখের তারা দুটোকে ঝলসে দেওয়া আর ঠোঁট দুটোকে পুড়িয়ে দেওয়া একটা হাসি। খুব চমৎকার বিশ্বাসের কথা লিখেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু এখনি গিয়ে প্রশ্ন করা যায়, বলুন দেখি, সুব্রতাকে আপনি কখনই ভালবাসতে পারবেন না, এ বিশ্বাস কি আপনার কাছে? তবে কি উত্তর দেবেন ভদ্রলোক?

কিন্তু ভদ্রলোক যদি বলেন, বেশ তো, সুব্রতাকে যদি ভালই বাসি, তাতে তোমার আপত্তি কেন? আমি যেমন তোমার কাছে যেতাম, ঠিক তেমনই থাকবো, তবে তো তোমার অখুশি হওয়ার কোন কারণ থাকবে না।

—না, মাপ করবেন, এমন দয়া চাই না। সুব্রতাকে ভালবাসেন, আবার নিশি রায়ের মেয়ে এণাক্ষীকেও ভালবাসেন, এরকম অদ্ভুত সুবিধার নিয়মটা পৃথিবীতে চলে না।

ভদ্রলোক যদি সত্যিই একেবারে প্রতিজ্ঞা করে বলে দেন, বেশ তো সুব্রতার সঙ্গে আমার কোন ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে না, সুব্রতা শুধু আমার একটা দরকারের মানুষ হয়ে আমার ঘরে পড়ে থাকবে; আর ভালবাসবো শুধু তোমাকে তবে তো তোমার আপত্তি করবার কিছু থাকতে পারে না।

—বাঃ, কী অদ্ভুত ভালবাসার কথা বললেন! সুব্রতাকে বুকে জড়িয়ে ধরা একটা মানুষ এসে এণাক্ষীর সঙ্গে শুধু গল্প করবে, আর এই গল্প করাটাই হবে আসল ভালবাসা? বাঃ!

ভদ্রলোকও তো বলতে পারেন, বেশ তো আমি না হয় তোমাকে ভালবাসতে আর পারলামই না, কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে না কেন? যার সঙ্গে হাত ধরবার কোন সম্পর্কেরই দরকার হয় না, তাকে চিরকাল মনে মনে ভালবাসতে বাধা কোথায়?

— না, অসম্ভব। মিথ্যে কথা বলে আর লাভ নেই।

চিঠিটাকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে জানালার বাইরে উড়িয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এণাক্ষী। মনটা যে এক মুহূর্তের আঘাতে সাদা হয়েই গিয়েছে। এ মন দিয়ে কাউকে ভালবাসা যায় না। এ মনের উপরে কোন চিরকালের বোঝা চাপানো যায় না। সে বোঝা স্বীকার করবেই বা কেন এই সাদা হয়ে যাওয়া মনটা?

কথা বলছে মনটা; কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা। কিন্তু এণাক্ষীর কান দুটো যেন শুনতে পেয়ে থেকে থেকে চমকে ওঠে আর আশ্চর্য হয়ে যায়। কত সত্য কথা বলছে মনটা, কত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আগে যে এই মনটাই কোন মুহূর্তে এণাক্ষীকে বুঝতে দেয়নি, এক তরফা ভালবাসা যে একটা বোঝা। দেখতে তপস্যার মত, শুনতে কাব্যের মত, কিন্তু আসলে একটা মোহময় শাস্তি।

কে দিয়ে গেল চিঠিটা? মনে হয় আড়ালের একটা বিদ্রূপ এসে আর মুখ টিপে হেসে এণাক্ষীর কল্পনার সেই ভালবাসার চিরকেলে রাখী-ডোরের

গ্রন্থিটার কাছে একটা প্রশ্ন রেখে দিয়ে সরে পড়েছে। সাধ্যি থাকে তো সেই গর্বের রাখীডোর সহ্য করুক এই প্রশ্নটাকে ; এবার বলুক দেখি এণাক্ষী সেই গ্রন্থিটার জোর কি এখনও অটুট আছে ? বল দেখি এণাক্ষী, বুকে জড়িয়ে ধরে না যে ভালবাসা, সে ভালবাসার আয়ু কত দিন ? এখন জোর স্বরে বলুক না কেন নিশি রায়ের মেয়ে, পরমেশকে সে এখনও ভালবসেতে পারবে। চিরকাল ভালবাসতে পারা যাবে, এণাক্ষীকে পরমেশ একেবারে পর করে দিল বলে এণাক্ষী কেন পরমেশকে পর মনে করবে ? এণাক্ষীর তো কিছুই খোয়া যায়নি, সেই চোখ দুটো তো এখনও আছে এণাক্ষীর ; যে চোখ দিয়ে পরমেশকে এখনও দেখতে পারা যাবে। ইচ্ছে করলে তো দিনরাত পরমেশকে ভাবতেও পারা যাবে। তবে পরমেশকে ভালবাসতে অসুবিধা কোথায় ?

আর এখনই পরমেশকে একটা চিঠি দিতেই বা পারা যাবে না কেন, বেশ তো, তোমার মনে এণাক্ষী মিথ্যে হয়ে গেল বলে মনে করো না যে, আমার মনেও পরমেশ মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। আমার মনের আকাশে পরমেশই চিরকালের তারা, একটি মাত্র তারা হয়ে ফুটে থাকবে, আমি আমার ভালবাসার গর্বকে ছোট করে দিতে পারি না।

মনের কথাগুলি শুনতে পেয়ে এবার হেসে ফেলে এণাক্ষী। এই হাসি দিয়ে এণাক্ষী যেন নিজেকেই ঠাট্টা করছে। কত বড় কপটতার থিয়েটার করতে চাইছে নিশি রায়ের বিধবা মেয়ের প্রাণটা! অসম্ভব। কোন দরকারও নেই। পরমেশকে ভাবতে মনের মধ্যে কোন মধুরতার স্বাদ ভরে উঠবে না ; একদিনে ভালবেসেছিলাম বলে চিরকাল ভালবেসে যাওয়া উচিত নামে একটা করুণ সতীত্বের জেদকে ভালবেসে জীবনটাকেই ঠকানো হবে।

আর নয়, আর কিছু ভাববার দরকারও হয় না। এসব ভাবনাও এণাক্ষীর জীবনের একটা লজ্জা। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু চিন্তা করে, এই বিশ্রী স্তব্ধতাকে যেন মনেরই একটা কঠোর ভ্রূকুটি দিয়ে শাসিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এণাক্ষী।

হেসে হেসে আর চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এণাক্ষী। -ছোটপিসিমা, তুমি কি আজই চলে যাবে ? ছোটপিসিমা তুমি কোথায় !

ছোটপিসিমা বলেন—হ্যাঁ, আজই যাব ভাবছি। আজ সন্ধ্যাতে যাব।

সারাদিন বসে, শুয়ে, বই পড়ে আর ঘুমিয়ে মনটাকে ভাবনাহীন করে দিতে ভালই লাগল। খুচখাচ করে বিনা দরকারের যত কাজ করতে গিয়ে হেসে

ফেলতেও ভাল লাগে। সন্ধ্যা হতেই ছোটপিসিমা যখন চলে গেলেন, তখন নিজেরই ঘরের সিমেণ্ট-করা মাজাঘষা মোলায়েম ও বেশ ঠাণ্ডা একটা মেজের বুকের উপর শুয়ে পড়ে থেকে, মাথার বালিশটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হেসে ফেলতেও ভাল লাগে এণাক্ষীর।

তারপরেই, বুকে জড়ানো বালিশটাই যেন ফুঁপিয়ে ওঠে। দু'চোখ থেকে অদ্ভুতরকমের কান্নার জল উথলে উঠে মেজেটাকে ভিজিয়ে দেয়। বালিশটা যেন এণাক্ষীর বুকটারই একলা হয়ে যাওয়া শূন্যতার ছোঁয়া পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছে। তারপর আর কতক্ষণ চুপ করে ঘরের মেজের উপর বসে থেকে থেকে রাত হলো তাও জানতে চেষ্টা করে না এণাক্ষী।

হঠাৎ, যেন গা সির সির করে একটা ভয়ের ছোঁয়ায় চমকে ওঠে এণাক্ষী।

—ছি, ছি ; সুব্রতার স্বামী সেই ভদ্রলোকের কথা মনে করাও যে নিশি রায়ের বিধবা মেয়ের মনের পক্ষে একটা অনাচার ; আমিষ খাওয়ার চেয়েও জঘন্য অনাচার।

আবার হঠাৎ মনে হয়, একবার স্নান করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে, যেন ছটফট করে ঘর থেকে বের হয়ে যায় এণাক্ষী। যেন একটা শুচিস্নানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এণাক্ষীর এই এক বছরের প্রাণটা। সব কাপড় ধোবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। ওসব পুরনো কাপড় আর ছুঁতে পারবে না এণাক্ষী। কিন্তু আজ তাহলে কি গায়ের এই কাপড়টাকে শুধু জলে ভিজিয়ে নিয়ে···ছি, তাও সহ্য করতে পারা যাবে না। পরমেশের চিঠিটা হাত দিয়ে ছোঁবার সময় এই কাপড়টাই যে গায়ে ছিল!

আজ তাহলে···হ্যাঁ, মনে পড়ে যায় এণাক্ষীর একটা কোরা থান বাড়িতেই আছে, কাল সকালবেলায় বাবা যেটা এনে দিয়েছেন। ভাগ্য ভাল, সে কোরা থান এই হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফেলেনি এণাক্ষী।

কয়লার ডিপো ভালই চলছে। পাব্লিক ওয়ার্কসের নানা রকম কনষ্ট্রাকসনের কাজ চলছে, সে কাজে কয়লা সাপ্লাই দেবার অনেকগুলি কণ্ট্রাক্ট পেয়ে গিয়েছেন নিশিবাবু।

কারবার ভালই চলছে ; নিশিবাবুই বার বার, যার সঙ্গে কথা বলেন তারই কাছে জানিয়ে দেন বলেই লোকে জানতে পারে, এবার বেশ ভাল লাভজনক একটা কারবারে হাত দিয়েছেন নিশি রায়।

কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই অভিযোগ করেন নিশিবাবু তাঁর

কারবারটা নষ্ট করে দেবার জন্য চারিদিকে নানারকম চক্রান্তের খেলা চলছে।

আর তিন মাস পরেই যখন-তখন আক্ষেপ করেন—না ওরা আমাকে ডুবিয়ে দিয়েই ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে।

ওরা যে কারা, এটা অবশ্য কেউ ধারণা করতে পারে না। কারণ এসম্বন্ধে নিশিবাবুর কথা থেকে ধারণা করবার মত কিছুই পাওয়া যায় না।

—কোলিয়ারী খারাপ মাল দিয়েছে? প্রশ্ন করেন কান্তবাবু।

—না না, কোলিয়ারী বেচারার কোন দোষ নাই। চমৎকার কয়লা দিচ্ছে কোলিয়ারী। ফার্স্ট ক্লাস দগদগে কয়লা, অ্যাশ কনটেণ্ট নেই বললেই চলে। জবাব দিতে একটুও দেরি করেন না নিশি রায়।

—বিলের পেমেণ্ট পেতে বোধহয় খুব বেগ পেতে হচ্ছে? জিজ্ঞেস করেন রামচন্দ্র মাঙ্গিলাল।

—না না, একটুও বেগ পেতে হয় না। মাথা নেড়ে জবাব দেন নিশি রায়।

—বোধহয় খুব কম লাভের মার্জিনে রেট দিয়ে টেণ্ডার দাখিল করেছিলেন? সন্দেহ প্রকাশ করেন নরোত্তমবাবু।

—একটুও কম মার্জিন নয়। সব রকম খরচ ধরেও প্রফিটের রেট দাঁড়ায় প্রায় বত্রিশ পার্সেণ্ট। উত্তর দেন নিশিবাবু।

—তবু, কারবারটার এদশা হলো কেন? আশ্চর্য হন সুখময়বাবু।

—ওরাই জানে, ওদের ইচ্ছে; আমি আর কি করতে পারি বলুন? হতাশ-ভাবে আক্ষেপ করেন নিশি রায়।

আর তিন মাস পরে কয়লার ডিপোটা যেদিন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন বাড়িতে ফিরে এসে যে-কথা বললেন নিশি রায়, সে-কথা বেশ একটু নতুন রকমের কথা। মনে হয়, নিশিবাবুর আক্ষেপটাও যেন এই বার হতাশ হয়ে যেতে বসেছে।—আর এসব যত বাজে কারবার-টারবার ·····আর একটুও ভাল লাগে না,···আর পারি না।

কোনদিন যাকে একটা ক্লান্তির আক্ষেপও করতে শোনা যায় নি, এই বয়সেও যাকে এত ছুটোছুটি করেও একবার হাঁপাতে দেখা যায়নি, সেই মানুষ যেন ক্লান্ত বোধ করছে আর হাঁপিয়ে পড়েছে।

—মানুষকে এত বঞ্চনা করাও আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। কথাটা বলেই একটা পাখা হাতে নিয়ে বারান্দার উপর অলসভাবে বসে পড়লেন নিশি রায়।

ঘরের ভিতরে বসে, নিশি রায়ের মুখের এক অদ্ভুত কথাটা শুনতে পেয়ে

চমকে ওঠে এণাক্ষী।—এ কি রকমের কথা? বঞ্চনা? যে মানুষ দিনরাত খেটে নিজের রোজগারের সুখ দিয়ে এত বড় একটা অসহায় বিধবামহলের প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছেন, সে মানুষ কেন বঞ্চনা করবেন? কাকে বঞ্চনা করলেন বাবা?

—তবু আশ্চর্য বলতে হবে, মানুষটার হৃদয়টা! সব বুঝে সব দেখে, সব জেনেশুনেও আজ পর্যন্ত একটা রাগের কথা বললে না। এমন কি, এখনও বলছে, আপনি কারবার করে যান, আমি আছি সহায়। আপনি হতাশ হয়ে পড়ছেন কেন?

কার হৃদয়ের উদ্দেশে এত বড় বিস্ময়ের অভিনন্দন জানাচ্ছেন বাবা? এণাক্ষীর চোখের সামনে যেন একটা ভয়ানক অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে থাকে। বুকের ভিতরে দুরদুর করছে একটা ভয়, যেন একটা প্রাণদণ্ডের ভয়।

—যা হবার তাই হবে। আমি আর ভাবতে পারি না। বিড়বিড় করতে করতে বারান্দার মেজের উপর যেন ঘুমিয়েই পড়লেন নিশি রায়।

ঘরের ভিতরে আতঙ্কিতের মত বসে থাকা এণাক্ষীর মূর্তিটাও যেন এইবার সাহস পেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, যা হবার তাই হবে, না হয় বিধবা মহলের এই কটা বাজে প্রাণ মরে যাবে। বেঁচে থাকবার লোভ যদি থাকে, তবে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ভয় করবার কি আছে? আর ঐ খেটে-খেটে হয়রান হয়ে যাওয়া মানুষটারও যে জিরোবার অধিকার আছে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াতেই দেখতে পায় এণাক্ষী, আর দেখতে পেয়ে সারা মুখটাই যেন একটা মায়ার বেদনায় করুণ হয়ে যায়। বাবা যে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বাবার মাথায় কি আর কখনো পাখার বাতাস পড়েছে, সেই যে মা চলে গেলেন, তারপর থেকে? এবাড়ির এতগুলি মানুষের কারও চোখ ভুলেও দেখতে পায়নি যে, এই মানুষের এই মাথাতে একটু পাখার বাতাসের দরকার আছে! মা যদি আজ আড়াল থেকে দেখতে পান, তবে যে বুকফাটা কান্না কেঁদে চেঁচিয়ে উঠবেন মা। বাড়িতে এতগুলি মানুষ থাকতে, এণার বাবার এদশা কেন? কেউ যে একবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাও করে না, মানুষটার মাথা ধরেছে কি, কিংবা বুকে কোন কষ্ট হচ্ছে কি? ছিঃ, এত বড় মেয়ে হয়েও তুমি বাপের কোন দুঃখ বুঝতে পার না এণা? এখন বুঝছি, আগে মরে গিয়ে আমি পাপ করেছি। এমন জানলে ঠাকুরকে বলতুম, আমার আগেই চলে যাক মানুষটা।

বুঝতে পারেনি এণাক্ষী, যেন মা-র চোখের জলটাই এণাক্ষীর চোখের উপর

ঝরে পড়ে এণাক্ষীকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। নিশি রায়ের ক্লান্ত ও ঘুমন্ত শরীরটার কাছে এসে মেজের উপরে বসে পড়ে এণাক্ষী। নিশিবাবুর মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে যেন নিজেরই একটা কান্না মাখানো জ্বালা শান্ত করতে থাকে।

মনটা যেন অদ্ভুত একটা স্বস্তিতে ভরে যাচ্ছে। মা-র চোখের জলটাই যেন এই পাখার বাতাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। আর এণাক্ষীর ওপরে রাগ করে কথা বলতে পারবেন না মা।

জোর একটা শ্বাস ফেলে তারপরেই ধড়ফড় করে জেগে ওঠেন নিশি রায়। সঙ্গে সঙ্গে, যেন রাগ করে ধমক দিয়ে ওঠেন—একি? তুই এখানে কি করছিস? রাখ্ পাখা রেখে দে। একবেলা দুটো আলোচাল সেদ্ধ করে খাস, নিজেই জলছিস, তার ওপর আবার এসব সেবার খাটুনি খাটতে আসা কেন? আসিস কেন? কে বলেছে? তোর মা থাকলে আজ আমাকে যে একটা নিষ্ঠুর বাপ বলে গাল দিত।

—ছিঃ, এসব আবার কেমন কথা! আমার মা ওকথা বলতেই পারে না।

—কিন্তু বললে তো মিথ্যে কথা বলা হতো না। যে মেয়ের জীবনে কোন সুখ নেই, সে মেয়েকে দিয়ে···।

—তুমি চুপ কর বাবা।

—তুমি চুপ কর বাবা।

পাখাটা রেখে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায় এণাক্ষী।

কিন্তু কোথায় যাবে? সেই তো, এই ঘর থেকে ওঘরে, এণাক্ষীর জীবনের চলাফেরার এই তো জগৎ; এর বাইরে আর তো কিছু নেই। থাকলেও এণাক্ষীর জীবনের সঙ্গে সে-সব কিছুর কোন সম্পর্ক নেই।

আর কোন সন্দেহও নেই এণাক্ষীর; এণাক্ষীর ভালবাসাও অপয়া। সে ভালবাসা যার কাছে যাবে তাকেই বিদায় দিতে হবে। সে ভালবাসাটাও যেন এণাক্ষীকে একলা করে রেখে জব্দ করে দেবার একটা নিষ্ঠুর ইচ্ছা নিয়ে এণাক্ষীর মনে দেখা দেয়।

শরীরটাকে যেমন শাসন করে মিথ্যে করে দেওয়া হয়েছে, ভালবাসার মনটাকেও কি তেমনি করে চিরকালের মত মিথ্যে করে দেওয়া যায় না?

মিথ্যে হয়েই গিয়েছে বলে তো মনে হয়। ভালবাসা কথাটাকেই যে ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। কাউকে ভালবাসতে পারে না, এরকম একটি মন; আর কাউকে ছুঁতে পারে না এরকম একটি শরীর, এই নিয়ে নিশি রায়ের বিধবা মেয়ের প্রাণটা চিরকাল পড়ে থাকুক। লোকে বলবে, নিশি রায়ের

মেয়ের জীবনটা একেবারে শূন্য এণাক্ষী বুঝবে এই তো জীবনের শাস্তি।'

নিশি রায়ের আক্ষেপের অর্থটা বুঝতে পারা গিয়েছে। আর এণাক্ষীর জীবনের শাস্তি যেন একটা হাহাকারের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

এতদিন কোন কল্পনাতে যা সন্দেহ করতে পারেনি এণাক্ষী, আজ বোঝা গেল, সেটা একটা সত্য; ভয়ংকর সত্য; একটা নিষ্ঠুর চক্রান্তের সত্য; অনেকদিন ধরে সযত্নে লালন-পালন করা একটা চক্রান্তের সত্য।

সেই জয়দেবের কথাই বলেছেন নিশি রায়। এণাক্ষীর কাছেই বলেছেন। এতদিন ধরে জয়দেবই নাকি টাকা দিয়ে এসেছে, আর সেই টাকা দিয়ে কারবার করেছেন নিশি রায়। এই সংসার নাকি এতদিন ধরে জয়দেবেরই টাকায় লালিত-পালিত হয়েছে।

কিন্তু জয়দেব কি বলেছে যে, আর টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না? না, এমন কথা বলেনি জয়দেব। নিশিবাবু বলেছেন, এমন কথা বলবার মত মানুষ নয় জয়দেব। তবে আর এত হাঁপিয়ে পড়েন আর হতাশ হয়ে যান কেন নিশিবাবু?

নিশিবাবুকে যেন একটা হিংস্র প্রতিজ্ঞার নেশাতে পেয়েছে।—না, জয়দেবকে আর ঠকাতে পারবো না।

জয়দেবকে ঠকাবার কিংবা না ঠকাবার প্রশ্নই বা কেন ওঠে? কি বলতে চান নিশিবাবু?

এণাক্ষীকে বিয়ে করতে চায় জয়দেব। বিধবা মহলের সব মানুষের চোখ একটা বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়ে, কথাটা বলেই দিয়েছেন নিশিবাবু। আর, এণাক্ষীর দিকে যেন একজোড়া ক্ষমাহীন দাবীর চোখ তুলে একথাও বলে দিয়েছেন—আমারও ইচ্ছে, জয়দেবের সঙ্গে এণাক্ষীর বিয়ে হয়ে যাক। তা না হলে···

জেঠিমা ভয়ে ভয়ে বলেন—তা না হলে কি?

নিশি রায় বলেন—তা না হলে খুবই খারাপ হবে।

যেন একটা বিভীষিকা এসে এই বাড়ির উপর আর এণাক্ষীর প্রাণটার উপর ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে, নিশি রায়ের গলার স্বরে যেন এইরকম একটা নিয়তির হুংকার।

কিন্তু এমন কথা শুনেও বিধবা মহলের মানুষগুলি ঠিক বুঝে উঠতে পারে

না, বিভীষিকাটা কি? জয়দেব যেমন সাহায্য করছিল তেমনই করে যাবে তবে, এতদিন যে-ভাবে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে এসেছে নিশি রায়ের এই সংসারে, তেমনই মান-সম্মান দিয়ে, আর নিয়ে, আর খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবে। তবে আর এই বিধবা মেয়েটাকে, ওর ইচ্ছারই বিরুদ্ধে জয়দেবের সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছা কেন?

নিশি রায় আরও একটা আশ্চর্য কথা বলেন—জয়দেবের সঙ্গেই এণার বিয়ে হওয়া ভাল। না হলে ভাল দেখায় না।

অভ্রের কারবার করে তার অনেক টাকা আছে; শুধু এই গুণ ছাড়া আর কি গুণ আছে জয়দেবের, যার জন্যে নিশি রায় এত বড় একটা নীতির কথা বলে দিলেন?

জেঠিমা একবার এণাক্ষীর কাছে এসে কি-যেন বলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু জেঠিমা কিছু বলবার আগেই এণাক্ষী বলে দেয়।—বিয়ে হবে না। হতে পারে না। বাবাকে বলে দাও, এমন বিয়ে দেবার চেষ্টা করলে মেয়েকেই চিরকালের মত হারাতে হবে।

কথাটা শুনতে পেয়ে নিশিবাবু নিজেই উঠে এলেন। আর এণাক্ষীর সেই দুচোখের মরণ-পণ প্রতিজ্ঞার উদ্ধত দৃষ্টিটার সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আরও অদ্ভুত কথা বলেন।—তাতে কারও ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে শুধু তোমার।

ক্ষতি হবে এণাক্ষীর? যে জয়দেবের চোখের ভীরু দৃষ্টিকে একটা অভিশাপের দৃষ্টি মনে করে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে এণাক্ষী, সেই জয়দেবের সঙ্গে বিয়ে না হলে এণাক্ষীর ক্ষতি হবে? নিশি রায়ের যুক্তি আর মুখের ভাষাও কি পাগল হয়ে গিয়েছে?

এণাক্ষীর ঝাপসা চোখের তারা থেকেও যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ে।—আজ মা বেঁচে থাকলে তোমাকে কি বলতেন ভেবে দেখ।

—কি বলতো?

—তোমাকে একটা মেয়ে-বেচা নিষ্ঠুর বাপ বলে···

—বললেও আমি শুনতাম না; গ্রাহ্যই করতাম না।

—আমিও তোমার কথা গ্রাহ্য করবো না।

—তা হলে আমিও আর কাউকে গ্রাহ্য করবো না। আমাকেই চলে যেতে হবে। আমি আর এই ঠগের জীবন সহ্য করতে পারবো না।

হঠাৎ কি-ভয়ানক গম্ভীর হয়ে আর শান্ত-কঠোর স্বরে কথা বললেন নিশি রায়। নিশি রায়ের মেয়ের চোখের বিদ্যুৎ-ঝিলিকও যেন সেই শান্ত গম্ভীর-

তাকে ভয় পেয়ে সেই মুহূর্তেই নিভে যায়।

চোখে যেন অন্ধকার দেখছে এণাক্ষী। নিয়তি নামে সত্যিই কিছু আছে বোধ হয়। তা না হলে, হঠাৎ কোথা থেকে এত বড় একটা শাস্তির দাবি এসে এণাক্ষীর জীবনের শূন্যতার শান্তিটাকেও মিছামিছি ছিঁড়ে খাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেন? তা না হলে বাবার মত এত বড় স্নেহের মানুষও পাগল হয়ে যাবে কেন? আগের কালে গঙ্গাসাগরের কুমীরের মুখের কাছে মেয়েকে উৎসর্গ করে পুণ্যি করতো যে পিতৃস্নেহ, এ-যেন সেই রকমের পিতৃস্নেহ।

চমকে ওঠে এণাক্ষী। আর, চোখের উপর থেকে অন্ধকারের আবরণটাও হঠাৎ সরে যায়। আর, ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েই কেঁদে ফেলে এণাক্ষী। —এ কি, কি হলো বাবা?

একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছেন নিশি রায়; আর দু'চোখ থেকে অঝোরে জলের ধারা গড়িয়ে পরছে।

একমুহূর্তের মধ্যেই কি যেন ভেবে নিয়ে আর চোখ মুখ শক্ত করে, প্রায় একটা পাথরের মূর্তি হয়ে, কিন্তু একেবারে শান্ত ও অবিচল ভাবে কথা বলে এণাক্ষী।—বল, কি বলতে চাও? এক কথায় স্পষ্ট করে বলে দাও।

নিশি রায় বলেন—আমার ইচ্ছা, জয়দেবের সঙ্গে তোর বিয়ে হোক্।

—বেশ।

আর উতলা নয় এণাক্ষী। এণাক্ষীর প্রাণটা পিতৃস্নেহকে আশ্বস্ত করে দিয়ে আর শান্ত হয়ে গঙ্গাসাগরের কুমিরের মুখে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। যেন ঘর-ভরা এই দাবি ধমক আর অবুঝ মায়াকান্নার ভিড়টাকে সান্ত্বনা দিয়ে আর, যেন আত্মহত্যার গর্বে গর্বিত হয়ে, ঘর থেকে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

কিন্তু ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই এণাক্ষীর এই অদ্ভুত রকমের শান্ত ক্ষমাময় চেহারাটাই এক মুহূর্তের মধ্যে যেন হিংস্র প্রতিজ্ঞার চেহারা হয়ে ওঠে।

বাবা বলেছেন, তাঁর ইচ্ছা; কিন্তু এত মূর্খ নয় এণাক্ষী যে, বুঝতে কোন অসুবিধা হবে; এটা কার ইচ্ছা। কিন্তু খুব ভুল সাহস করেছে সে ইচ্ছা। নিশি রায়ের অভাবের সুযোগ নিয়ে আর টাকা দিয়ে নিশি রায়ের মনের একটা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যিনি এণাক্ষীকে কাছে পেতে চেয়েছেন, তিনি যে মরীচিকার কাছে জল আশা করেছেন। তার ছায়ার কাছে যেতেও ঘৃণা বোধ করে যে মেয়ে, সে মেয়েকে বাসর ঘরের ভিতরে টানতে চেয়েছে জয়দেব নামে একটা টাকাওয়ালা চক্রান্ত।

কিন্তু নিশি রায় বোধহয় কল্পনাও করতে পারছেন না যে, তাঁর বিধবা

মেয়ের ঐ সম্মতিরই শান্ত ঘোষণার ভিতরে কি কঠোর আরও একটা সংকল্প লুকিয়ে আছে। ঠিকই, নিশি রায়ের ইচ্ছার সম্মান রাখবে এণাক্ষী ; জয়দেবের সঙ্গে বিয়ে হবে। কিন্তু তারপর? এণাক্ষী যে নিজেরও ইচ্ছার সম্মানটা রাখবে। এণাক্ষীর হাত থেকে বিষের শিশি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না ; কারও সাধ্যি হবে না। পশুর মত সাহস করে এণাক্ষীর বিছানার কাছে এগিয়ে এলেই বুঝতে পারবে জয়দেব, নিশি রায়ের মেয়ে আর নেই।

তারপর? তারপর আর এমন অভিযোগ তো করতে পারবে না নিশি রায়ের পিতৃস্নেহ, তাঁর ইচ্ছার কোন অসম্মান করেছিল তাঁর মেয়ে! আর এই ভীরু দৃষ্টির জয়দেবও বুঝতে পারবে, টাকার জোরে দাবি খাটিয়ে কি ভুল করলো তার কারবারী বুদ্ধিটা।

হাজারিবাগের নবাবগঞ্জের বাড়িতে বিধবা মহলের সবারই চোখে অদ্ভুত রকমের আনন্দের কান্না ধরিয়ে দিয়ে একজন বিধবা যেদিন মাথায় সিঁদুর নিল, সেদিন বিয়ে-দেখা এত বড় ভিড়টার মধ্যে একজনও কোন ঠাট্টার কথা চাপা-স্বরেও বললো না, কেউ একটু আশ্চর্যও হলো না, এটাই আশ্চর্য।

এটাই যেন অবধারিত ছিল। যেন খুব স্বাভাবিক, খুবই সহজ সরল একটা সাধারণ বিয়ের ব্যাপার চুকে গেল। এর মধ্যে আশ্চর্য হয়ে দেখবার কিছু নেই।

নবাবগঞ্জের এই সড়কের দু'পাশের কোন বাড়ির চোখের কাছে জয়দেব অচেনা মূর্তি নয়। কে না দেখেছে, এই ক'বছর ধরে এই পথে এসেছে আর চলে গিয়েছে গিরিডির জয়দেব, যার খনির এক নম্বর রুবি জাতের অভ্র মাঝে মাঝে বাজারে মাতিয়ে তোলে। বিয়ে হবার পর এক বছর হতে না হতেই বিধবা হয়েছে নিশি রায়ের যে মেয়ে, সেও তো কারও কাছে অচেনা নয়। তাই সেদিন এ বিয়ে খুবই চেনাশুনা ও জানাজানির একটা বিয়ে হয়ে সকলের চোখে ধরা দিয়েছে।

বিয়ের রাতেই, বিয়ে যখন হয়ে গিয়েছে, আর এণাক্ষী তার রঙীন শাড়ি জড়ানো আর গলায় হার দোলানো মূর্তিটাকে রঙীন করে সাজানো একটা কয়েদীর মূর্তি বলে মনে করে আর ঘেন্না করে আলো-নেবানো একটা ঘরের ভেতরে বন্ধ করে দিয়ে নিঝুম হয়ে বসেছিল ; তখন শুনতে পেয়েছিল এণাক্ষী, ঘরের বাইরে জানালাটারই কাছে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে কারা যেন কথা বলছে, বোধহয় মামার সঙ্গে কথা বলেছেন মাসী।—এই বিয়েই ক'বছর আগে হয়ে গেলে কত ভাল হতো। তাহলে মেয়েটাকে আর থান পরানো ঐ দুর্ভাগ্যের

দাগা সহ্য করতে হত না।

শুনতে পেয়ে একটুও রাগ করেনি এণাক্ষী। ঠিকই বলেছেন মামা আর মামী; যদি এরকম একটা বিয়ের দাগা কপালে ছিল, তবে সে দাগা ক'বছর আগেই এণাক্ষীর কপালটাকে দাগিয়ে দিলে ভাল করতো।

হাজারিবাগের নবাবগঞ্জের বাড়িতে নয়, এখন জয়দেবের গিরিডির বাড়িতে একটি ঘরের যে জানালার কাছে একটা বই হাতে নিয়ে চুপ করে বসে আছে এণা, সে জানালার কাছে শুধু একটা বাগান, আর সে বাগানে শুধু কতকগুলি গাছ আর গাছের ছায়া। এই জানালার কাছে দাঁড়ালে বা বসলে কোন মানুষের মুখ দেখতে হয় না, তাই জানালার কাছের এই ঠাঁই ইচ্ছে করে বেছে নিয়েছে এণা।

একটা কথা ভেবে এই বন্দিত্বের জীবনেও খুশি হয়ে আছে এণাক্ষীর মন। কারণ জয়দেব এরই মধ্যে বেশ ভাল করে বুঝে ফেলেছে, অভাবের এক বুড়ো মানুষের মনকে টাকার জোরে দুর্বল করে দিয়ে তারই যে বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছে জয়দেব, সে মেয়ের ছায়ায় গা ঘেঁবে দাঁড়াবারও সুযোগ সে কোন দিন পাবে না।

হাজারিবাগের বাড়িতে নয়; বিয়ের দিনেও নয়; গিরিডির বাড়িতে এসে প্রথম দিনেই একটা কথা জয়দেবকে একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল এণা।

—আপনার জানা উচিত, এ বিয়ে শুধু নামেই বিয়ে। আর কিছু নয়। আপনি আমাকে অপমান করবার চেষ্টা করবেন না।

জয়দেবের সেই চিরকালের ভীরু চোখের দৃষ্টিটা যেন আরও ভীরু হয়ে যায়।

—কখনো না।

ঐ একবার শুধু দুজনের মধ্যে কথার বিনিময় হয়েছিল। জয়দেব আর এণাক্ষী, দুজনে যেন একটা অঙ্গীকারের শাসন স্বীকার করে নিয়েছিল। এ বিয়ে শুধু নামেই একটা বিয়ে। এ বিয়ে কোন সম্পর্কের বন্ধন নয়।

আগে ছিল একটা সাদাটে শূন্যতায় পড়ে থাকা জীবন। আজ শুধু একটা রঙীন অপমানের ঘরে পড়ে থাকা জীবন। দেখতে একটা পরিবর্তন বলে মনে হলেও এই দুই জীবনের ভিতরটা একই শুধু একটা ইচ্ছাহীন প্রাণ হয়ে পরে থাকা, নিজেকে নিয়ে নতুন করে কোন ভাবনায় পড়তে হয় না।

বাগানের গাছের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে মাঝে-মাঝে এণাক্ষীর মনটা অদ্ভুত একটা স্বস্তিবোধ করে। এ বিয়ে যেন একটা নিশ্চিন্ততার সঙ্গে বিয়ে; ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় নেই, ভালবাসারও ভয় নেই। ভালই হয়েছে।

আর, আরও ভাল হয়েছে যে, জয়দেব স্পষ্ট করে বুঝে ফেলতে পেরেছে, নিশি রায়ের মেয়ে এই বিয়েকে একটা অপমানের বিয়ে বলে মনে করেছে।

শুনে শুনে গা-সহা হয়ে গিয়েছে, তাই শুনতে পেলে আজ আর মনের ভিতরে কোন ঘেন্নার জ্বালা জ্বলে ওঠে না, কোন মহিলা বেড়াতে এসে যখন এণাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে ওঠেন—বাঃ, চমৎকার, বেশ সুন্দর বউ পেয়েছে জয়দেব।

মনের ভিতরে জ্বালা ধরে না ঠিকই ; কিন্তু মহিলারা চলে গেলে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে এণাক্ষী। যেন একটা কুৎসিত অভিযোগের দায় থেকে প্রাণটা ছাড়া পেল।

কিন্তু মহিলাদেরই বা দোষ হবে কেন, এণাক্ষীর মুখ দেখে তাদের কি সন্দেহ করবার কোন সাধ্যি আছে যে, সুন্দর বউ পেতে গিয়ে একটি সুন্দর ঘৃণাকে পেয়েছে জয়দেব ?

জয়দেব কখন বাড়িতে আসে আর কখন চলে যায়, বাড়িতে আছে কি নেই, এরকম একটা সামান্য কৌতূহলও এণাক্ষীর মনের কাছে ঠাঁই পেতে পারেনি। জানে না, কোন খবরও রাখে না ; এবাড়িতে জয়দেব নামে কোন অস্তিত্বের সত্যও অনুভব করতে পারে না এণাক্ষী ! চাকরেরা নিজেরা আলোচনা করে যেসব কাজের কথা বলে, তাই মাঝে মাঝে কানে এলে বুঝতে পারে এণাক্ষী জয়দেব হাজারিবাগে গিয়েছে।

বাড়ির ভিতরে মাঝে মাঝে একটা বোবা অস্তিত্বের শুধু পায়ের শব্দ শুনে মনে হয়, বোধহয় জয়দেব বাড়িতে আছে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখেও পড়ে যায়, বাইরের ঘরের দরজার পরদা সরিয়ে জয়দেব ওদিকের ঘরে চলে গেল। এক একদিন বিকালে, যখন দুচোখের পাতার উপর নরম হয়ে এলিয়ে পড়া ঘুমের আবেশটাই বার বার ভেঙ্গে ভেঙ্গে আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, তখন বাইরে গাড়ীর শব্দ শুনে আর চাকরদের ব্যস্ত ছুটোছুটির শব্দ শুনে বোঝা যায়, খাদের কাজ দেখে বাড়ি ফিরলো জয়দেব।

হাজারিবাগ থেকে চিঠি এসেছিল, জেঠিমা লিখেছেন, ছ'মাস তো হয়ে গেল এবার একবার এস এণা। জয়দেবকেও বলেছি। তুমি যেদিন বলবে সেদিনই তোমাকে হাজারিবাগে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবে জয়দেব।

চিঠিটাকে একটা মূর্খ প্রলাপের চিঠি বলে মনে হয়েছিল। জেঠিমার ধারণা জয়দেবের সঙ্গে এণাক্ষী যেন দিন রাত্র কথা বলছে ! চিঠির উত্তরে জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, জয়দেবের সঙ্গে কথা বলতে পারে এণাক্ষী, আজও

দেখছি আমাদের এ বিশ্বাসের ভুল ভেঙে যায়নি। তা ছাড়া, তোমাদের জয়দেবও যে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে এ ধারণাই বা তোমাদের মনে···।

ছিঃ, যেন জয়দেবের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের কথা বলতে চাইছে এণাক্ষীর মন। এমন অভিযোগের কোন অর্থ হয় না। এণাক্ষীর সঙ্গে কথা বলবে জয়দেব, কোন সাহসে, কোন অধিকারে।

এই দুই মাসের মধ্যে জয়দেবও এণাক্ষীর সঙ্গে কোন কথা বলেনি। এণাক্ষীর কাছে এসে দাঁড়ায়নি। হঠাৎ যদি এণাক্ষীকে চোখে পড়েছে, তবুও যেন সেই পুরনো দৃষ্টি, সেই ভীরু ভীরু চোরা দৃষ্টির চোখ তুলে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই অন্যদিকে চলে গিয়েছে।

ভাবতে একটু অদ্ভুত লাগে, সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে, শুধু একটা জেদের ইচ্ছে সার্থক করবার জন্যেই যেন নিশি রায়ের মেয়েকে বিয়ে করেছে জয়দেব। বিয়ে নামে একটা কাণ্ড করে নিয়ে আর শুধু তাতেই যেন ধন্য হয়ে গিয়ে তারপর, আগে যেমন একলাটি পড়েছিল ঠিক তেমনি একলা হয়ে পড়ে আছে। লোকটার মনে কি এই অনুতাপটুকুও নেই যে, এণাক্ষীকে বিয়ে করে ভুল করা হয়েছে! যদি কোন অনুতাপ না থাকে, তবে তো বুঝতে হয় যে মানুষটার একটা অর্থহীন জেদের ব্যধি আছে। কোন দরকার নেই, তবু বিয়ে করা।

জেদের ব্যাধিটাও যে একটুও সরল নয়। অনায়াসে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারে জয়দেব কিন্তু জেদের ব্যাধিটা যেন নিশি রায়ের মেয়ের জীবনটাকে অপমান করবার জন্যে পাঁচ বছর ধরে পোষা একটা লক্ষ্য। পাঁচজনে জেনেছে, নিশি রায়ের মেয়েকে বিয়ে করেছে গিরিডির জয়দেব, আর শুধু তাতেই যেন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে জয়দেবের জেদাতৃপ্তি। আর তাতেই সুখি হয়ে গেছে জয়দেবের জীবনটা।

হাজারিবাগের চিঠির উত্তর দেয়নি এণাক্ষী। মাঝে আর একটা চিঠি এসেছিল, তারও উত্তর দেয়নি। মাস তিনেক পরে যে চিঠি এল, সেই চিঠি পড়তে গিয়ে এণাক্ষীর চোখের পাতা যেন হঠাৎ ভয়ে সিরসির করে ওঠে। হ্যাঁ ভয় ধরনেরই একটা সিরসির করা অস্বস্তি।

জেঠিমা লিখেছেন, যাক ভগবানের খুব দয়া। ভালয় ভালয় সেরে উঠেছে জয়দেব। জয়দেবের চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম, এখন সুস্থ হয়ে হাঁটা চলা করতে পারছে।

মনে পড়েছে এণাক্ষীর, এই একমাস ধরে, এই বাড়ির ভিতরে জুতো পরা

কোন পায়ের হাঁটা-চলার শব্দ শুনতে পায়নি এণাক্ষী। শুধু চাকরদের আসা-যাওয়ার ব্যস্ততা দেখেছে আর শুনেছে। জয়দেব যে বাড়িতে নেই আর কেন নেই এরকম কোন প্রশ্নও এণাক্ষীর এই একলা পড়ে থাকা মনের মধ্যে প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়নি।

দুপুর বেলা গাড়ীর শব্দটা যখন বাড়ির গেট পার হয়ে চলে গেল তখন চাকর গিরিধরকে জিজ্ঞেস করবার পরে জানতে পারে এণাক্ষী, হ্যাঁ এই একমাস ধরে প্রায় একটা হাসপাতাল হয়ে গিয়েছিল। বারবার ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার এসেছে। অনেক ওষুধ এসেছে। গিরিধর মাঝে মাঝে সারা রাত জেগেছে।

—কেন ?

খাদের একটা দুর্ঘটনায় জখম হয়েছিল জয়দেব। হঠাৎ একটা পাথর ধ্বসে পড়েছিল জয়দেবের একটা পায়ের ওপর ; বুকেও একটা চোট পেয়েছিল জয়দেব।

কিন্তু না, পায়ের জখম সেরে গিয়েছে। পাঁজরার ব্যথা সেরে গিয়েছে —সবই আরাম হয়ে গিয়েছে মাঈজী। বাবু খাদের কাজ দেখনে কে লিয়ে চলিয়ে গেলেন।

ভালই হয়েছে। এক মাস ধরে এই বাড়ির বাইরের ঘরের ভিতর একটা উদ্বেগের ভরে আর যত্নের দায়ে ডাক্তারেরা এসে বসেছে আর চলে গিয়েছে। এর মধ্যে এণাক্ষীর কোন কাজ ছিল না। এক মাস আগে এই ঘটনার কথা এণাক্ষী জানতে পেলেই বা কি হতো ? চেষ্টা করলেও ওঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে পারতো না এণাক্ষী। মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে, একেবারে জয়দেবের স্ত্রীটির মত মূর্তি ধরে ডাক্তারদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার সাধ্য হতো না। অসম্ভব। জেঠিমা কি মনে করেছেন যে এণাক্ষী এরই মধ্যে জয়দেবের সেবা-টেবার কাজে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছে ? সব জেনে শুনেও এমন অদ্ভুত ধারণা করেন কেন জেঠিমা ?

বিনা কাজের জীবন ; শুধু বসে ঘুমিয়ে আর জানালাটার ধারে দাঁড়িয়ে দিন আর রাতগুলিকে পার করে দেবার জীবন ! এর মধ্যে দুঃসহতা বলে কিছুই নেই। কোন ভাবনার উপদ্রব নেই। শুধু মাঝে মাঝে একটা প্রচণ্ড অনিচ্ছাময় কাজের ব্যস্ততা সহ্য করতে হয়, যখন বাইরের মহিলারা আর মেয়েরা এসে ভীড় করে। জোর করে মুখটাকে হাসিয়ে রাখতে হয়। জোর করে মুখটাকে দিয়ে নানা কথা বলতে হয়।

সবচেয়ে দুঃসহ, আয়নার সামনে একবার দাঁড়াতে হয়, আর দেখতে

হয়, সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি নেই, কিংবা ফিকে হয়ে গিয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে, তবে চোখ দুটোকে কঠোর করে আর শক্ত হাতের বিদ্রোহটাকে কোন মতে দমিয়ে দিয়ে সিঁথির উপর সিঁদুরের দাগ টানতে হয়।

এসেছিলেন অনাদিবাবুর স্ত্রী আর তাঁর তিন মেয়ে। কথায় কথায় এমন একটা কথা বলে ফেললেন অনাদিবাবুর স্ত্রী, যার উত্তর দিতে গিয়ে এই হেসে-কথা-বলা অভিনয়কেও আর ধরে রাখতে পারে না এণাক্ষী। বেশ গম্ভীর হয়ে আর একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে দিতে হয়—না, আমি বলতে পারবো না!

অনাদিবাবুর স্ত্রী শুধু বলেছেন, তাঁর তিন মেয়ের স্কুলের প্রাইজের দিনে গোলাপ ফুল দরকার! জয়দেববাবুর জগদীশপুরের বাগানে যে-গোলাপ ফোটে তার চেয়ে ভাল গোলাপ আর হয় না। তাই, জয়দেববাবুকে যদি একবার বলে দেয় এণাক্ষী...।

—না আমি ওসব কথা বলতে পারবো না। আপনারা নিজেরাই গিয়ে বলুন!

অনাদিবাবুর স্ত্রী একটু অপ্রস্তুত হয়ে এণাক্ষীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই বলে ওঠেন—আচ্ছা চাল।

জগদীশপুরে জয়দেবের যে একটা গোলাপ-বাগান আছে, এটা এণাক্ষীর জীবনে কোন জানা সত্য নয়; জানবার দরকারও নেই, কিন্তু বাইরের মানুষ এলে ভুল ধারণা করে এণাক্ষীর জীবনটাকে যেন জয়দেবের গোলাপ বাগানের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। এণাক্ষীর মনের অস্বস্তি দুঃসহ হয়ে ওঠে।

রোগে ঝলসানো অথচ একেবারে নীরব একটা দুপুর। বাগানের গাছের ছায়াগুলিও যেন নীরব হয়ে পুড়ছে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে এণাক্ষী। বিছানার উপর শুয়ে আর বালিশের উপর মাথাটাকে শক্ত করে গুঁজে দিয়েও ঘুমোতে পারে না এণাক্ষী। না, মাথার এই যন্ত্রণাটা সহজে পালিয়ে যাবার নয়।

কাল অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠতে হয়েছিল। আর বাথরুমে গিয়ে একবার বমি করতে হয়েছিল; আর সকাল হতেই বুঝতে পেরেছিল এণাক্ষী, সারা গা জ্বরের জ্বালায় পুড়তে শুরু করেছে। একবার মনে হয়েছিল, এখনই হাজারিবাগের বাড়িতে একটা চিঠি দেওয়া ভাল; কেউ এসে যেন এণাক্ষীকে নিয়ে যায়। কিন্তু থাক্, দেখাই যাক্ না কেন, এ

জ্বর দুদিনের মধ্যে সেরে যায় কিনা।

চিঠি দিয়েই বা দরকার কি? জ্বর-জ্বালাকে আর ভয় করবারই বা দরকার কি! এখন একটু সাহস করে ফুরিয়ে গেলেই তো হয়। বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেবার প্রতিজ্ঞা করতে পেরেছিল যে, তার মনে আবার বেঁচে থাকবার লোভ দেখা দেয় কেন?

কিন্তু এরই মধ্যে বার বার তিনবার আর একটা অশান্তির জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে, সেটা এই মাথার যন্ত্রণা আর গায়ের জ্বরের চেয়েও দুঃসহ জ্বালা। যে ভয় থেকে এতদিন নিশ্চিন্ত হয়েছিল এণাক্ষীর একলা পড়ে থাকা প্রাণটা, সেই ভয়টা যেন এণাক্ষীর এই ঘরের দরজার কাছে বারবার শব্দ করে আসছে আর চলে যাচ্ছে। বার বার জয়দেবের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। দরজার কপাট ভেজানো, তাই আরও ভয়, সেই ভয়টা যে কপাটটাকে আস্তে একটু ঠেলে দিলেই এই ঘরের ভেতর উঁকি দেবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

আজ এতদিন পরে কোন্ সাহসের নেশায় মাতাল হয়ে, এই স্তব্ধ দুপুরের মুহূর্তগুলির ফাঁকে ফাঁকে, এণাক্ষীর ঘরের দরজার কাছে টলতে টলতে আসছে আর চলে যাচ্ছে জয়দেব?

বাড়িতে এখন আর কেউ নেই বোধ হয়; চাকরগুলো হয় বাড়ি গিয়েছে নয় ঘুমিয়ে আছে। ভীরু জয়দেব আজ হিংস্র হয়ে উঠেছে। নিশি রায়ের মেয়ের মরা প্রাণেরই উপর কুৎসিত চক্রান্ত সার্থক করবার জন্য একটা চরম অপমানের পিপাসা বার বার আসছে আর যাচ্ছে!

ভেজানো কপাট হঠাৎ খুলে যায়। এণাক্ষীর চোখ দুটো আতঙ্কে ছটফট করে উঠেই যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। না, কোন অপমানের মতলব নয়, ঘরের ভিতর ঢুকলেন এক মহিলা, এবং সেই মহিলারই পিছু পিছু এক ভদ্রলোক, যার হাতে ব্যাগ দেখেই বোঝা যায় যে, এক ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে এক রোগী দেখতে এসেছেন।

মহিলা বলেন—আমি তিনকড়ির মা। জয়দেবদা আমাকে খবর দিতে একটু দেরি করেছেন, তা না হলে সকাল বেলাতেই চলে আসতুম বৌদি।

ডাক্তার বলেন—তিনকড়ির মা আমাকে ডাকতে যেতে একটু দেরী করেছে, তা না হলে আরও দু'ঘণ্টা আগে আসতে পারতাম। যাই হোক্…কি হয়েছে আপনার, কিসের কষ্ট?

—জ্বর আর মাথার যন্ত্রণা।

—শুনলাম বমিও করেছেন একবার?

চমকে ওঠে এণাক্ষী—হ্যাঁ, রাতে একবার বমি হয়েছিল।

—আর কোন কমপ্লেন আছে ?

—না।

—তা হলে এখন আর বিশেষ কোন ওষুধ-টষুধ নয়। মাথার কষ্ট ছেড়ে যাবে, এই একটা পিল রইল। আর…তিনকড়ির মা মাথাটা একটু টিপে দিক্।

ডাক্তার যখন চলে গেলেন, তিনকড়ির মার হাতটা যখন এণাক্ষীর কপাল টিপতে শুরু করে দিয়েছে, তখন এণাক্ষীর বুকের ভিতরে যেন আর-একটা অস্বস্তির জ্বালা ছটফট করতে থাকে। এটা একটা অদ্ভুত অস্বস্তি, তাই জ্বালাটাও অদ্ভুত। ঠিক বুঝতে পারা যায় না, এণাক্ষীর জ্বরাক্রান্ত প্রাণের ভিতরে একটা লজ্জা কেঁদে ফেলেছে, না একটা কান্না পেয়েছে।

তিনকড়ির মা বলে—তুমি ঘুমোতে চেষ্টা কর বৌদি।

ঘুমোতেই চায় এণাক্ষী, নইলে এই অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ মনে হয়, তিনকড়ির মা ঘরের ভিতরে থাকলে এই অস্বস্তিকর উৎপাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। না, এখনই চলে যাক তিনকড়ির মা।

হঠাৎ বলেও ফেলে এণাক্ষী—তুমি এখন যাও তিনকড়ির মা।

—কেন বৌদি ?

—আমি এখন একটু একলা থাকতে চাই।

—তা বেশ। আমি কি তবে…

—ইচ্ছে হয় তো সন্ধ্যেবেলায় এস।

জয়দেবদা কিন্তু বলেছিলেন যে, আমাকে সারাদিন আর সারারাত এখানে থাকতে হবে।

—দরকার হলে থাকবে। এখন দরকার নেই।

—কিন্তু, জয়দেবদা যদি বলেন…

—বললে বলে দিও, আমি বলেছি এখন তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই।

—আচ্ছা।

চলে গেল তিনকড়ির মা। আর, জ্বরের জ্বালায় লালচে হয়ে যাওয়া এণাক্ষীর মুখটা যেন দুর্বার বিস্ময়ের চোখ তুলে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপরেই ধড়মড় করে উঠে বসে এণাক্ষী। বিছানা থেকে এগিয়ে যেয়ে,

ঠিক দরজারই কাছে একটু আড়াল হয়ে, যেন একটা নিষ্ঠুর আর প্রচণ্ড কৌতুকের পায়ের শব্দ শোনবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

এসেছে শব্দটা। সেই মুহূর্তে দরজার মাঝখানে এসে, আর জ্বর-দুর্বল চেহারাটাকে যতদূর সাধ্য শক্ত করে দাঁড় করিয়ে রেখে, অপ্রস্তুত জয়দেবের সেই ভীরু চোখ দুটোকেই চমকে দিয়ে কথা বলে ফেলে এণাক্ষী—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল।

—বল।

—আপনি কেমন করে জানলেন, আমার জ্বর হয়েছে?

—জ্বর হয়েছে বলে তো ধারণা করিনি। তবে শরীর যে খারাপ হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।

—কেমন করে?

—অনেক রাতে বাথরুমের ভিতর তোমার বমির শব্দ শুনতে পেয়ে মনে হলো···।

—কেমন করে শুনতে পেলেন?

—আমি তখন জেগে ছিলাম।

—এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন?

—হ্যাঁ, সারারাতই তো জেগে থাকি।

—কেন?

—ওটা একটা অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে।

—কবে থেকে এ অভ্যেস শুরু হলো?

—মনে হচ্ছে, তুমি ওবাড়িতে আসবার পর থেকে।

—তার মানে, আমি আছি বলেই আপনাকে জেগে থাকতে হয়।

—বোধহয় তাই। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে তো তার পক্ষে আর সাবধান থাকা সম্ভব নয়; কোন বিপদ আপদ এসে পড়লে বুঝতে পারবে না যে···।

—আপনি কি তাহলে, আমাকে পাহারা দেবার জন্যে রাত জাগেন?

হেসে ফেলে জয়দেব—তুমি জান না, বললেও বোধহয় বিশ্বাস করবে না যে, এই তো দিন সাতেক আগে সেই বৃষ্টির রাত্রিতে মস্ত বড় একটা বিষধর সাপ তোমার এই ঘরের দরজার কাছে এসে পড়েছিল। আমি জেগে ছিলাম বলে, আর এদিকে একবার এসেছিলাম বলেই···তা না হলে সাপটা হয়তো ·।

—তা হলে তো বোঝাই গেল যে, সারারাত জেগে আর এদিকে ঘুরেফিরে পাহারা দেন।

—কিন্তু তাতে কি তোমার কোন অসুবিধে আমি করছি? আমি তো…।

—কি?

—রাত্রিতে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটি না; তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবার কোন কারণ নেই।

এণাক্ষীর চোখে জ্বরের জ্বালাটা যেন হঠাৎ রাগে দাউ-দাউ করে কাঁপতে থাকে।—আমি জিজ্ঞেস করছি, এটা আপনার কি রকমের অভ্যেস?

জয়দেব বিব্রতভাবে বলে—আমি তো বরাবরই…।

এণাক্ষী—তাই বলুন; আমিও তো তাই সন্দেহ করছি। এটা আপনার অনেকদিনের অভ্যেস, প্রায় পাঁচ বছরের অভ্যেস। বলুন, সত্যি কিনা?

—ঠিক ধরতে পারছি না, তুমি কি বলছো?

—হাজারিবাগের বাড়ির গেটের কাছে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সেটাও তো এইরকমই একটা পাহারার অভ্যেস; ঠিক কিনা?

—তা, তুমি যদি এরকম একটা অভিযোগ কর, তবে আমি আর কি বলতে পারি বল।

—কিন্তু আপনার পাহারা কেউ চায় কি না চায়; সেটা বুঝতে চেষ্টা করেননি কেন?

কোন দরকার ছিল না। আমি তো কাউকে কিছু বোঝাবার জন্য কোথাও গিয়ে দাঁড়াইনি।

—কোন ইচ্ছে নিয়ে দাঁড়াননি?

—না।

—তবে কেন যেতেন আর দাঁড়িয়ে থাকতেন?

জয়দেবের যে চোখ দুটোকে চিরকাল ভীরুর চোখ বলে মনে হয়েছে এণাক্ষীর, সেই চোখ দুটোই যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিক চমকে দিয়ে কেঁপে ওঠে।—তোমাকে দেখবার জন্যে।

—কেন?

—দেখতে ভাল লাগতো বলে।

—কেন?

—তুমি দেখতে ভাল বলে।

—আপনি বাবার কারবারে টাকা দিতেন কেন?

—দিতে ভাল লাগতো।

—কেন ভাল লাগতো?

—তুমি ভাল থাকবে, সেইজন্তে।

—আমাকে তবে সেইরকমই ভাল থাকতে দিতে আর পারলেন না কেন?

—বুঝলাম না!

—আমাকে বিয়ে করলেন কেন?

—তোমার বাবা বললেন।

—বাবা বললেন বলেই বা আপনি রাজি হয়ে গেলেন কেন?

—রাজি না হলে তোমার সম্মান নষ্ট হতো।

—কি বললেন?

—তোমার মিথ্যে দুর্ণাম হতো।

—আমার দুর্ণাম কেন হবে?

—লোকে বিশ্বাসই করতো না যে, আমি বিনা লাভে তোমার বাবাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করছি।

—এখন লোকে কি বলছে?

—বলছে, যার জন্তে নিশি রায়কে টাকা দিত জয়দেব তাকেই বিয়ে করেছে জয়দেব।

—এটা কি আমার দুর্ণাম নয়?

—না। এটা আমার দুর্ণাম।

—কিন্তু আপনার কি সন্দেহ হয়নি যে, এ বিয়েতে আমার কোন আগ্রহ ছিল না!

—খুব জানতাম!

—এখনও কি জানেন না যে…

—খুব জানি, এ বিয়েকে বিয়ে বলে মেনে নিতে তোমার একটুও আগ্রহ নেই।

—কিন্তু আপনি মেনে নিয়েছেন?

—নিশ্চয়।

—আপনার কিছুই লাভ হলো না, তবু?

—হ্যাঁ, তবু।

—তবু আমাকে ঘেন্না করতে পারলেন না?

—পারলাম আর কোথায়?

—আমি তো আপনার একমাসের একটা অসুখের মধ্যে আপনার ঘরের কাছে একবারও যাই নি, কোন খবরও রাখি নি।

—তাতে কি হয়েছে? তোমার পক্ষে যা সম্ভব নয়, তা আমি আশা করবোই বা কেন?

—আশা করতে পারেন না কেন?

—আশা করা উচিত নয়।

—মিথ্যে কথা।

—কি বললে?

—একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা। সব সময় আশা করেছেন, দিনরাত আশা করেছেন, পাঁচ বছর ধরে আশা করেছেন। শুধু আমাকে বিশ্বাস করবার সাহস ছিল না বলেই......।

জ্বরের জ্বালায় বাচাল হয়ে যাওয়া প্রাণটার সব চঞ্চলতা হঠাৎ স্তব্ধ করে দিয়ে, বিচিত্র এক জোড়া জলভরা চোখের করুণ লজ্জা লুকিয়ে ফেলবার জন্য মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে এণাক্ষী।

জ্বর বিদায় নিয়েছে, সে আজ প্রায় তিন মাস আগের কথা। বাগানের গাছের চেহারা বদলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মেঘলা দুপুরের মাঝক্ষণে বাগানটার উপর একই সঙ্গে রোদবৃষ্টির খেলা মেতে ওঠে। থমথমে রোদের মধ্যেই বৃষ্টির ধারা গাছের পাতার উপর আছাড় খেয়ে পড়ে আর জলন্ত স্ফটিকের গুঁড়োর মত হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ে।

আনমনার মত তাকিয়ে থেকেও এণাক্ষীর মন যেন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝতে পারে; অদ্ভুত রকমের একটা অস্বস্তি যেন এণাক্ষীর এই আনমনা চিন্তারই আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে; রাগ হয় নিজেরই মনের উপর। লজ্জা পায়; সেদিনের চোখ দুটোর দুর্বলতার ছবিটা যখন মনে পড়ে যায়। জয়দেবের সঙ্গে এত কথা বলবার কোন দরকার ছিল না। জয়দেবের কাছ থেকে এত কথা শোনবার কোন দরকার ছিল না। এণাক্ষীর অদৃষ্টেরই একটা বেদনার সুযোগ নিয়ে ভদ্রলোক বেশ বড় বড় অহংকারের কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

অদৃষ্টটা তো অনেক আগেই কেঁদেছে; সে কান্না নীরবও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চোখ দুটো আবার কেঁদে ফেললো কেন? কিসের দুর্বলতায়।

এণাক্ষীর মনটা ছোটবেলা থেকেই দুর্বল, এই অভিযোগের কথাটাটা সেদিনও শুনতে হয়েছিল। জেঠিমা গল্প করেছিলেন মামীমার কাছে; সিউড়ির বাড়িতে, এণার বয়স তখন পনেরো পেরিয়ে ষোলোতে পড়েছে, বাড়ির দরজায় কোন ভিখিরিকে দেখতে পেলেই কেঁদে ফেলতো এণা। ভয় পেয়ে নয়; ঘেন্না করেও

নয় ; কিন্তু কেন ? জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলতে পারতো না এণা। একদিন শুধু বলেছিল, দেখতে একটুও ভাল লাগে না।

ভাবতে গিয়ে একটু লজ্জাও পায় এণাক্ষী, জয়দেবকেও কি পাঁচ বছর ধরে হাজারিবাগের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ভিখিরির আত্মা বলে মনে করেছে এণা ?

এতদিন পরে এই সত্য জানতে পেরেছে বলেই কি কেঁদে ফেলেছে এণাক্ষীর মন ?

সেদিনের সেই কথার পর এই তিন মাসের মধ্যে আর কোনদিন জয়দেবের সঙ্গে একটি কথাও হয় নি এণাক্ষীর। দু-একবার হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছে, এই মাত্র, কিন্তু দেখা হওয়া মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এণাক্ষী। জয়দেবও যেন নিজের কাজের ব্যস্ততার টানে অন্য দিকে চলে গিয়েছে ; কোন কথা বলে নি, বলবার চেষ্টাও করে নি।

কিন্তু এই ঘরটাকে সত্যিই যে আর জেলের ঘরের মত বলে মনে হয় না। প্রাণটাও আর সে-রকম হাঁসফাঁস করে না। মনে হয়, এখন হাতের কাছে একটা কাজ পেলে, কিংবা কোন একটা কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে পারলেই দিন আর রাতগুলি একরকম কেটেই যাবে। কিন্তু কাজ কোথায় ?

একগাদা উল নিয়ে বোনাবুনির কাজ করতে পারা যায়। কিন্তু কিসের জন্যে ? কে গায়ে দেবে এণাক্ষীর যত্নের তৈরী সেই উলের স্কার্ফ আর কম্ফোর্টার ? নিজের জন্যে কোন সাজের জিনিস তৈরী করতে হলে এণাক্ষীর হাতটা যে লজ্জা পেয়ে অসাড় হয়ে যাবে। আর, জয়দেবের জন্যে এই হাতে রঙীন উলের কম্ফোর্টার বুনতে হলে যে এণাক্ষীর জীবনের নূতন অপমানের জাল বোনা হয়ে যাবে। তা হলে আর বুঝতেই বা কি বাকি থাকবে যে, একটা উপকারের বিনিময়ে, শুধু কৃতজ্ঞতার চাপে পড়ে, এণাক্ষীর কাজের শরীরটা ভাড়া খাটতে শুরু করে দিয়েছে। যে মানুষের সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে ভালবাসার একটা ভঙ্গী নিয়ে বেঁচে থাকা জীবনটাই বা কি কম শাস্তির জীবন হবে ?

একটা শব্দ শুনে চমকে উঠে এণাক্ষী। একটা গাড়ীর শব্দ। গাড়িটা যেন একদমে ফটক পার হয়ে একেবারে বারান্দার কাছে এসে গরগর করছে।

মনে পড়েছে, মাইকা মার্চেণ্ট মণীন্দ্রবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে এণাক্ষীর নিমন্ত্রণ হয়েছে। এণাক্ষীকেই নিতে এসেছে মণীন্দ্রবাবুর গাড়ী। সঙ্গে বোধহয় মণীন্দ্রবাবুর মেয়ে হিমানীও এসেছে। সেই ভয়ানক মুখরা আর জেদী স্বভাবের

মেয়েটা, সেদিন যে মেয়েটা নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। এণাক্ষী স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, সম্ভব নয়, আমি যেতে পারবো না। হিমানী একেবারে হেসে ঢলে প্রায় গায়ের উপরেই পড়ে বলে গিয়েছিল—যেতেই হবে, আমি এসে জোর করে নিয়ে যাব।

হিমানী তো সত্যিই এণাক্ষীকে নিতে আসে নি, এসেছে ওদের জয়দেবদার বউকে নিয়ে যেতে। নিতান্ত একটা মিথ্যাকে নিতান্ত সত্য বলে মনে করা আর আহ্লাদে বেহায়া হয়ে এণাক্ষীর হাত ধরে টানবার জন্যে কাছে এগিয়ে এসেছে সংসারের একটা বিদ্রূপ। এই ঘরের ভিতরে একলা হয়ে পড়ে থাকবার যে-টুকু শান্তি আছে, সেই শান্তির বিরুদ্ধেও যেন নিয়তির চক্রান্তটা হিংস্র হয়ে উঠেছে। এই ঘরের ভিতরেও যেটা সত্য নয়, ঘরের বাইরে লোকের চোখের সামনে সেটাই সত্য বলে জাহির করতে হবে, এণাক্ষীর জীবনটা যে সত্যিই নটীর জীবনের মত' হয়ে উঠলো। এই ঘরের বাইরে গিয়ে আজ এণাক্ষীকে জয়দেবের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

জয়দেব কি জানে না যে, মণীন্দ্রবাবুর বাড়িতে এণাক্ষীর নিমন্ত্রণ হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, মানুষটাও কত ধূর্ত; হিমানীকে এই সামান্য কথাটাও স্পষ্ট করে বলে দিতে পারে নি যে, ওর পক্ষে নেমন্তন্নে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং এই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়েই সেদিন শুনতে পেয়েছিল এণা, মণীন্দ্রবাবুর মুখরা মেয়ে হিমানীকে যেন উৎসাহ দিয়ে কথা বলছে জয়দেব; দেখ চেষ্টা করে, যদি রাজি করাতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই।

কেন আপত্তি নেই? ভদ্রলোক বোধহয় মনে করেছেন যে, নিশি রায়ের মেয়ের মন তাঁর উপকারের মহিমা দেখে এমনই গলে গিয়েছে যে, জয়দেবের স্ত্রী সেজে মানুষের মেলায় ঘুরে বেড়াতে সে আজ আকুল হয়ে উঠেছে। সেকালের ক্রীতদাসীদের জীবনের উপরেও মতলবের প্রভুরা এরকমের জোর খাটাতো কিনা সন্দেহ। ভদ্রলোকের অহংকার আছে, কিন্তু সে অহংকার যেন একটা ভীরু চতুরতা। সত্যিকারের অহংকার থাকলে আজ নিজেই জোর গলায় চেঁচিয়ে মণীন্দ্রবাবুর মুখরা মেয়েটাকে বাধা দিয়ে বলে দিতে পারতো, না, নেমন্তন্ন যাবে না এণাক্ষী, যেয়ে কাজ নেই, যাওয়া উচিত নয়।

অন্ততঃ এণাক্ষীর কাছে এসে বলে দিয়ে যেতে পারতো, আমি চাই না যে তুমি কারও বাড়িতে নেমন্তন্নে যাও। এমন যাওয়ার কোন মানে হয় না। কেন হয় না সেটা তুমিও জান।

কিন্তু এণাক্ষীর সব জল্পনা আর কল্পনাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে সোজা এসে

ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে মণীন্দ্রবাবুর মেয়ে হিমানী।—কি আশ্চর্য, এখনও দেখছি চুপ করে বসে আছেন বউদি!

এণাক্ষী—হ্যাঁ, চুপ করে বসে থাকাই ভাল।

—কেন?

—আমার যাওয়া হবে না।

—অসম্ভব। যাওয়া হবেই। আমি আপনার কোন আপত্তি শুনবো না।

—না, ওসব কথার কোন মানে হয় না।

—কেন?

—কোথাও নেমন্তন্নে যেতে আমার ভাল লাগে না।

—তা বললে চলবে কেন? আমি হেরে যেতে পারবো না।

—কি বললে?

—নন্দিতার সঙ্গে আমার বাজি হয়েছে।

—নন্দিতা কে?

—অনাদিবাবুর মেয়ে নন্দিতা।

—কি বলেছে নন্দিতা? কিসের বাজি হয়েছে?

—নন্দিতা বলেছে, আপনি ভয়ানক অহংকারী; আমি বলেছি, আপনি একটুও অহংকারী নন। নন্দিতা আমার সঙ্গে বাজি রেখেছে, যদি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, তবে নন্দিতা আমাকে এক টাকার গোলাপজাম খাওয়াবে। যদি না নিয়ে যেতে পারি তবে আমি নন্দিতাকে এক টাকার······।

মুখরা হিমানী যেন হঠাৎ উল্লাসে আরও দুরন্ত হয়ে এণাক্ষীর গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে, আর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে।—আর দেরী করবেন না বউদি, এক্ষুণি চলুন। নন্দিতার কাছে আমার ভয়ানক অপমান হবে বউদি।

হিমানীর মুখের দিকে তাকায় এণা। মুখরা হিমানী যেন এণাক্ষীর প্রতিজ্ঞার মনটাকে হঠাৎ অপ্রস্তুত করে দিয়েছে। হিমানী নামে এই অদ্ভুত আবদারের মেয়েটার উপরে রাগ করবার জোরটা কেন যেন গিঁটছেঁড়া কাঁসের মত দুর্বল হয়ে গিয়েছে। এণাক্ষী গম্ভীর হয়ে বলে—চল।

মাইকা মার্চেন্ট মণীন্দ্রবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন। কল্পনা করতে পারা যায়, বাড়িতে নিমন্ত্রিত মহিলাদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে এণাক্ষীকেও দাঁড়াতে হবে। সে জন্যে মনে মনে প্রস্তুতও হয়েছিল এণাক্ষী। যতদূর সম্ভব কোন কথা না বলে, শুধু মুখের উপর একটা নকল প্রসন্নতার হাসি ফুটিয়ে রেখে, আর একটা ঘণ্টা পার করে দিয়েই ফিরে আসবে এণাক্ষী। যদি মহিলারা বেশি আলাপ

করতে চেষ্টা করেন, তবে একটু আড়ালে সরে যেতে হবে। শুধু নন্দিতা আর হিমানীর কাছে কাছে থেকে, আর শুধু ওদেরই সঙ্গে গল্প করে কিছু সময় পার করে দিতে হবে।

মণীন্দ্রবাবুর বাড়িটা যেন ইউকালিপটাসের প্রহরী দিয়ে ঘেরা একটা দুর্গ। নিমন্ত্রিতদের ভিড় আছে, কিন্তু বাড়িটা এত বড় বলেই ভিড়টাকে ভিড় বলে মনে হয় না। অনেক ঘর আর অনেক বারান্দা; বারান্দায় পুরুষদের সমাবেশ আর ঘরের ভিতরে মেয়েরা। বাড়িটা এত বড় বলেই বোধহয় এত মানুষের মুখরতার শব্দটা কোলাহল না হয়ে গম্ভীর প্রতিধ্বনির গুঞ্জনের মত একটা শব্দের সাড়া জাগিয়েছে।

বাড়ির পিছনে একটা বাগান। সে বাগানে একটা ফোয়ারাও আছে। আর সেই ফোয়ারার কাছে ছোট একটা কেবিন ঘরও আছে, যার শরীরটা রঙীন কাঠের ফ্রেম আর অভ্রের টুকরো দিয়ে গড়া।

এণাক্ষীকে দেখতে পেয়েই খুশি হয়ে মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে-কথা বললেন, তাতে এণাক্ষীর মনের উদ্বেগ শান্ত হয়ে গেল। আসুন ভাই, আপনাকে একটুও বিরক্ত করব না। এখানে নয়, আপনি হিমি আর নন্দিতার সঙ্গে ঐ কেবিন-ঘরে বসে গল্প করুন।

মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রীও হয়তো ধারণা করেছেন যে, জয়দেববাবুর স্ত্রী বেশ অহংকারী। তাই মানুষের ভিড় থেকে একটু দূরে এণাক্ষীর জন্য একটা নিরুপদ্রব অহংকারের ঠাঁই ঠিক করে রেখেছেন। এণাক্ষীর মনে একবার এমন সন্দেহ যে হয় নি, তা নয়। কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রীই সেই সন্দেহ মিথ্যে করে দিলেন।—আমি জানি, আপনি ভিড়-টিড় পছন্দ করেন না। খুব ভাল করেন। মানুষের মতিগতির তো কোন ঠিক নেই; কে জানে কে কেমন কথা বলে ফেলবে, শুনে আপনার খুব খারাপ লাগবে। তাই...।

এণাক্ষীকে আর কোন কথা না বলে, হিমানী আর নন্দিতাকেই নির্দেশ দিলেন মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী, তোরা বউদিকে নিয়ে বাগানের কেবিন ঘরে বসে গল্প কর।

কেবিন ঘরের ভিতরে বসে সামনের ফোয়ারাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালই লাগে, হিমানী আর নন্দিতার হারজিতের তর্ক শুনতেও ভাল লাগে। মনে হয়, এসে ভালই হয়েছে। কিছুক্ষণের মত প্রাণটা যেন নিজেরই স্মৃতির শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে এই আলো-ছায়া আর ফোয়ারার শব্দ আর দুটি দুরন্ত আনন্দের মেয়ের অবাধ খুশির কলরবের সঙ্গে মিশে থাকতে পারবে।

মনে পড়ে এণাক্ষীর, এণাক্ষীর চোখ দুটো যেন পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর আলো-ছায়ার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে শুধু নিজের দিকে তাকিয়েছে ; তাই নিজের ইচ্ছাটাকেই সর্বস্ব বলে মনে হয়েছে। গান ছেড়ে দিয়েছে, ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়া যার বাতিক ছিল, তার হাতে এই পাঁচ বছরের মধ্যে কটাই বা বই দেখতে পাওয়া গিয়েছে ?

হিমানী আর নন্দিতার এলোমেলো তর্কের ভাষাও শুনতে যে এত ভাল লাগবে, এক ঘণ্টা আগেও এমন ধারণা করতে পারে নি এণাক্ষীর আত্মবিব্রত মন। মনটাই যেন একটা অন্ধকারের কুঠরীর মত গ্রাস থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে খোলামেলা আলো আর আঙিনার মধ্যে এসে পড়েছে।

তাই মনে পড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে শুধু নিজের প্রাণের স্বার্থের দাবি ছাড়া আর কোন আগ্রহের টানে কারও সঙ্গে মন খুলে পাঁচ মিনিটও গল্প করে নি এণাক্ষী। জীবনের সকল ইচ্ছার মধ্যে শুধু একটা ইচ্ছার দাবিকে ভালবেসে, আর সেই ভালবাসার মত দাবির বালাই নিয়ে হেসে-কেঁদে, ভয় পেয়ে, আর আতঙ্কিত হয়ে প্রাণটাকেই হয়রাণ করা হয়েছে।

হিমানী আর নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আর ওদের অবাধ খুশির আবোল-তাবোল শুনে এণাক্ষীর চোখেও যেন একটা হিংসুটে ইচ্ছার লোভ উথলে ওঠে। সব ভুলে নিয়ে এণাক্ষীর প্রাণটাও কি ওদের প্রাণের মত ভাবনা ছাড়া আনন্দের ফোয়ারা হয়ে যেতে পারে না ? নিজেরই বারো বছর বয়সের সেই জীবনের ছবিটাকে যেন আজ চোখে দেখতে পায় এণা ; চমৎকার নির্ভয় খুশির জীবন। পৃথিবীর যে-কোন মানুষের মুখের দিকে তাকাতে কোন ভয় ছিল না। কোন আশা নিয়ে কারও মুখের দিকে তাকাতে হতো না।

কি যেন সেই মহাপুরুষের নাম, আজ আর স্মরণ করতে পারে না এণাক্ষী ; সেই বইটার নামও মনে পড়ে না, যেটাতে সেই মহাপুরুষের অনেক উপদেশের কথা ছিল। মহাপুরুষ বলেছেন, ভালোবাসা হলো বয়সের বিষ। শিশু-সাপের দাঁতে বিষ থাকে না, বড় হবার পর বিষ দেখা দেয়। সেদিন বই পড়ে হেসে ফেলেছিল এণাক্ষী। কিন্তু এখন যে সত্যিই সন্দেহ করতে হয়. এণাক্ষীর সে হাসি ছিল সেই পাগলের হাসি, যে পাগল পৃথিবীর আর-সবাইকে পাগল বলে মনে করে হাসতো।

কে জানে কেন, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় এণাক্ষী ; নিশি রায়ের মেয়ের জীবনে ভালবাসা নামে কোন বিষের উৎপাত তো আর নেই। তবে আর মনের মধ্যে চিন্তার উৎপাত কেন ? হঠাৎ আশ্চর্য হয়, আর একটু বিরক্ত হয়ে

কেবিন-ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকায় এণাক্ষী। দরজার কাছে একটা অলোয়ানের প্রান্ত দুলছে; এক ভদ্রলোক এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ভদ্রলোকের মূর্তিটা এইবার দরজার সামনে এসেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর এণাক্ষীর চোখ দুটো হঠাৎ আতঙ্কিতের চোখের মত শিউরে ওঠে, যেন এণাক্ষীর পূর্বজন্মের পরিচিত কোন মূর্তি হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত হয়েছে।

উপস্থিত হয়েছেন যিনি, তিনি সত্যিই এণাক্ষীর কাছে পূর্বজন্মের পরিচিত একটি মানুষ। গয়ার হৃষীকেশবাবু, এণাক্ষীর জীবনের সেই মনোময় যার একমাত্র ছেলে, যে মনোময়ের ভালবাসা পেয়ে এণাক্ষীর বাইশ বছর বয়সের সীমন্ত-সরণি প্রথম উৎসবের সিঁদুরে রঙীন হয়ে উঠেছিল।

চেয়ার ছেড়ে ধড়ফড় করে যেন হৃৎপিণ্ডেরই একটা দুঃসহ আতঙ্ক সামলে রেখে, উঠে দাঁড়ায় এণাক্ষী। কিন্তু চুপ করে আর স্তব্ধ হয়ে শুধু দাঁড়িয়েই থাকে। মাথাটাও হেঁট হয়ে যায়। যেন এক অপরাধিনীর প্রাণ কুণ্ঠীতভাবে বিচারকের চোখের সামনে কাঠগড়ার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে।

হৃষীকেশবাবু বলেন, আমি ইচ্ছে করেই এখানে এসেছি। তোমাকে দেখবার জন্যেই এসেছি।

উত্তর দেয় না এণাক্ষী।

হৃষীকেশবাবু—মণীন্দ্রবাবু জানেন না যে, তোমারই সঙ্গে আমার ছেলে মনোময়ের বিয়ে হয়েছিল। জানলে বোধহয় তিনি আমাকে আজ এখানে নিমন্ত্রণ করতেন না; কিংবা তোমাকে নিমন্ত্রণ করতেন না।

হিমানী আর নন্দিতার দিকে চকিতে একবার ভ্রূক্ষেপ করে নিয়েই হৃষীকেশবাবু বলতে থাকেন।—আমি এ শহরে এসেছিলাম একটা মামলার কাজে। ইচ্ছে ছিল, যদি সুযোগ হয়, তবে তোমাকে একবার দেখে যাব। কিন্তু সেজন্য নিশ্চয়ই তোমার নতুন স্বামীর বাড়িতে যেতাম না।

এণাক্ষীর হেঁট মাথাটাও কেঁপে ওঠে। আর মুখটাও যেন একটা জ্বালাময় যন্ত্রণার ধোঁয়ায় কালো হয়ে যেতে থাকে।

হৃষীকেশবাবু—আমার প্রশ্ন, তুমি এরকম একটা অপমানের কাণ্ড করলে কেন?

আস্তে আস্তে মুখ তুলে হৃষীকেশবাবুর আলোয়ান-জড়ানো কঠোর চেহারাটার দিকে তাকাতে চেষ্টা করে এণাক্ষী।

হৃষীকেশববে—আমার একমাত্র ছেলে ছিল মনোময়। সে যখন চলেই

গেল, তখন আমার সব সম্পত্তি তোমারই হয়ে গিয়েছিল। তুমি সব পেতে। একটা মাইকা-বেচা বাজে লোককে তোমার বিয়ে করবার কোন দরকার ছিল না।

হৃষীকেশবাবুর মুখের দিকে এইবার সোজা চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে এণাক্ষী।

হৃষীকেশবাবু—আমার মনোময়ের স্ত্রী হয়ে তুমি কোন্ সাধে কিসের আশায় ওরকম একটা মানুষকে বিয়ে করলে, যে আমার মনোময়ের চাকর হবারও উপযুক্ত নয়।

এণাক্ষী—আপনি এসব কথা না বললেই ভাল করতেন।

হৃষীকেশবাবু—কি বললে?

এণাক্ষী—আর ওসব কথা বলবার কোন মানে হয় না। যা হবার ছিল, তাই হয়েছে।

হৃষীকেশবাবুর চোখের দৃষ্টিও যেন দপ্ করে জ্বলে উঠে।

—তুমি না মনোময়কে ভালবেসে বিয়ে করেছিল?

—হ্যাঁ।

—তবে আবার জয়দেবের মত একটা লোককে বিয়ে করলে কেন? আবার ভালবাসা হয়েছিল বোধহয়?

—না।

—তবে?

—আমার অদৃষ্ট।

—মিথ্যে কথা।

—না।

—নিশ্চয়ই হ্যাঁ।

—না।

—তবে আমার ছেলের উপরেও তোমার কোন ভালবাসা ছিল না?

—ছিল, কি না ছিল, সেটা আপনার ছেলেই জানতো। আপনি এসব কথা তুলবেন না।

—তবে কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, জয়দেবকে তুমি অকারণে বিয়ে করেছো?

—না?

—তবে? কার ইচ্ছেয় এ বিয়ে হলো?

—যাকে বিয়ে করেছি, তারই ইচ্ছেয়।

—বুঝলাম, নিশি রায়ের মেয়ে হলো সেইসব নিতান্ত ছোট চরিত্রের মেয়েদেরই একজন, যারা ভালবাসার জন্যে নয়, শুধু বয়সের আহ্লাদের জন্যে যে-কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। টাকার জন্যে যে-সব মেয়ে পুরুষের কাছে যায়, তুমি তাদের চেয়েও ছোট।

এণাক্ষীর চোখেও যেন আগুনের ছায়া দপ্ দপ্ করে।—আমি ছোট ঠিকই কিন্তু যাকে বিয়ে করেছি সে মানুষ পৃথিবীর কারও চেয়ে ছোট নয়।

হৃষীকেশবাবু—কি বললে? ছোট নয়? আমায় মনোময়ের কাছে তোমার ঐ জয়দেব ছোট নয়?

এণাক্ষী—একটুও ছোট নয়। বরং…।

হৃষীকেশবাবু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকান।

—বুঝলাম।

কি বুঝলেন হৃষীকেশবাবু, সে-কথা আর বলতে পারলেন না। এণাক্ষীর মুখের দিকে আর তাকালেনও না। বোধহয় একটু ভয়ও পেয়েছেন তিনি।

আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে, নিশি রায়ের মেয়ের নির্লাজ আকাঙ্ক্ষার মুখটা চিৎকার করে বলে দেবে, বরং জয়দেবই আপনার ছেলের চেয়ে অনেক বড়। সে অপমানের চিৎকার নিজের কানে শোনবার আগেই হন হন করে হেঁটে চলে গেলেন হৃষীকেশবাবু।

মণীন্দ্রবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনের উৎসব দেখতে এসে আর কার সঙ্গে কি কথা হলো, কিছুই মনে পড়ে না। ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিতেই শুধু মনে পড়ে যে, মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী বেশ দুঃখিত হয়েছেন। অনেক অনুরোধ করেছিলেন হিমানীর মা, তবু কিছু খেতে রাজি হয় নি এণাক্ষী।

কিন্তু মাথার ভিতর যেন কতগুলি কঠোর চিৎকারের শব্দ ছটফট করে বাজছে। শব্দগুলি হলো হৃষীকেশবাবুর যত গম্ভীর অভিযোগের আর এণাক্ষীর পাল্টা জবাবের যত উতলা প্রতিধ্বনি। ঝিম ঝিম করে মাথাটা। এণাক্ষী যেন আজ অদৃষ্টের এক দায়রা আদালতের কাঠগড়া থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু পালিয়ে আসবার আগে যেন চরম জবাব শুনিয়ে দিতে পেরেছে। মনোময়ের চেয়ে জয়দেবই বরং…।

এ সত্য কোথায় খুঁজে পেল, কেমন করে পেল আর কবে পেল এণাক্ষী? এণাক্ষীর বুকের ভিতরে এরকম একটা কথা যে লুকিয়ে থাকতে পারে, এ

সন্দেহও তো কোন দিন হয় নি।

জয়দেব, যাকে ঘৃণা করবার জন্যেই বিয়ে করেছে এণাক্ষী, সে মানুষটার সম্পর্কে বাইরের পৃথিবীর মুখে একটা অপমানের কথা শুনেই কি-ভয়ানক বিদ্রোহ করে চেঁচিয়ে উঠেছে নিশি রায়ের মেয়ের অন্তরাত্মা! এমন অসম্ভব সম্ভব হলো কেমন করে? হৃষীকেশবাবুর অহংকেরে দুঃসাহসকে ক্ষমা করতে না পেরে, তার ছেলেকেই স্পষ্ট ভাষায় ছোট করে দিতে একটুও ভয় পায় নি এণাক্ষী। এমন সাহস কোথায় পেল এণাক্ষী? জয়দেবকে অপমানের আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য এণাক্ষীর প্রাণের এত বড় আকুলতারই বা অর্থ কি?

ঘরের নিভৃতে চুপ করে আর শান্ত হয়ে বসে, আর বার বার চোখের জল মুছে যেন নিজেকেই ক্ষমা করতে চেষ্টা করে এণা। না, মনোময়কে ছোট করে দেয় নি এণা। এখনও যে বুকের ভিতরে পাঁচ বছর আগের অনুভবের মায়াটা ছায়াময় হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মিথ্যে নয় মনোময়। সে-জীবনে মনোময়ের চেয়ে সুন্দর সত্য পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টটা নিশি রায়ের মেয়েকে সে-জীবনের ঠাঁই থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য এক জীবনের কাছে এনে ফেলেছে। সেই অতীতটা আজ এণাক্ষীর কাছে স্বপ্নে দেখা একটা সত্য মাত্র। আজ মনোময়ের সঙ্গে জয়দেবের সম্মানের তুলনা করারও কোন অর্থ হয় না। আজ যে জয়দেবই এণাক্ষীর জীবনের কাছে বাস্তব সত্য; সে সত্য যতই ফাঁকির সত্য হোক না কেন। লোকের চোখে এণাক্ষীর যে আজ জয়দেবের স্ত্রী ছাড়া আর কোন পরিচয় নেই।

মনটা খুবই হয়রাণ ও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে বোধহয়; তা না হলে নানারকম উদ্ভট কল্পনাও মনের ভিতরে উঁকি ঝুঁকি দেয় কেন? হৃষীকেশবাবু আর আসবেন না; তাঁর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, যদি এই মুহূর্তে, এই ঘরের দরজার কাছে এসে দেখা দেয় মনোময়?

যদি এসে একেবারে স্পষ্টভাষায় দাবি করে বসে মনোময়, এই ঘর ছেড়ে এই মুহূর্তে তোমাকে যেতে হবে। তবে?

—ছিঃ, একথা বলতে নেই। আজ আর তোমার পক্ষে একথার কোন মানে হয় না।

সত্যিই বিড় বিড় করে এণাক্ষীর ঠোঁট দুটো, চোখ দুটোও যেন আতঙ্কময় তন্দ্রায় অভিভূত দুটো চোখের মত বুঁজে যায়।

মনোময়ের মুখটা অপ্রসন্ন, বেশ একটু বিস্মিত ও বিরক্ত। —কোন মানে হয় না? কেন চলে যেতে পারবে না?

—বিনা দোষে এই ভদ্রলোককে একলা ফেলে রেখে···ছিঃ···এরকম নিষ্ঠুরতা আমার পক্ষে সম্ভব নয়···।

কথা বলছে এণাক্ষীর মন, আর এণাক্ষী যেন নীরব হয়ে সেই কথা শুনছে। স্বীকার করতে একটুও লজ্জা পাচ্ছে না এণাক্ষী, জয়দেবের বাড়ির এই ঘর ছেড়ে চলে যেতে আজ এণাক্ষীর একটুও ইচ্ছে করে না, চলে যাবার সাধ্যই নেই। মানুষটা নিশিবাবুর মেয়েকে ভালবেসে কোন অপরাধ করে নি। যদি সেটা অপরাধ হয়ে থাকে, তবে মনোময়ই সব চেয়ে আগে সে অপরাধ করেছে।

বাগানের বাতাসের একটা দমকা আঘাতে জানালার কাঁচ ঝন ঝন করে উঠে। চমকে ওঠে এণাক্ষী, আর চোখ মেলে তাকিয়ে যেন মনের ভিতরে একটা ভয়ের ছায়াকে মুক্ত করে দিতে চায়। ছায়াটা যেন মনোময়েরই ছায়াময় স্মৃতিটা; এ ছায়া চলে গেলেই ভাল। জয়দেবকে মিছিমিছি অপমান করতে চাইছে যে স্মৃতি, তার সঙ্গেও হেসে হেসে কোন কথা বলা সম্ভব নয়। জয়দেব কি জানে না যে, নিশি রায়ের মেয়ে একদিন মনোময়কে ভালবেসে বিয়ে করেছিল? কিন্তু কই সে জন্যে তো জয়দেবের মনে কোন অভিযোগ নেই।

বিকেল হয়ে এসেছে। বাগানের গাছগুলি একেবারে সুস্থির হয়ে গিয়েছে, বাতাসের ছট্‌ফটে ছুটোছুটি শান্ত হয়ে গিয়েছে। গাছগুলি যেন দিনের শেষের আলোকস্নানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। একটা কাঠবিড়ালী শুধু ব্যস্ত হয়ে আমড়া গাছের কিশলয় ছিঁড়ে খায়।

বুঝতে অসুবিধে নেই, তাই ইচ্ছে করে, এই ঘরের শূন্যতা থেকে সরে গিয়ে একবার বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে নিতে; বেঁচে থাকতে হলে এভাবে এই ঘরের ভিতরে পড়ে থাকলে চলবে না।

সত্যিই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বাগানের কাছে এসে দাঁড়ায় এণাক্ষী। চাকর গিরিধরও যেন একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায় আর ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে; একটা চেয়ার নিয়ে এসে রাখে—বসুন মা।

চেয়ারে না বসে, যেন আনমনার মত বলে ওঠে এণাক্ষী—টগরগুলোর চারদিকে এত জঙ্গল কেন? মালী বোধহয় কাজে ফাঁকি দিতে ভালবাসে।

—এ মালী, জলদি ইধার আও। চেঁচিয়ে ওঠে গিরিধর।

এণাক্ষীও হঠাৎ চমকে ওঠে, যেন মনের ভুলে বলে ফেলা কথাটাকেই ভয় পেয়েছে। জয়দেবের বাগানের ফুলের অযত্ন দেখে রাগ করেছে এণাক্ষীর মন। এণাক্ষীর মনটা যেন নিজেরই একটা বেহায়া আগ্রহের শব্দ শুনে লজ্জা পেয়েছে।

চেয়ারে না বসে আনমনার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এণাক্ষী।

গিরিধর চাকরটা এণাক্ষীর চোখের সামনেই ঘুরঘুর করছে; মালীটাও ছুটে এসে বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করছে।

কিন্তু বুঝতে পারে এণাক্ষী, এখানেও আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হবে না। গয়ার হৃষীকেশবাবুর কাছে গর্ব করে কি-ভয়ানক একটা কথা বলে দিয়েছে এণাক্ষী,·· বলতে একটুও সঙ্কোচ হয় নি। জয়দেবের সঙ্গে ভালবাসার কোন ব্যাপার হয় নি, বিয়ে করবার জন্য কোন ইচ্ছাও ছিল না, নিশি রায়ের মেয়ে শুধু অদৃষ্টের চাপে জয়দেবকে বিয়ে করেছে। জয়দেবকে এমন ভয়ানক অপমানে ছোট করে দিতে এণাক্ষীর মুখের ভাষাটা একটুও লজ্জা পায় নি। আশ্চর্য, একজন বাইরের মানুষের কাছে কেমন করে কথাগুলিকে এত সহজে বলে দিতে পারলো এণাক্ষী? মানুষটাকে তো ঘরেই অনেক অপমান করা হয়েছে; আবার ঘরের বাইরে সে অপমান ছড়িয়ে দেওয়া কেন?

এণাক্ষীর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠতে চাইছে; তাই আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; আবার ঘরের দিকেই চলে যায়।

ভিতরের বারান্দায় উঠতেই একবার চমকে উঠতে হয়। দাঁড়িয়ে আছে জয়দেব। কখন ফিরে এসেছে, কে জানে? এতক্ষণ ধরে এত আনমনা হয়ে ছিল বলেই বোধ হয় শুনতে পায় নি এণা, জয়দেবের গাড়িটা অনেকক্ষণ আগেই শব্দ করে গ্যারেজের ভিতরে ঢুকেছে।

জয়দেব হাসে—শুনলাম, তুমি মণীন্দ্রবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে।

এণাক্ষী—হ্যাঁ।

জয়দেব—শুনলাম, মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হয়েছেন।

এণাক্ষী—আর কিছু শোনেন নি?

এণাক্ষীর গম্ভীর মুখের গম্ভীর প্রশ্ন শুনে জয়দেব যেন একটু বিব্রত হয়।

—না, কই, আর তো কিছু শুনি নি।

এণাক্ষী—গয়ার হৃষীকেশবাবুর কাছ থেকেও কিছু শুনতে পান নি?

—কি বললে? জয়দেব যেন অপ্রস্তুত হয়ে আর কুণ্ঠিতভাবে কথা বলে।

এণাক্ষী—কি বললেন হৃষীকেশবাবু?

জয়দেব—হৃষীকেশবাবুকে তুমি সত্যি কথাই বলেছ; আমিও অস্বীকার করি নি যে……।

এণাক্ষী—কি অস্বীকার করেন নি?

জয়দেব—তুমি যে নিতান্ত অনিচ্ছায় বিয়ে করেছ ; সেটা আমি যে জানি, এই কথাটা আমি···।

এণাক্ষীর চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে ওঠে। একথা আপনি অনায়াসে একজন বাইরের মানুষের কাছে বলে দিতে পারলেন ? একটুও লজ্জা হলো না !

জয়দেবের বিব্রত ও বিস্মিত মূর্তিটার দিকে যেন একটা নীরব ধিক্কারের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এণা সেই মুহূর্তে বারান্দা থেকে সরে যায়।

এণাক্ষীর এই অশান্ত মূর্তিটা যেন একটা দুঃসহ অভিমানের মূর্তি। এই জয়দেব যেন অকারণে একজন বাইরের মানুষের কাছে এণাক্ষীর নামে একটা মিথ্যা অপমান আর অপবাদের গল্পকে সত্য বলে প্রচার করে দিয়ে এসেছে। বলতে একটুও লজ্জা পায় নি ভদ্রলোক, একটুও মায়া হলো না, মুখের ভাষায় বাধলোও না। আস্তে আস্তে হেঁটে, যেন একটা শাস্তির জ্বালাকে নিঃশ্বাসের চাপে অলস করে দিয়ে, ঘরের দিকে চলে যায় এণাক্ষী।

জয়দেব বলে—তুমি বোধহয় বুঝতে ভুল করলে ; আমি কিন্তু ইচ্ছে করে···। তার মানে · বুঝতেই পারি নি যে···।

একটা কাজ খুঁজে পেয়েছে এণাক্ষী, যে কাজের উল্লাস এণাক্ষীর ঘরের গম্ভীর শূন্যতাকে মাঝে মাঝে মুখর করে তোলে আর হাসিয়েও দেয় অন্তত তিন-চারটে দিন।

মুখরা মেয়ে হিমানী আসে ; আর তিনকড়িবাবুর দুরন্ত মেয়ে নন্দিতা আসে। একগাদা পোড়া মাটির পুতুল নিয়ে ওরা দুজনে হুল্লোড় করে এণাক্ষীর ব্যস্ততা-হীন নীরব ঘরের প্রাণটাকেই যেন ব্যতিব্যস্ত করে দিয়ে চলে যায়।

ওরা জানতে পেরেছে, বেশ ভাল ছবি আঁকতে পারে এণা বউদি। তাই ওদের পোড়া মাটির পুতুলগুলিকে ইচ্ছামত রঙীন করে নেবার জন্যে ওরা আসে। ওরা যেমনটি চায়, ঠিক তেমনটি করে রং বুলিয়ে পুতুলগুলির রূপ তৈরী করে দেয় এণাক্ষী। একই ছাঁচের পুতুল এণাক্ষীর হাতের তুলির ছোঁয়ায় কতরকমের রূপের পুতুল হয়ে যায় ; ফুটফুটে তুলতুলে খুকী, থুড়থুড়ি বুড়ি, রাজরাণী আর ভিখারিণী। পছন্দ না হলে, রূপ বদলে দেয় এণাক্ষী। তুলির তিনটে আঁচড়ে থুড়থুড়ি বুড়িটা চমৎকার গালফোলা একটা খুকী হয়ে যায়। বাঘ হয়ে যায় সিংহ ; আর হরিণ হয়ে যায় খরগোস।

হিমানী মাঝে মাঝে মুখভার ক'রে অভিযোগ করে।—মা খুব দুঃখ করেন, আপনি আর একদিনও আমাদের বাড়িতে গেলেন না।

হিমানীর মায়ের এই দুঃখের কথাটা শুনে একটুও খুশি হয় না এণাক্ষী। বরং বেশ একটু বিরক্ত বোধ করে। হিমানীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাবার স্মৃতিটা আজও যে কাঁটার মত মনের ভিতরে বিঁধেছে। না গেলেই ভাল ছিল; তা হলে গয়ার হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ত না। পূর্বজন্মের একটা আক্রোশের চোখের সামনে পড়ে এত বজ্রে কথা শুনতে আর বলতেও হতো না। সেদিনের ঘটনাটা এণাক্ষীর মনে অনেক অশান্তি ঘটিয়েছে।

কিন্তু হাজারিবাগের বাড়িতে একবার যেতেও কি ইচ্ছে করে না? জেঠিমার চিঠি এসেছে, মামিমার চিঠি এসেছে। কত চিঠিই তো এল। সব চিঠিতেই সেই একই মায়ার আহ্বান, কিছুদিনের জন্য একবার এখানে এস এণা; না এলে আমাদের মন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। জানি না, বাপের বাড়ির উপর তোমার এ কেমন অভিমান?

সত্যিই ভয়ানক অভিমান, হাজারিবাগের বাড়িতে যেতে একটুও ইচ্ছে করে না।

ভুলতে পারে নি এণাক্ষী, হাজারিবাগের সে বাড়ি কত নিলজ্জ হয়ে, শুধু নিজের স্বার্থের জন্য বাড়ির মেয়েকে একজন উপকারীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাবির জন্যে একটুও মায়া করে নি সেই বাড়ি। উপকারী জয়দেবের টাকায় আজও নিশ্চয় সে বাড়ির খাওয়া-পরার জীবন সুখী হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। তবে আর এই মায়া-কান্না কেন? হাজারিবাগের বাড়ির ইচ্ছা সফল হয়েছে। বাড়ির মেয়ের জীবনের ইচ্ছাটা কোন্ স্বর্গে বা নরকে গেল, সে খোঁজে আর দরকার কি?

ভুলতে পাচ্ছে না এণাক্ষী, এতদিনের মধ্যে বাবার কাছ থেকে একটিও চিঠি আসে নি। বুঝতে অসুবিধে নেই, মেয়ের জীবনের জন্য কোন মায়ার বালাইও তাঁর মনের মধ্যে নেই। জয়দেবের উপকারের অঙ্গীকারে নিশ্চিন্ত হওয়াই যার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর মন নিশ্চিন্ত হয়েই গিয়েছে।

বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না, বাড়ির চিঠিতে এ খবর জানতে পেরে এণাক্ষীর চোখ জলে ভরে যায় ঠিকই, কিন্তু চোখ মুছে ফেলবার পরেই মনে পড়ে যায়; টাকার কাছে মেয়েকে উৎসর্গ করে দেওয়াও তো মায়াময় মনের কাজ নয়। টাকার মানুষের ঘরেই পড়ে আছে এণাক্ষী; সে-ঘরে চিরকাল পড়েই থাকবে। যেমন মণীন্দ্রবাবুর বাড়িতে, তেমনই হাজারিবাগের বাড়িকেও যাবার কোন ইচ্ছা এণাক্ষীর মন ব্যাকুল করে তুলতে পারে না; তোলেও না।

হিমানীর মা নিজেই হঠাৎ একদিন উপস্থিত হয়ে এণাক্ষীর কাছে যেন ক্ষমা

চাওয়ার ভঙ্গীতে কথা বলেন—আপনি বিশ্বাস করুন, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা সেদিন জানতেই পারি নি যে, গয়ার হৃষীকেশবাবু আপনাকে অনেক বাজে কথা শুনিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কোন সন্দেহ হয় নি যে, হৃষীকেশবাবু এরকম একটা কাণ্ড করতে পারেন। যাই হোক্, উনি কিন্তু খুব দুঃখিত হয়েছেন, আর হৃষীকেশবাবুকে কয়েকটা শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

এণাক্ষী হাসতে চেষ্টা করে—কিন্তু সেজন্য আমি তো আপনাদের ওপর রাগ করি নি।

—আমাদেরই ওপর রাগ করা উচিত; আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন বলেই তো আপনাকে এসব অশান্তি সহ্য করতে হলো।

—অশান্তি আবার কিসের ?

—তবে আমাদের বাড়িতে একবাব চলুন, যদি রাগ না করে থাকেন।

—যাব একদিন।

—কবে যাবেন বলুন ? হিমানীর বাবা জানতে চেয়েছেন। ভদ্রলোকের সব রাগ আমার উপর পড়েছে। আমারই নির্বুদ্ধিতার জন্যে নাকি আপনাকে মিছিমিছি বাইরের এক ভদ্রলোকের যত বাজে কথার অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কাজেই আপনি আর একবার আমাদের বাড়িতে না গেলে ভদ্রলোকের রাগ থেকে আমি রেহাই পাব না।

এণাক্ষী প্রায় চেঁচিয়ে হেসে ফেলে—বাজে কথা যখন, তখন অপমান হবে কেন ?

—হিমানীর বাবাকে আমিও তো সেই কথাই বলেছি। হৃষীকেশবাবুর বাজে কথা তুচ্ছ করাই ভাল। কোন মানে হয় না।

—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

হৃষীকেশবাবু আমাদের কুটুম্ব; কিন্তু মানুষটি একটু অবুঝ। তা না হলে আপনার বাবার মত এত মহৎ একজন মানুষকেও বাজে কথা বলতে সাহস করবেন কেন ?

চমকে ওঠে এণাক্ষী।—কি বললেন ?

—উনিই বললেন, হৃষীকেশবাবু আপনার এই বিয়ে বন্ধ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

—মণীন্দ্রবাবু এসব কথা কোথায় শুনলেন ?

—আপনি কি কিছু জানেন না ?

—না।

—হৃষীকেশবাবু বলেছেন। সব সম্পত্তি আপনারই নামে লিখে দিতে চেয়েছিলেন হৃষীকেশবাবু, যদি এই বিয়ে বন্ধ করা হয়। কিন্তু আপনার বাবা রাজি হন নি।

—কেন রাজী হন নি?

হিমনীর মা আশ্চর্য হন।—তাও কি আপনি জানেন না?

—না।

—আপনার বাবা একেবারে স্পষ্ট ভাষায় হৃষীকেশবাবুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, টাকার চেয়ে মানুষ বড়।

—তার মানে?

হৃষীকেশবাবুর অগাধ সম্পত্তির চেয়ে জয়দেববাবুর মত মানুষ অনেক বড়।

এণাক্ষীর চোখের দৃষ্টিটা যেন ভেজা কাচের মত ঝিকঝিক করে। হিমানীর মা যেন এণাক্ষীর চোখের একটা অন্ধতার আবরণ সরিয়ে দিয়ে একটা অপার্থিব রহস্যের রূপকথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

সত্যিই, হিমানীর মা এইবার যেন নিজেই একটি খুশিভরা বিশ্বাসের আবেগে আরও অদ্ভুত একটা কথা বলে ফেলেন।—টাকার জোরে কি কারও ভালবাসা মিথ্যে করে দেওয়া যায়? হৃষীকেশবাবুর সাধ্যি হয় নি। আর আপনার বাবার সৎসাহসেরও প্রশংসা করতে হয়।

এণাক্ষীর চোখের তারা দুটো ছটফট করে ওঠে।—কি বললেন?

—বলছিলাম আপনাদেরই কথা।

—কি?

—এই জয়দেববাবুর সঙ্গে আপনার বিয়ে হলো। উনি বলেন, আমিও বলি, খুব ভাল হয়েছে। ভালবাসা যখন হয়েই গেল, তখন বিয়ে না হওয়াই অন্যায়।

আরও কিছুক্ষণ ছিলেন হিমানীর মা, আরও অনেক কথা বলেছিলেন। হিমানীর মামাবাড়ির যত গল্প আর হিমানীর যত উপদ্রবের গল্প। সবই চুপ করে শুনেছিল এণাক্ষী। অনেক কথার জবাবও দিয়েছিল, কথায় কথায় মাঝে মাঝে হেসেও ফেলেছিল। কিন্তু, ততক্ষণ বুকের ভিতরে যেন একটা তুফানের চঞ্চলতা কোন মতে সামলে রেখেছিল এণাক্ষী।

হিমানীর মা চলে যাবার পরেই বুঝতে পারে এণাক্ষী, তুফানটা যেন কতগুলি ধিক্কারের তুফান। কি ভয়ানক বাজে কথা বলে চলে গেলেন হিমানীর মা;

ভুলেও সন্দেহ করতে পারলে না যে, ভালবাসা হয় নি।

কতক্ষণ নিঝুম হয়ে বসেছিল, বুঝতে পারে নি এণা; চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে কতক্ষণ ধরে বাগানের টগরগুলির দিকে তাকিয়ে আছে, তাও জানে না। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে এণাক্ষী। টেবিলের দেরাজ থেকে কাগজ আর কলম বের করে চিঠি লিখতে থাকে। গিরিডির এই নির্বাসিত জীবনের কোন মুহূর্তে যার কাছে চিঠি লিখবার কোন ইচ্ছা এণাক্ষীর মনে উঁকি দেয় নি, তারই কাছে চিঠি লেখা।—আমার মনে হয়, তুমি আজও আমার ওপর খুব রাগ করে রয়েছ বাবা; কিন্তু—

চিঠি লেখা শেষ করেই, বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে, আর বালিশের মধ্যে ঝাপ্‌সা চোখ দুটোকে গুঁজে দিয়ে, যেন একটা সান্ত্বনাময় আলস্যের মধ্যে প্রাণটাকে লুটিয়ে দেয় এণাক্ষী। এতদিনের অভিমানটা যেন নিজেই ভুলের লজ্জায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। টাকার উপকারের জন্য নয়, মানুষটারই জন্য মেয়েকে গিরিডির জয়দেবের ঘরে পাঠিয়েছেন হাজারিবাগের নিশি রায়। গয়ার হৃষীকেশবাবুর টাকা তাঁর প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যে করে দিতে পারে নি। পাঁচ বছর ধরে অকারণে যে মেয়েকে ভালবেসে এসেছে গিরিডির জয়দেব, সে মেয়েকে গিরিডির জয়দেবরই কাছে সঁপে দিয়ে নিশ্চিত হয়েছে সে মেয়ের বাপ।

বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে পেরেছে এণাক্ষী। এণাক্ষীর প্রাণে এখন আর কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। অভিযোগ শুধু নিজেরই মনটার বিরুদ্ধে নিশি রায়ের মেয়ের মন আজও, বিয়ের পরেও জয়দেব নামে এই মানুষটাকে ভালবাসতে পারলো না; কি ভয়ানক হিংস্র হয়ে আর সত্য হয়ে আজও জেগে আছে এণাক্ষীর পুরনো প্রতিজ্ঞাটা।

সে দিনটা কাটতেই চায় না, যেদিন হিমানী কিংবা নন্দিতা আসে না। শুধু চুপ করে ঘরের ভিতরে বসে থেকে, কিংবা বাগানের আশে-পাশে সামান্য একটু বেড়িয়ে সময়টা শুধু পার হয়ে যায়: সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল আর বিকেল থেকে সন্ধ্যা; কিন্তু মনে হয় দিনটা যেন ব্যর্থ হয়ে গেল। এমন সন্দেহও হয়, জীবনের দিনগুলিকে শুধু কোন মতে নষ্ট করে দেবার জন্যই বেঁচে আছে প্রাণটা, এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। মাঝে মাঝে ভাবতে গিয়ে একটু আশ্চর্য না হয়েও পারে না এণাক্ষী, এই রকম একটা জীবনই যে চেয়েছিল এণাক্ষী। তবে আজ মনটা রাগ করে ছটফট করে কেন? কার উপর রাগ? জীবনের দিনগুলি যদি বাসি মালার ফুলের মত শুধু ঝরে পড়ে যেতে

থাকে তবে যাক না কেন? আপত্তি কিসের? দুঃসহ-ই বা মনে হবে কেন?

একটা অদ্ভুত সত্যও আবিষ্কার করেছে এণাক্ষী। নন্দিতা কিংবা হিমনী যেদিন আসে না, সেদিন সারা দিন ধরে বোবা হয়ে বসে থেকে কিংবা বাগানের আশে-পাশে ঘুরে বেড়িয়েও যেন একটা ভয়ের ছোঁয়া থেকে ছাড়া পায় না এণাক্ষীর মন। একলা হয়ে থাকতে ভয় করছে। যেন ভয় পাচ্ছে এণাক্ষীর এই শরীরটাই।

নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি যেন এণাক্ষীর মনের ভিতরে গুনগুন করে একটা বিশ্রী কঠিন সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে, শত চেষ্টা করলেও হিমানী আর নন্দিতা হয়ে যেতে পারা যাবে না। সে মন আর ফিরে পাওয়া যাবে না, যে মন শুধু রঙীন পুতুলকে ভালবেসে সুখী হয়ে যায়। চেষ্টা করলেও ভুলে থাকতে পারা যাবে না যে, এই বাড়ীটা জয়দেবের বাড়ী, আর, সেই বাড়িতে জয়দেবের স্ত্রী সেজে জীবনের দিনগুলিকে পার করে দিতে হবে, মনটা জয়দেবের স্ত্রী হোক বা না হোক।

নন্দিতা আর হিমানীর সঙ্গে রঙীন পুতুলের ভাল-মন্দ আর রূপ-কুরূপ নিয়ে তর্ক করা, হাসাহাসি করা আর ঝগড়া করা নিশি রায়ের মেয়ের জীবনের একটা করুণ নেশা মাত্র; কিছুক্ষণের মত জীবনের সামনের আর চার পাশের বাস্তব সত্যটাকে ভুলে থাকা। কিন্তু, তার পরেই যে মনে পড়ে যায়। বড় বিশ্রীভাবে অস্বস্তি দিয়ে আর মাঝে-মাঝে বুকের ভিতরটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ এক-একটা উদ্দেশ্য আর কৌতূহল দুরন্ত হয়ে ওঠে; ভদ্রলোক কি এতক্ষণে চা খেয়েছে? বাড়িতে আছে তো, না খাদ দেখতে বেরিয়ে গেছে? আজ এখনও গাড়ির শব্দ শোনা গেল না কেন? ফিরতে এত দেরি করারই বা মানে কি?

তাই মাঝে মাঝে চাকর গিরিধরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, তোমার বাবু খাদ থেকে কখন বাড়িতে ফেরে।

গিরিধর—কভি সন্ধ্যাবেলা, কভি রাত হয়ে যায়।

এণাক্ষী—রাত হয়ে যায় কেন?

গিরিধর—যেদিন বেশি কাজ থাকে, সেদিন রাত একটা ভি হোয়ে যায়।

—খাদ থেকে আর কোথায় যান তোমার বাবু?

—সে তো আমি বলতে পারে না মাইজী।

—ক্লাবে যান?

—নেহি তো।

—কারও বাড়িতে?

—হ্যাঁ, ওকীলবাবুর বাড়ীতে কভি কভি যান।

—কেন!

—মামলার কাজ থাকে।

—উকীলবাবুর নাম কি?

—চৈতন্যবাবু।

—চৈতন্যবাবুর বাড়িতে আর কে আছে?

—সে আমি জানি না মাইজী।

নিজের বাচালতার রকম দেখে হঠাৎ চুপ হয়ে যায় এণাক্ষী। ভয় পায়, একটু লজ্জাও পায় বোধ হয়। চাকর গিরিধরকে জেরা করে কোন্ নতুন সত্য জানতে চাইছে এণাক্ষী, নিজেকে প্রশ্ন করেও ঠিক বুঝতে পারে না। জয়দেব, গিরিডির এই মাইকা মার্চেন্ট ভদ্রলোক সত্যিই একটি কঠিন রহস্য, একটু বেশি অহংকারী রহস্য। ভদ্রলোকের জীবনে যেন কোন ভুলই নেই; শুধু যত ভুল করেছে নিশি রায়ের মেয়ে। পরম শান্ত আনন্দে, নির্বিকার অহংকারে সুখী একটি প্রাণ শুধু অভ্রের কারবার করে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু বেশ তো বিকার দেখা দিয়েছে, যখন জ্বর হয়েছিল এণাক্ষীর। মাঝ রাতেও জেগে বসে থেকে আর উৎকর্ণ হয়ে বাথরুমের ভেতরে এণাক্ষীর বমির শব্দ শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। খুব তো মায়া দেখিয়েছিল ভদ্রলোক; ডাক্তার আর নার্স হাজির করতে দেরি করে নি। কিন্তু কই? তার পর থেকে যে আবার নির্বিকার হয়ে গিয়েছেন। তার মানে, এণাক্ষীর গা পুড়িয়ে দিয়ে, আর মাথার ভেতরটা যন্ত্রণায় জ্বালিয়ে দিয়ে আবার কোন জ্বর দেখা না দিলে ভদ্রলোক আর উদ্বিগ্ন হবে না। এই ক'মাসের মধ্যে একটি দিনও, এণাক্ষীকে দেখতে পেয়েও কথা বলে নি জয়দেব। এণাক্ষী বাগানের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ দৃশ্য দেখেও ভদ্রলোক আশ্চর্য হয় নি, এগিয়ে এসে এণাক্ষীর কাছে দাঁড়ায় নি। স্বামী সেজে থাকবার নিয়মটুকুও জানে না ভদ্রলোক; বোধহয় সেটুকুরও জন্যে কোন আগ্রহ নেই ভদ্রলোকের মনে।

কিন্তু বেশ তো খোঁচা দিয়ে কথা বলতে জানেন; বেশ জোর গলায় এমন কথা বলে দিতে পারেন, যে-কথা শুনে এণাক্ষীর মুখরতা জব্দ হয়ে যায়। সে সময়ের নির্বিকার দৃষ্টির সেই চোখ দুটোও তো বেশ দপ্ দপ্ করে কেঁপে উঠতে পারে।

রান্নার জন্য যেদিন নতুন একটা ঠাকুর এল, সেদিন জানতে পেল এণাক্ষী এই তিন দিন পুরনো ঠাকুরটা ছিল না।

—কি গিরিধর ? এই তিন দিন তবে রান্নাবান্নার কাজ করলো কে ?

—বাবুজী করেছেন।

—কি বললে ?

—হ্যাঁ মাইজী, সব রান্না বাবুজী করেছেন ; আমি শুধু চা বানিয়েছি।

—তুমি একটি গবেট ; ভ্রূকুটি করে গিরিধরের দিকে তাকিয়ে থাকে এণাক্ষী।

গিরিধর যেন আরও প্রসন্ন হয়ে বলে—বাবুজী বড় ভাল রাঁধতে পারেন, মাইজী !

এণাক্ষী—তা তো পারবেনই ; অনেকদিনের অভ্যাস বোধহয়।

গিরিধর—ঠিক কথা। আমি তো সব জানে।

—কি জান তুমি ?

—বহুৎ দিন আগে, বাবু যখন জঙ্গলে খাদের কাছে লকড়িকা ঝোঁপড়ির ভিতরে থাকতেন, আমি তো তখনই বাবুর চাকর ছিলাম। বাবু রোজ নিজের হাতে ডাল ভাত আর আলুর তরকারী বানাতেন। বাবুর তখন বড় গরীবি হালত ছিল মাইজী।

—বুঝলাম, বাবু রান্না করতেন, আর তুমি গিলতে।

গিরিধর হাসে—জী হ্যাঁ মাইজী।

গিরিধরের এই প্রসন্নতা যেন এণাক্ষীর জীবনের ওপর একটা কঠোর বিদ্রূপের হাসি। গিরিধরের প্রভুর সেই গরীবি হালত আর নেই, তিনি আজ নাম-করা মাইকা মার্চেন্ট ; লোকে জানে জয়দেববাবুর সংসারে এক নারীও সিঁদুর পরে আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জয়দেবের অদৃষ্টটা আজও যেন সেই লকড়িকা ঝোঁপড়ির ভিতর পড়ে আছে। তিন দিন নিজের হাতে রান্না করেছে মানুষটা ; আর এণাক্ষী সেই রান্নার সুখ দু'বেলা অনায়াসে খেয়েছে।

বুঝতে পারা যায়, জয়দেবের অদৃষ্টের ঘরে গিরিধরেরই মত একটা নির্বোধ মনুষ্যত্ব হয়ে এণাক্ষীও প্রসন্ন মনে মানুষটার রান্না করা ডাল-ভাত গিলেছে। ভদ্রলোকও বোধহয় নির্বিকার মনে এই মেহনত সহ্য করেছেন। বোধহয় মনে করেছেন যে, গিরিধরেরই মত একটা চাকরগোছের প্রাণী হয়ে শুধু স্বার্থের দরকারে নিশি রায়ের মেয়েও সেই ডাল-ভাত প্রসন্নভাবে গিলেছে। ভদ্রলোকের অহংকার এণাক্ষীর জীবনটাকে অপমান করে সুখী হতে চায়। দুঃসহ।

নতুন ঠাকুরকে জানিয়ে দেয় এণাক্ষী—তোমার হাতের রান্না আমি খাব না। তুমি শুধু তোমার বাবুর জন্য রান্না কর।

গিরিধর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে—কেন মাইজী ; আপনি মিছা কেন এত রাগ করছেন ?

এণাক্ষী—না, রাগ নয় ; আমার দু'বেলা ডাল-ভাত আমিই রান্না করে নেব।

পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠে আর মুখ ফিরিয়েই অপ্রস্তুত হয় এণাক্ষী। কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছে জয়দেব।

জয়দেব হাসে—এটা কিন্তু তোমার খুব অন্যায় হচ্ছে।

এণাক্ষী—একটুও অন্যায় হচ্ছে না।

জয়দেব নীরব হয়ে কি-যেন ভাবে। তারপরেই শান্তভাবে বলে—আচ্ছা।

চলে যায় জয়দেব।

জয়দেবের উদারতার অহংকার অন্ধ হয়েছে ; ঠাকুর শুধু রান্না করে বাড়ির প্রভুর জন্য, এণাক্ষীর জন্য নয়। এণাক্ষীর নিজের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দু'বেলা ডাল-ভাত সেদ্ধ করে নেবার কাজটাকে নিজের হাতেই যেন একটা অভিমানের ব্রতের মত পালন করে যায় এণাক্ষী। যেন নিজেকে তুচ্ছ করে আর কাউকে তুচ্ছ করবার ব্রত। সত্যিই, ভদ্রলোকের যদি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু থেকে থাকে, তবে এইবার মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছে, তার উদারতার প্রসাদ পেয়ে সুখী হবার জন্য নিশি রায়ের মেয়ে এখানে আসে নি।

কিন্তু, এই সময়ে, বাইরের ঘরে এত খুশির স্বরে কার সঙ্গে কথা বলছেন ভদ্রলোক ? এখন যে খাদের কাজে বের হয়ে যাবার সময়। ভদ্রলোকও প্রায় আধ ঘণ্টা আগে খাওয়া-দাওয়া সেরেছেন। কাগজ পত্রের ফাইলটা হাতে নিয়ে গিরিধর গ্যারেজের দিকে চলে গিয়েছে, কিছুক্ষণ আগে এ দৃশ্যও চোখে পড়েছে এণাক্ষীর। বারোটা বেজে গিয়েছে।

—বাইরের ঘরে কার সঙ্গে তোমাদের বাবু এত কথা বলছে, ঠাকুর ?

ঠাকুর বলে—চিনি না মাইজী, এক বাবু এসেছেন।

কিন্তু চমকে ওঠে এণাক্ষীর চোখ দুটো, কারণ এণাক্ষীর কান দুটোই যেন একটা চেনা কণ্ঠস্বরের রব শুনতে পেয়ে শিউরে উঠেছে। অদ্ভুত···কী ভয়ানক স্পর্ধা···সত্যিই কি এত দুঃসাহস মানুষের পক্ষে সম্ভব ! ভাবতে গিয়ে এণাক্ষীর চোখের তারা দুটো যেন তপ্ত হয়ে জ্বলতে থাকে।

ভুল সন্দেহ নয় তো ? ভুল হলেই ভাল। তা না হলে, এণাক্ষীর প্রাণটা আজ কাউকে ক্ষমা করবে না ; নিজেকেও না। তা না হলে, কিচেনের ভিতর থেকে জ্বলন্ত স্টোভটাকে এখনি নিজের ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে, আর ঘরের

দরজা বন্ধ করে, এই রঙিন শাড়ির আঁচল লুটিয়ে দিয়ে আগুনের জ্বালা বরণ করে নিয়ে এই অভিশাপের জীবনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে। যাবার আগে স্পষ্ট করে লিখে যাবে এণাক্ষী. আমার এই মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী, তুমি জয়দেব। তা না হলে তুমি আজ পরমেশের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললে কেন? নিশি রায়ের মেয়ের সম্মান তোমার কাছে যখন একটা ঠাট্টার আর অপমানের সামগ্রী মাত্র, তখন···।

স্তব্ধ হয়ে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় এণাক্ষী, চেঁচিয়ে কথা বলছে পরমেশ আর বেশ শান্তস্বরে যেন অতি বিনীত অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে উত্তর দিচ্ছে জয়দেব।

এণাক্ষীর জীবনের অতীত থেকে আগত একটা অপচ্ছায়াকে এত সমাদর করে মাইকা মার্চেণ্ট ভদ্রলোক যেন পৃথিবীর কাছে স্বীকার করে নিচ্ছেন, নিশি রায়ের মেয়ে তাঁর জীবনের কোন মানুষ নয়। পরমেশকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে একটুও বিরক্তি, একটুও ঈর্ষা, একটুও ঘৃণা কিংবা হিংসাও ভদ্রলোকের মনের শান্তি নষ্ট করতে পারছে না।

পরমেশ হেসে বলছে—আমার নাম করে এণাক্ষীকে একটা খবর দিন।

জয়দেবও হাসে : ভেতরে যান ; আপনি তো অপরিচিত কেউ নন।

—না অপরিচিত কেন হব? শুধু যে কুটুম্বিতার সম্পর্ক, তা নয়। এমন একদিন ছিল, যখন এণাক্ষীদের হাজারিবাগের বাড়ীর সেই বাইরের ঘরটিতে একবার·····।

জয়দেব—হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।

—আপনি? আপনি কবে দেখলেন?

—আমিও প্রায়ই নিশিবাবুর কাছে যেতাম।

—তাই বলুন! কিন্তু আমি আপনাকে সেখানে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যাই হোক্···এণাক্ষীকে একবার খবর দিন, সেই পরমেশ এসেছে।

জয়দেব—আপনি নিজেই ভেতরে গিয়ে দেখা করলে ভাল করতেন।

পরমেশ—কেন বলুন তো? আপনি এখানে আছেন বলেই কি এণাক্ষী এখানে আসতে রাজি হবে না?

জয়দেব—তা জানি না।

পরমেশ হাসে—আপনি জানেন না, এটা কেমন কথা হলো? অবশ্য এটা খুবই সত্যি যে···।

জয়দেব—কি?

পরমেশ—সত্যিই ভাবতে একটু আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। এণাক্ষী শেষ পর্যন্ত …এরকম একটি আর্টিস্ট মানুষ হয়েও… এত শিক্ষিত রুচি আর মন থাকতেও এখানে যে কেমন করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারছে—সত্যিই একবার জানতে ইচ্ছে করছে।

জয়দেবও হাসে—বেশ তো জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন।

পরমেশ—আপনি বোধহয় শুধু কাজ-কারবারই ভালবাসেন।

জয়দেব—হ্যাঁ।

পরমেশ—লেখাপড়ার দিকে বোধহয় ।

জয়দেব—ওদিকে এগুবার সৌভাগ্য হয় নি।

পরমেশ—এরকমের অবস্থাও এক ধরনের সুখের অবস্থা। গল্প আছে, একদিন এক মিশনারি ওয়েলসের কয়লাখনির মজুরদের কাছে ক্রাইস্টের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করছিলেন। একজন মজুর জিজ্ঞাসা করলো ক্রাইস্ট? তার নম্বর কি?

উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে ওঠে পরমেশ।—বলতেই হবে, ওয়েলসের কয়লাখাদের মজুর বেচারার এই নিরেট মন এক ধরনের সুখী মন। আপনি মশায় বেশ ভালই আছেন বলে মনে হচ্ছে!

জয়দেব হাসে—ভালই আছি।

পরমেশ—যাই হোক, এণাক্ষীকে একটা খবর দিন।

এণাক্ষীর মনে হয়, জলন্ত স্টোভের আগুন যেন রঙীন শাড়ীর আঁচল ছেড়ে দিয়ে এইবার এণাক্ষীর কপালটার উপর লকলকে হিংস্রতার জ্বালা নিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। নিশি রায়ের মেয়ের সিঁথির সিঁদুরের রেখাটাকে পুড়িয়ে দেবার জন্য পুরনো একটা অভিশাপ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাসছে আর কথা বলছে।

চমকে ওঠে এণাক্ষী। সত্যিই, পরমেশের আদেশ মেনে নিয়ে এণাক্ষীর খবর দিতে এসেছে জয়দেব। চোখের তারা সুস্থির করে জয়দেবের মুখের দিকে তাকায় এণাক্ষী।—কি বলতে এসেছ তুমি?

চমকে ওঠে জয়দেব: বিব্রতভাবে বলে—পরমেশবাবু এসেছেন।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—কেন?

—তা জানি না।

—কেন জান না?

—কি বললে ?

—জান না যখন, তখন কেন আমাকে একথা বলতে এসেছ ?

—পরমেশবাবু তোমার পরিচিত মানুষ. ভদ্রলোক যখন নিজেই বলছেন যে, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান ; তখন ·।

—তখন আমার দেখা করাই উচিত, এই তো ?

—আমি কিছু বলছি না ; আমার কিছু বলবার নেই, আমি ভদ্রলোকের অনুরোধ শুধু তোমাকে জানিয়ে দিতে এসেছি।

—মানুষ হলে একথা বলতে পারতে না ?

—কি ? ভ্রূকুটি করে জয়দেব।

—বলছি, যদি মানুষ হতে তবে ঐ পরমেশবাবুকে চেয়ারে বসতে না বলে তখনই ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতে।

জয়দেব আশ্চর্য হয়ে এণাক্ষীর এই অদ্ভুত মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এণাক্ষী বলে—আমাকেও নিশ্চয় একটা মানুষ বলে মনে করতে পার নি ; তা না হলে···।

জয়দেব - তুমি ভুল বুঝেছ। ·

এণাক্ষী—না, একটুও ভুল বুঝি নি। নিশি রায়ের মেয়েকে শুধু অপমান করে পুড়িয়ে মারবার জন্যে তুমি তাকে বিয়ে করেছ।

জয়দেব—নিতান্ত মিথ্যে কথা।

এণাক্ষীর চোখের তারা দুটো আর একবার ছটফটিয়ে উঠেই যেন অলস হয়ে যায়। জলভরা চোখ দুটোকে দু'হাতে ঢাকা দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে এণাক্ষী। ছি ছি, পরমেশের মত একটা লোক গর্ব করে হেসে হেসে তোমাকে অপমান করলো, তুমি কেমন করে সে অপমান সহ্য করলে ? আমার অপমান সহ্য করতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান যে সহ্য হয় না।

—এ কি করছো এণা ? ছিঃ চুপ কর ; শান্ত হও ; যাও, তুমি তোমার ঘরের ভিতর গিয়ে বসো।

—না, আগে তুমি ভদ্রলোককে স্পষ্ট করে এখনি চলে যেতে বলে দিয়ে এস।

—আচ্ছা, বলে দেব।

—না, আমি এখানে দাঁড়িয়ে শুনবো, তুমি স্পষ্ট করে ভদ্রলোককে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়েছ।

চলে যায় জয়দেব।

শুনতে পায় এণাক্ষী, জয়দেবের গলার স্বর যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তিভরা

অহংকারের আবেশে নিবিড় হয়ে আর গম্ভীর হয়ে কথা বলছে।—আপনি চলে যান পরমেশবাবু।

পরমেশ্—কেন ?

—এণাক্ষী আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।

—কেন ?

—দেখা করবার ইচ্ছা নেই।

বাইরের ঘরে স্তব্ধতার মধ্যে একটা চেয়ারের পায়ার শব্দে হঠাৎ চমকে উঠেই আবার নীরব হয়ে যায়। কোন কথা না বলে, চেয়ার ছেড়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যায় পরমেশ।

জেঠিমা লিখেছেন, হাজারিবাগ থেকে গিরিডি কতই বা দূর আর নিজেদের গাড়িতে এলে ক'ঘণ্টারই বা পথ, কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে মনে হয় যে তুমি যেন সাত সমুদ্দুরের ওপারে আছ। বিয়ের পর প্রায় একটা বছর পার হয়ে গেল, তবু তুমি একবার এখানে আসতেই পারলে না।

জেঠিমার চিঠির উত্তরে জানিয়ে দেয় এণাক্ষী, এখন যে সত্যিই যেতে পারছি না জেঠিমা। যাওয়া সম্ভবই নয়। বাবা যেন কিছু না মনে করেন। সে আবার খাদের কাজে যেতে উঠেছে। সব সময় আতঙ্ক, ভগবান না করেন, কে জানে কখন কোন দুর্ঘটনা হয়ে যায়! এই সময় ওকে একা রেখে আমার হাজারিবাগ যাওয়া ভাল দেখায় না জেঠিমা, যাওয়া উচিতও নয়। তবে ...দেখি, বড়দিনের সময় নিশ্চয়ই যেতে চেষ্টা করবো।

জয়দেবের গিরিডির বাড়ির ভিতর-বাহির দুই-ই বদলে গিয়েছে। বাড়ির সামনের ফুলবাগানের সেই জঙ্গলা চেহারা মরে গিয়েছে; ফুটে উঠেছে পরিচ্ছন্ন ফুলেলা চেহারাটা। বাড়িটা নতুন চুনকাম হয়ে ধবধব করে। গেটের কাছে লাল কাঁকরের উপরে এক টুকরো ছেঁড়া কাগজও পড়ে থাকতে পারে না। মালী আর ঝাড়ুদার মেথর এবাড়ির মাইজীর হুকুম খেটে খেটে হয়রান।

ভিতরটা আরও বেশি বদলে গিয়েছে, গিরিধর আর চা তৈরী করে না, জয়দেবের ঘরে চা পৌঁছে দেবার কোন দায়ও আর গিরিধরের উপরে নেই। সে দায় এণাক্ষীর।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের ছবি দেখবার আগে এণাক্ষী এখন তার সিঁথির ছবিটাকেই আগে দেখতে পায়, এণাক্ষীর উদাস চেহারাটাকেই রঙান করে দিয়েছে যে সিঁথির রঙীনতা।

বালিশের তলায় যেটা লুকিয়ে পড়ে থাকতো, এণাক্ষীর গলায় যে সোনার

হার সেটা এখন সারাক্ষণ এণাক্ষীর গলাতেই দোলে। অনাদিবাবুর স্ত্রীকে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিল এণাক্ষী। তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে অনাদিবাবুর স্ত্রীও এসেছিলেন। শুধু লুচি পায়েস খাইয়ে নয়, তিনটে বড় বড় গোলাপের তোড়া তিন মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে হেসে ফেলেছে এণাক্ষী।—ওকে বলেছিলাম; বলামাত্র লোক পাঠিয়ে জগদীশপুরের বাগান থেকে আপনার মেয়েদের জন্যে এই গোলাপ আনিয়ে দিয়েছে। আরও যদি দরকার হয়, তবে বলবেন।

মাঝে মাঝে রাত জেগে পাহারা দেবার মত একটা কাণ্ড এণাক্ষীও করে। মাঝরাতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, কিংবা নিজেই ঘুমটাকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তবে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে জয়দেবের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় এণাক্ষী।—ও কি? ভ্রূকুটি করে আর প্রায় ধমক দিয়েই প্রশ্ন করে এণাক্ষী—এত রাত পর্যন্ত কি এত লেখালেখির কাজ করছো?

—ইনকাম ট্যাক্সের জরুরি চিঠি। এখনই লিখে না রাখলে কাল আর সময় করে উঠতে পারবো না।

—কেন?

—কাল সারাদিন ফ্যাক্টরীতে থাকতে হবে। প্যাকিং শুরু হবে। জার্মানীর একটা অর্ডারের মাল-তিন দিনের মধ্যেই কলকাতায় রওনা না করিয়ে দিলে জাহাজ ধরতে পারবে না।

—তবে কি ফ্যাক্টরীতেই দুপুরের খাবার পাঠাতে হবে?

—হ্যাঁ। বাড়ি আসা সম্ভব হবে না।

—কি খাবার পাঠাবো?

—ভাত-টাত নয়। যা ভাল বোঝ পাঠিয়ে দিও।

—কিন্তু তুমি এখন……।

—এই আর বড় জোর দশ মিনিট।

ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিলেও ঘরটা অন্ধকারে ভরে যায় না, খোলা জানালা দিয়ে আকাশের টুকরো চাঁদের আলো আয়নার বুকের উপর পড়ে সারা ঘরটাকে যেন মায়া-আলোকে ভরে দেয়; এমন ঘটনাও প্রতিমাসে একবার না একবার হয়েই আসছে।

তখন আর এণাক্ষীর চোখে ঘুম আসে না। যে চোখ দুটো আগে দিনের পর দিন বাগানের গাছ আর গাছের ছায়ার যত রোদে-পোড়া যন্ত্রণা, বৃষ্টির জলে ভেজা আর্ততা, ঝড়-লাগা হুতাশ আর হিমেল হাওয়াতে পাতা ঝরে পড়া রিক্ততার কাঁপুনি দেখে দেখে ক্লান্ত হয়েছে, সেই চোখ দুটোই এখন মাঝে মাঝে

রাতের গাছের জ্যোৎস্না-স্নান দেখে দেখে প্রায় ভোর করে দিয়েও ক্লান্ত হয় না।

এই সময়ে এণাক্ষীর মনটাও যেন নীরবে হেসে-কেঁদে নিশি রায়ের মেয়ের জীবনের যত লাভক্ষতির হিসেব নিতে চেষ্টা করে। যত অদ্ভুত রকমের লাভ আর যত অদ্ভুত রকমের ক্ষতি দিয়ে তৈরী করা যত সুখ দুঃখ আর শান্তি-অশান্তিও একটা নাটুকে জীবন। যাকে চরম লাভ বলে মনে হলো, তাকে দু'দিনের হাসি হেসে ফুরিয়ে দেওয়া হলো। যাকে চরম ক্ষতি বলে মনে হলো, তাকে দু'দিনের কাঁদা কেঁদে ফুরিয়ে দেওয়া হলো। যে চোখ দুটোকে একটা ভীরু লোভের চোরাদৃষ্টির চোখ বলে মনে হলো, তার ফটোটারও দিকে তাকিয়ে এখন চেনা যায়, সে দুটো চোখ যেন বেপরোয়া সাহসের আর শান্ত প্রতিজ্ঞার দুটি চোখ। যাকে ঘৃণা বলে মনে হয়েছিল, আজ যে তারই চোখের সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে।

বাবার কাছে অনেক রকম আবোল-তাবোল কথা নিয়ে আবার মস্ত বড় একটা চিঠি লেখেছে এণাক্ষী। চিঠির সেইসব আবোল-তাবোল নানাকথা যেন এণাক্ষীর আবোল-তাবোল জীবনের একটা লজ্জার স্বীকৃতি আর একটা মার্জনার দাবি। আজ আর বুঝতে কি কিছু বাকি আছে, কেন এই বিয়ের জন্যে এত জেদ করেছিলেন বাবা? এই বিয়ে হওয়া উচিত, না হলে ক্ষতি হবে, বাবার সেদিনের সেই উপলব্ধির সত্যটাকে কটুকথা শুনিয়ে দিয়ে দুঃখ এণাক্ষীর যে সন্দেহের মন, আজ সেই মনটা যে সত্যিই নিজের লজ্জার বিষ খেয়ে মরে গিয়েছে। এ বিয়ে আরও আগে হলেই ভালো হতো, একথা সেদিন যারা বলেছিল, তাদের ধারণার কাছে আজ যেন ক্ষমা চাইবার জন্য এণাক্ষীর প্রাণটা ছটফট করে ওঠে। জয়দেবের সঙ্গে পাঁচ বছর আগেই বিয়ে হয়ে যেত, তবে এণাক্ষীর জীবনটাকে বার বার শান্তির সর্বনাশ সহ্য করতে হতো না।

এই মানুষটির ভালবাসার রকমটিও অদ্ভুত বলতে হয়। কোন বাধা না দিয়ে আর দূরে দাঁড়িয়ে শুধু যেন অপেক্ষা করেছে জয়দেবের ভালবাসা, নিশি রায়ের মেয়ে যাকে ইচ্ছে হয় তাকে আর যতখানি পারে ততখানি ভালবেসে নিক। যেদিন সব হারিয়ে ঠকে গিয়ে আর শূন্য হয়ে, মনে-প্রাণে ও চেহারায় বিধবা হয়ে গেল নিশি রায়ের মেয়ে, সেদিনও জয়দেবের ভালবাসা সুযোগ পাওয়া লোভীর মত কোন আশা নিয়ে এগিয়ে আসে নি। নিশি রায়ের মেয়ের ভালবাসা দাবি করে নি, চায়ও নি, জয়দেব। জয়দেবের ভালবাসা শুধু এণাক্ষীকে একটা মিথ্যে দুর্নামের আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এণাক্ষীর ঘৃণাকেই চরম বরপণ বলে মেনে নিয়ে এণাক্ষীকে বিয়ে করেছে। ভালবাসাকে এত বেশি মহৎ

করে তোলবার কোন দরকার ছিল না। এ ভদ্রলোকের জীবনটা যেন ভয়ংকর একটা নাটুকেপনার জীবন ; এতদিন ধরে ভালবাসাকেও এতটা আশাছাড়া করে থাকতে পারে মানুষ ?

রাতের আকাশের এই টুকরো চাঁদের জ্যোৎস্নাকে একটা আশীর্বাদ বলে মনে হয়, সব অশান্তির জ্বালা পার হয়ে এণাক্ষীর প্রাণটা এতদিনে একটা শান্ত শীতল ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে।

আর জয়দেবের ভালবাসার কঠোর প্রতীক্ষার ক্লেশও যে শান্ত হয়ে গিয়েছে, তাও আজ আর চেষ্টা করে বুঝতে হয় না। এণাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে জয়দেবের চোখ যেভাবে হেসে হেসে ঝকঝক করে, তাতে আর কি বুঝতে বাকি থাকে যে, জয়দেবের মনটাই ভোরের আলো লুটিয়ে পড়া দীঘির বুকের মত তৃপ্তির সুখে ঝকঝক করছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে এণাক্ষী। মুখ ফিরিয়ে তাকায়, হ্যাঁ ঠিকই তো, এণাক্ষীর ঘরের খোলা দরজার কাছে যেন একটা উদ্বিগ্ন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে জয়দেব।

জয়দেব বলে—যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই।

এণাক্ষী—কি বললে ?

জয়দেব—এখনও শুয়ে পড় নি কেন ? মিছিমিছি রাত জেগে আবার কি একটা মাথার যন্ত্রণা তৈরী করবার চেষ্টা করছো ?

হেসে ফেলে এণাক্ষী। জানালার কাছ থেকে সরে গিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসে।

বারান্দার আলোটা এণাক্ষীর মুখের উপর পড়েছে। তাই জয়দেবের দেখতে আর কোন অসুবিধে নেই, এণাক্ষীর চোখ দুটো কত স্নিগ্ধ হয়ে আর কত খুশি হয়ে জয়দেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

জয়দেব বলে—আশ্চর্য !

এণাক্ষী—আশ্চর্যের কি দেখলে ?

জয়দেব—আশ্চর্যের বই কি।

এণাক্ষী—কি ?

জয়দেব—তুমি শেষ পর্যন্ত সত্যিই যে আমাকে ভালবাসতে পারলে এণা ! এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে ?

এণাক্ষী—না ভালবাসতে পারলে যে পাপ হতো। কথাটা হেসে হেসে বলতে গিয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে এণাক্ষী। দু'চোখ থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটাও

ঝরে পড়ে।

জয়দেবের মুখটা করুণ হয়ে যায়—ছিঃ, একি করছো এণা ?

নিবিড় সান্ত্বনার স্বরে কথা বলে জয়দেব। এণাক্ষীর হেঁট-মাথার উপর আরও নিবিড় সান্ত্বনার ছোঁয়া বুলিয়ে দেবার জন্য জয়দেবের হাতটা তুলে ওঠে। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে এণাক্ষী, হঠাৎ চমকে উঠেছে একটা আনমনা সতর্কতা। ব্যস্তভাবে দু'পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ায়। এণাক্ষীর স্নিগ্ধ চোখের মধ্যে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া।

জয়দেব আশ্চর্য হয়ে বলে—কি হলো এণা ?

—কিছু নয়।

—কিন্তু সত্যিই যে কিছু বলে মনে হচ্ছে।

নীরব হয়ে যায় এণাক্ষী। সে নীরবতা যেন জয়দেবের মুখটাকে আরও করুণ করে দেয়।

জয়দেব বলে—কথা বলছো না কেন এণা ? আমাকে তো চিনেছ, আমি কোন দাবির মানুষ নই। আমাকে কোন কথা বলতে তোমার পক্ষে কোন ভয় করবার কিছু নেই।

—আমি তোমাকে ছুঁতে পারবো না ; ইচ্ছা থাকলেও পারবো না।

—কেন ?

—বলতে পারি ; কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে বল।

—নিশ্চয় বিশ্বাস করবো।

—তোমাকে ছুঁলে আমার ক্ষতি হবে।

—কেন।

—আমার ছোঁয়া হলো একটা সর্বনেশে অপয়া ছোঁয়া।

—এ ধারণা তোমার কেন হলো ?

—জীবন দিয়ে ভুগে আর শিখে এ ধারণা হয়েছে।

—কিন্তু ।

—আর আমাকে কিছু বলতে বলো না।

—আচ্ছা।

যেন আরও একটা ভয়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছে, তাই উতলা হয়ে কেঁদে ফেলে এণাক্ষী।—কিন্তু তুমি আমাকে একটি কথা দাও।

—বল।

—আমাকে যেন এমন অভিশাপের কথা শুনতে না হয় যে, তুমি আর

কাউকে·····।

—ছিঃ, এ ভয় যদি তোমার মনে এখনও থেকে থাকে, তবে বুঝবো তুমি আমাকে চিনতে পার নি।

আবার নীরব হয়ে যায় এণাক্ষী। এই নীরবতা যেন একটা নির্ভয় স্বস্তিময় নীরবতা। চোখ মুছে নিয়েই জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে এণাক্ষী।

জয়দেব বলে—এবার শুয়ে পড়।

এণাক্ষীর জীবনকে ভাবিয়ে তোলবার আর ভয় পাইয়ে দেবার মত আর কোন ঘটনা নেই; এমন ঘটনা আর সম্ভবই নয়। নিজের মনের মত স্নেহময় শাসন দিয়ে সুখী করে নেওয়া একটা নিরাপদ জীবন পেয়ে গিয়েছে এণাক্ষী। ভালবাসা আছে, ভালবাসার ঘরও আছে, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় নেই। এণাক্ষীর ইচ্ছার আর চেষ্টার সৃষ্টি এই ভালবাসার ঘরের সত্য কথাটা যদি কেউ সত্যিই শুনতেও পায়, তবু কি সে বিশ্বাস করতে পারবে? পারবে না। বরং সন্দেহ করবে যে, নিশি রায়ের বিধবা মেয়ে তার সুখের সধবাপনার সত্যটাকে স্বীকার করবার লজ্জায় দেহহীন ভালবাসার একটা মিথ্যে গল্প তৈরী করছে।

চাকর গিরিধরের মুখে ওর মূর্খ আনন্দের অদ্ভুত একটা কথা শুনতে পেয়ে এণাক্ষীর হাসিভরা মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়; রাগও হয়। চাকরটার বাজে ধারণার আনন্দটাকে ধমক দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে ইচ্ছা করে।

গিরিধর বলছিল—আপনার অসুখ এখন তো ভাল হয়ে গিয়েছে মাইজী, তবে যান না কেন, একবার উশ্রী দেখিয়ে আসুন; না হয় তো মহেশমুণ্ডা পাহাড়ে চলিয়ে যান। শিখরজী পরেশনাথ ভি আছে; পাহাড়ের উপরের মন্দির দেখিয়ে আসুন। আর, একদিন বাবুর সাথে জগদীশপুর চলিয়ে যান; গোলাপ বাগিচার হাওয়া আপনার মন খুশি করে দিবে।

এণাক্ষীর সেই বিষণ্ণতার আর গভীরতার জীবন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এণাক্ষীর মুখে সব সময় তৃপ্তিময় একটা হাসি ফুটে থাকে। তাই দেখে বোধহয় সন্দেহ করছে গিরিধর; এতদিন ধরে মাইজী একটা কঠিন অসুখে ভুগছিল।

কিন্তু সে-জন্যে রাগ নয়; গিরিধরের এই ধারণাটা নিতান্ত মিথ্যা ধারণাও নয়। ঠিকই তো, এতদিন ধরে এণাক্ষীর মন অন্ধেরই মত একটা ভুলের কাণ্ড করেছে। জয়দেবের মত মানুষের ভালবাসাকে এত কাছে পেয়েও দেখতে পায় নি! এমন কি, মনটা নিজেকেও দেখতে পায় নি। বুঝতেও পারে নি যে

জয়দেবকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু মিছিমিছি এই ইচ্ছাটাকেই ভয় পেয়ে পেয়ে দিন আর রাতের ভাবনাগুলিকে শুধু ত্যক্ত ব্যথিত ও ক্লান্ত করেছে এণাক্ষী। কিন্তু সেই মিথ্যা অন্ধকার ভোরের আলোর সাড়া দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে। এণাক্ষীর চোখ আর মুখের হাসিটা সত্যিই যে দেখতে ভোরের আলোর হাসির মত, এই সত্য এণাক্ষীর চোখেও ধরা পড়েছে। সন্ধ্যাবেলায় ঘরের আলো জ্বালিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের ছবিটা চোখে পড়তেই মনে হয়েছে এণাক্ষীর; মুখটা যেন ভোরের আলো দিয়ে স্নিগ্ধ করে মাখানো একটা মুখ। মনে হয় না যে, ওটা ঘরের এই বিদ্যুতের আলো মাখানো একটা মুখ। ছবি আঁকতে গিয়ে কল্পনার কত মুখের উপর রং বুলিয়ে কতবার কত রকমেরই না স্নিগ্ধতা ফুটিয়েছে এণাক্ষী; কিন্তু আজ বুঝতে পারে ছবির কোন মুখের হাসিকে ঠিক এই রকমটি ভোরের আলোর হাসির মত করে কোনদিন ফুটিয়ে তুলতে পারে নি এণাক্ষীর হাতের তুলি। আজ বোধহয় নিশি রায়ের মেয়ের প্রাণটা বাজে রঙের খেলা ছেড়ে দিয়ে সত্যি আর্টিষ্ট হতে পেরেছে।

কিন্তু গিরিধরের কথাগুলি যেন এণাক্ষীর প্রাণের এই তৃপ্তিময় স্নিগ্ধতার একটা গর্বকে মিছিমিছি খোঁচা দিয়েছে। জানে না গিরিধর, বাবুর সঙ্গে, বাবুর পাশে বসে কোন পাহাড় মন্দির আর বাগান দেখতে যাওয়া যে এণাক্ষীর এই জীবনে সম্ভব নয়। শরীরটাকে অপয়া বলে ভয় হয়; হতে পারে এটা এণাক্ষীর মনের একটা কুসংস্কার, কিন্তু এই কুসংস্কারই যে এণাক্ষীর জীবনের একটা শান্তি, একটা গর্ব, একটা গৌরব। আর কতদিন পৃথিবীর আলোছায়ার মধ্যে এভাবে হেসে হেসে বেঁচে থাকতে হবে, কে জানে? কিন্তু যে দিন চলে যেতে হবে, সেদিন নিশি রায়ের মেয়ে এই গর্ব নিয়ে চোখ বন্ধ করতে পারবে যে, এই শরীরটা নিয়তির দাসী হয় নি। স্বামী পেয়েছে, স্বামীর ঘরে থেকেছে; স্বামীকে ভালবেসেছে, স্বামীর ভালবাসা পেয়েছে। কিন্তু সেজন্যে এই শরীরটার দরকার হয় নি।

চাকর গিরিধরের মূর্খ ধারণার উপদ্রব সহ্য করতে গিয়ে একটু গম্ভীর হতে হয়েছিল, এই মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে বই আসে। জয়দেব যখন বাড়িতে থাকে না, তখন বই পড়ে সময় কাটিয়ে দিতে পারা যায়। কিন্তু বইগুলোও যেন যত একঘেয়ে বাচালতার উপদ্রব। সেই একই কথা; সব ঘটনার সেই একই অন্তিম। ভালবাসা হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই একই পরিণাম। ভালবাসার

কাছে দুটি দাসদাসীর মত শরীর দুটিকেও সঁপে দেওয়া। বই-এর এইসব গল্পের মানুষগুলি ভালবাসার প্রভু নয়, ভালবাসাই ওদের প্রভু।

মাঝে মাঝে ছবিও আঁকে এণাক্ষী ; সময়টা ভালই কাটে। দোতলার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের শালবনের দিকে তাকাতে গিয়ে সেদিন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড গণ্ডগোলের শব্দ শুনে চমকে ওঠে এণাক্ষী। হাতের তুলিটাও যেন চমক খেয়ে কেঁপে ওঠে।

রাস্তার উপর হোলির রং খেলার মাতামাতি প্রায় মারামারির মত একটা মত্ততা নিয়ে চিৎকার করছে। বস্তির একদল লোক লাঠি হাতে নিয়ে রাস্তার একটা ভিড়কে আটক করেছে। এই ভিড়টা অন্য পাড়া থেকে এসেছে। ভিড়ের চেহারাটা নানা রং-এর জলে আবীরে আর কাদায় চোবানো একটা বিদ্ঘুটে রঙীনতা।

এই ভিড়টাই একটা অপরাধ করেছে। বস্তির এক বিধবাকে রাস্তার ধারে একলা পেয়ে তার গায়ে রং ছুঁড়েছে এই ভিড়টা। বস্তির পুরুষেরা তাই লাঠি হাতে নিয়ে তেড়ে এসেছে, বিধবার গায়ে হোলির রং ছিটিয়ে দেবার এই দুঃসাহসময় অনাচারকে ওরা পিটিয়ে শায়েস্তা করতে চায়।

সত্যিই অপরাধী ভিড় আর বস্তির পুরুষদের মধ্যে মারামারি বেঁধে যায়। কিন্তু…দেখতে পেয়ে এণাক্ষী আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। সেই বিধবা, যার গায়ে রং ছিটিয়েছে সেই অন্য পাড়ার ভিড়টা, সে কিন্তু চুপ করে একটা দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে আছে আর হাসছে।

কিন্তু দোতলার এই ঘরের দরজার কাছেও যে একটা হুল্লোড়ের শব্দ ! চমকে ওঠে এণাক্ষী। যা সন্দেহ করেছিল এণাক্ষী, তাই বোধহয় সত্য হয়েছে।

হিমানী ও নন্দিতার রং মাখানো মূর্তির সঙ্গে এক অপরিচিতা প্রৌঢ়ার মূর্তিও যেন দুরন্ত উৎসাহে আকুল হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। তিনজনের হাত থেকে সুগন্ধ কুমকুমের পটকার আঘাত এণাক্ষীর গায়ের আর মুখের ওপর ছিটকে পড়তে থাকে। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ প্রৌঢ়া মহিলারই ; হিমানী ও নন্দিতা থামে। কিন্তু মহিলা থামতে চান না। হিমানীই শেষে উদ্বিগ্নভাবে বলে—অনেক হয়েছে, এবার আপনি থামুন মায়াপিসী।

মায়াপিসীকে এই প্রথম দেখতে পেল এণাক্ষী। হিমানী আগেই বলে গিয়েছিল, হোলির দিনে কিন্তু মায়াপিসীর হাত থেকে রক্ষা পাবেন না।

ওভারসিয়ারবাবুর স্ত্রী হলেন এই মায়াপিসী। এণাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়াপিসী চীৎকার করে হাসেন—গত বছর হোলির দিনে আঁতুড়ে ছিলাম, তাই

ফুর্তি করতে পারিনি। কিন্তু এবছর গত বছরের ফাঁকির শোধ তুলবো ভেবেছি।

এণাক্ষী বিড়বিড় করে—শোধ তোলা হয়েছে। এবার বসুন, চা খান।

—তা খাব বৈকি। এমন কিছু তাড়াহুড়ো নেই; কর্তাও বলেছেন, যাও, রঙের পেত্নি হয়ে যত খুশি নেচে এসো। তা ভাই, এমন বেশি কি করেছি? মাত্র দশ বাড়ি গিয়েছিলাম। তা আবার ললিতবাবুর দ্বিতীয় পক্ষটিকে রং দিতেই পারলুম না। ওদের নাকি এখন অশৌচ চলছে।

নন্দিতা বলে—চা খেয়ে কাজ নেই মায়াপিসী; এবার বাড়ি ফেরা যাক্।

মায়াপিসী বিরক্ত হয়ে বলেন—কেন?

নন্দিতা—আপনার পল্টু যে কেঁদে-কেটে···।

কখ্খনো না, পল্টুকে কর্তার কোলে ধরিয়ে দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ গো বউদি, আপনার কটি?

এণাক্ষী গম্ভীর হবার আগেই নন্দিতা আর হিমানী একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ করুন মায়াপিসী, চুপ।

মায়াপিসী—কেন?

—এণা-বউদিকে বিরক্ত করবেন না।

মায়াপিসী—কি গো এণা-বউদি, সত্যিই বিরক্ত হলে নাকি? আমি কিন্তু স্টাইল করে কথা বলতে জানি না। যা বলি, স্পষ্ট করে বলি।

এণাক্ষী—খুব ভাল করেন।

মায়াপিসী খুশি হন।—সেইজন্যেই জিজ্ঞাসা করছি···।

মায়াপিসী—তাই বল। কিন্তু তবু তো বলতে পার কতদূর এগুলে।

এণাক্ষী—আপনারা এখানে বসুন। আমি চা নিয়ে আসি।

মায়াপিসী—সত্যি, বলুন না ভাই।

এণাক্ষী গম্ভীর হয়।—কিছু বলবার নেই।

মায়াপিসী—তা কি করে হয়? মিথ্যে কথা, অসম্ভব।

এণাক্ষী—খুব সম্ভব।

মায়াপিসী—না।

এণাক্ষীর মুখের গম্ভীরতাকে একটুও গ্রাহ্য না ক'রে মায়াপিসী আবার চেঁচিয়ে হাসেন।—এরকম দু'ঘরে দু' বিছানা অনেক বাড়িতেই আছে গো। আমার বাড়িতেও আছে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে···।

চা আনতে চলে যায় এণাক্ষী।

চা আনতে দেরীও করে না এণাক্ষী। মায়পিসীও খুশি হয়ে চা খেয়ে নিয়ে

চলে যান ; কিন্তু চলে যেতে গিয়ে আর একবার চেঁচিয়ে হাসেন।—আসছে বছরের হোলিতে রং দিতে এসে যেন দেখতে পাই··· হ্যাঁ,· ·নয়তো জয়দেবদাকেই একদিন স্পষ্ট করে শুনিয়ে দেব।

এণাক্ষী ভ্রূকুটি করে—কি বললেন ?

মায়াপিসী এইবার ফিসফিস করে হাসেন।—জয়দেবদাই বা এরকম কুঁড়েমি করছেন কেন ?

যে যা-ই ভাবুক, এণাক্ষীর মনের সেই পুরনো প্রতিজ্ঞা আর পুরনো গর্বের তৃপ্তি আজও অটুট আছে। ভালবেসে, ভালবাসার ঘরের মধ্যে থেকে আর মনের মত স্বামীরই কাছ থেকে নিশি রায়ের মেয়ে তার শরীরটাকে আজও বিধবা করে রেখেছে। শরীরটাকে অপয়া বলে মনে করা হয়তো একটা মিথ্যে কুসংস্কার, কিন্তু এই কুসংস্কারই এণাক্ষীর শরীরটাকে যে শুচিতার গৌরব দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটা তো মিথ্যে নয়।

জয়দেব যদি ক্ষুণ্ন হতো, জয়দেবের চোখে যদি সুখের হাসির স্নিগ্ধতা একটুও কমে যেত, তবে না হয় এণাক্ষীর মনের শান্তি, আর এই মনোমত সম্পর্কের সংসার গড়ে নেবার গৌরবটা একটু বিপদে পড়তো। ভাবতে হতো, এণাক্ষী তার জীবনের ইচ্ছা আর আশার হিসাব মিলাতে পারছে না। কিন্তু না, সবই শেষ পর্যন্ত মিলে গিয়েছে। একটুও দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, জয়দেব সুখীই হয়েছে। এণাক্ষীর এই মনোমত ভালবাসার ঘরে জয়দেব যেন এণাক্ষীর এই শুচিতাময় তৃপ্তিটারই বান্ধব। এণাক্ষীর ঘরের দরজার ভেজানো কপাটও হাত দিয়ে ছোঁয় না জয়দেব। বাইরে থেকে ডাক দেয় ; আর এণাক্ষী যখন দরজা খুলে দেয়, তখন ঘরের ভিতরে ঢুকে কথা বলে।

দরজা যদি খোলা থাকে, আর যদি চোখে পড়ে জয়দেবের যে, এণাক্ষী ঘুমিয়ে রয়েছে, তবে আর ঘরে না ঢুকে ফিরেই চলে যায় জয়দেব। যখন জানতে পারে যে, এণাক্ষী জেগেছে, তখন এসে কথা বলে।

কথা হয়েছে, আগামী মাসেই হাজারিবাগে যাবে এণাক্ষী একমাস থেকে আবার চলে আসবে।

এণাক্ষী বলে—একটা মাস আমি এখানে থাকবো না, কিন্তু তুমি একা-একা থাকবে কেমন করে ?

জয়দেব হাসে—থাকবো কোন মতে। এত অপেক্ষা সহ্য করতে পেরেছে যে, সে কি একটা মাসের অপেক্ষা সহ্য করতে পারবে না ?

এণাক্ষী হাসে—কিন্তু এবার আর সহ্য করতে কোন কষ্ট হবে না বোধ হয়।

জয়দেব—হবে, তবে অন্য রকম একটা কষ্ট।

এণাক্ষী—তার মানে?

জয়দেব—কোনদিন যে বাড়িটাকে ফাঁকা মনে হয়নি, সেই বাড়িটাকে একেবারে ফাঁকা মনে হবে।

এণাক্ষী—তাহলে, তুমিও সঙ্গে চল।

জয়দেব—আসছে মাসে গিরিডি ছেড়ে যাওয়া আমার সম্ভব হবে না।

—কেন? খাদের কাজের জন্য?

—না খাদের কাজ নয়। নিতান্ত একটা অখাদের কাজ। কোন হৈ-চৈ নেই, পাথর ফাটানো আওয়াজ নেই, ধোঁয়া ধুলো নেই, ওজন প্যাকিং বুকিং চেকিং নেই, হিসেবের বড়-বড় খাতা নিয়ে লেখা-জোখার ব্যাপারও নেই।

এণাক্ষী হাসে—এমন চমৎকার কাজটি কোথায় কুড়িয়ে পেলে?

—এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূরে, জামুই রোডের উপরে সুন্দর একটা বাংলো বাড়ি আছে, নাম উইলিয়মস্ কটেজ।

—কোন সাহেবের বাড়ি বোধহয়?

—এককালে তাই ছিল, উইলিয়ম নামে এক আর্টিষ্ট সাহেবের বাড়ি; এখন সেটা একটা আশ্রম।

—কার আশ্রম?

—লোকে তাঁকে নাম দিয়েছে মহাশয়জী। ভাল অ্যাডভোকেট ছিলেন, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। অজস্র উপার্জন করেছেন। কলকাতাতে বাড়ি আছে, ছেলেরা আছে, স্ত্রীও আছেন। কিন্তু তিনি সরে এসেছেন।

—সন্ন্যাসী হয়েছেন।

—না। সন্ন্যাসী না হয়েও সরে এসেছেন। গেরুয়া-টেরুয়া তিনি পরেন না। জপতপ ধ্যান ধারণাও করেন না।

—কি করেন তাহলে?

—চার পাঁচ আলমারি ফিলজফির বই আছে। সেই সব বই পড়েন। গাঁয়ের লোককে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেন। ফুলগাছে জল দেন, গান করেন আর গ্রীক ভাষা শেখেন।

—কত বয়স?

—ষাটের কাছাকাছি হবে।

—এই বয়েসে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিয়ে একলা একটা কটেজে পড়ে থেকে…।

—জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মহাশয়জী বললেন, এই বয়সে এর চেয়ে সুখের

জীবন আর কি হতে পারে ?

—বুঝলাম, কিন্তু মহাশয়জীর কটেজে তোমার কি কাজ থাকতে পারে ?

—আমার কাজও কতকটা মহাশয়জীর ইচ্ছার মত কাজ। খাদ আর ফ্যাক্টরীর কাজের হৈ-চৈ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একটু শান্তি পাওয়া। মহাশয়জীর মুখ থেকে শেক্সপীয়রের আবৃত্তি আর ব্যাখ্যা শুনতে ···!

—ও, তাই বুঝি আজকাল সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরতে তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু শেক্সপীয়রের সাধ হলো কবে ? কোনদিন তো শুনি নি যে···।

জয়দেব হাসে—ঠিকই ধরেছ। মহাশয়জীর মুখে শেক্সপীয়র শুনতে বড় চমৎকার লাগে। কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না যে, আমি চিরকালই মাইকা মার্চেণ্ট ছিলাম না।

—কিন্তু কী ছিলে তা তো কোনদিন বল নি।

জয়দেব হাসে—তুমিও তো কোনদিন জিজ্ঞাসা কর নি।

এণাক্ষী গম্ভীর হয়, লজ্জা পাওয়া একটা পুরণো অপরাধের করুণতাও যেন চোখ দুটোকে করুণ করে দেয়। —সেসব কথা তুলে আমাকে জব্দ করতে যদি তোমার ভাল লাগে···

—আমি কলকাতারই একটা কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলাম। নিয়োগীমশাই-এর মুখে ম্যাকবেথ শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু তারপর কোথায় যে চলে গেল পড়াশুনার আনন্দ! কলেজের মাইনে দিতে না পারায় একদিন নাম-কাটা হয়ে তারপর একা জীবনের কতরকম ঝঞ্ঝাটের দিন পার করে দিয়ে শেষে একদিন মাইকা মার্চেণ্টই হয়ে গেলাম।

—বুঝলাম, কিন্তু সেজন্যে আসছে মাসে তোমার একবার হাজারিবাগ যেতে···।

—মহাশয়জীকে কথা দিয়েছি, আসছে মাস থেকে তাঁর কাছে একবার সন্ধ্যাতে গিয়ে পড়বো।

—না! বেশ বিরক্ত হয়ে, ভ্রূকুটি করে আর তীব্রস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠে এণাক্ষী।—ওসব করলে তুমি একটা মহাপুরুষ হয়ে যাবে না। আমার একটুও ভাল লাগে না।

—কি ভাল লাগে না ?

—লেখা-পড়া, বিদ্যে-টিদ্যে।

—বিদ্বান হবার জন্য নয় এটা, কাজের ফাঁকের সময়টাকে একটু শান্তি দিয়ে…

—শান্তি ?

—হ্যাঁ।

এণাক্ষীর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়—কিন্তু শেক্সপীয়র কি তোমার এখন এতই দরকার হয়ে পড়লো যে, আমার সঙ্গে একবার হাজারিবাগ যাওয়াও তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না ? না হয় একমাস পরেই…।

জয়দেব—মহাশয়জীকে কথা দিয়ে ফেলেছি ; এখন আবার অন্য রকমের কথা বলা ভাল দেখায় না।

এণাক্ষী—একটা মাস ওখানেই গিয়ে থাকবে বলে ব্যবস্থা করনি তো ?

জয়দেব—তুমি ঠিকই ধরেছ এণা। মহাশয়জীর ইচ্ছে, আমারও ইচ্ছে, একটা মাস ওখানেই গিয়ে থাকি।

এণাক্ষী—তা হলে তো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছ দেখছি।

জয়দেব আশ্চর্য হয়—আমার এই সখটা কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না ?

এণাক্ষী—সখটাকে বুঝতেই পারছি না ; পছন্দ কি করে করবো বল ?

জয়দেব—সখ বলতে এইটুকু সখ যে, অনেকদিন পরে একটা পুরনো সখ মেটাবার সুযোগ পাব। পড়াশুনা করতে পারি নি, এই দুঃখটা আজও আমি ভুলতে পারি নি।

এণাক্ষীর চোখের বিষণ্ণ ভাবটা হঠাৎ সরে যায় ; হেসে ফেলে এণাক্ষী ; সে হাসি এক সমব্যাথিনীর অনুভবের হাসি।—বেশ, এরকম একটা ছেলেমানুষী কাণ্ড করে যদি শান্তি পাও, আমি আপত্তি করবো কেন ? আপত্তি করবারই বা কি আছে ? একটা ভাল জায়গায় গিয়ে একজন ভাল মানুষের সঙ্গে থেকে ইচ্ছেমত পড়াশুনা করে একটা মাস আনন্দে কাটিয়ে দিও। ভালই হবে

হেসে কথা বলে জয়দেবের জীবনের এই ইচ্ছাটাকে উৎসাহ দিতে পেরেছে এণাক্ষী। সন্ধ্যা হতেই চা নিয়ে জয়দেবের ঘরে ঢুকে জয়দেবের ব্যস্ততা দেখেও খুশি হয়ে হাসতে পারে এণাক্ষী।—এখন তা হলে ওখানেই যাচ্ছ ? জয়দেবকে এই ছোট্ট একটা জিজ্ঞাসার কথা বলতে গিয়েও হাসতে পারে এণাক্ষী।

কিন্তু জয়দেব চলে যাবার পরে বুঝতে পারে এণাক্ষী, এতক্ষণ ধরে কত চেষ্টা করে এরকম একটা মিথ্যা হাসি মুখের উপর জাগিয়ে রাখতে হয়েছে।

কোন ভদ্রলোকের সুন্দরী কুমারী মেয়ে নয়, ষাট বছর বয়সের এক শান্তশিষ্ট বিদ্বান মানুষের কাছে সেক্সপীয়র শুনতে গিয়েছে জয়দেব ; এর মধ্যে

সন্দেহ করবার বা ভয় করবার কিছুই নেই। আর জায়গাটা তো একটা উইলিয়মস্ কটেজ, একটা নিরালা আশ্রমের মত জায়গা; থিয়েটার বাড়ি নয়, সিনেমা ভবনও নয়। হয়তো সেখানে বড় বড় ইউকালিপটাসের ছায়া কাঁপে আর ফুলের লতা দোলে। কিন্তু কারও কাজলবোলানো বড় বড় চোখের পাতা সেখানে কাঁপে না, বড় বড় লতানে বেণীও দোলে না। তবে আর এত জোর করে খুশি হতে আর চেষ্টা করে হাসতে হয় কেন?

যেন নিজের চিন্তার কাণ্ডটাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে লজ্জা পায় এণাক্ষী। জয়দেবকে ভালবেসে শান্তি পেয়েছে, আর একটা নতুন অহংকারের আনন্দও পেয়েছে যে তার মনের চিন্তাটা এত ছোট হয়ে যেতে চায় কেন। এণাক্ষীর মনটা যে মিথ্যে একটা ভাবনা ভেবে নিজের কাছে নিজেকেই ছোট করে দিচ্ছে। উইলিয়মস্ কটেজ যেন এর বাড়িটার সতীন, এরকম একটা অদ্ভুত হিংসুটে ধারণা যে মাথা খারাপেরই লক্ষণ। ছি, এণাক্ষীর মনের লজ্জাটাও এইবার হেসে ফেলে।

কিন্তু রাত্রিটা যখন নিঝুম হয়ে যায়, আর নিঝুম ঘুমের স্বপ্নটা যখন হঠাৎ ভেঙ্গে যায়, তখন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝতে পারে, বিচিত্র একটা অস্বস্তি যেন এতক্ষণ ধরে এণাক্ষীর এই ঘুমন্ত শরীরটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল। নিশ্বাসের বাতাসও হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠে কাঁপতে থাকে। বিছানা থেকে নেমে আলোর সুইচ টিপে দিয়েই দরজার দিকে তাকায়। না, দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ করাই আছে।

কিন্তু আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেও চোখে আর ঘুমের আবেশ আসে না। বিচিত্র অস্বস্তিটা যেন বিচিত্র একটা অনুভবের উত্তাপ, এণাক্ষীর এই সাবধানের শরীরটাকে ঘুমের মধ্যে অসাবধানে পড়ে থাকতে দেখে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে।

আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল এণাক্ষী, সেটা অবশ্য বুঝতে পারে, ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুমটা যখন ভেঙ্গে যায়।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায় এণাক্ষী। বারান্দায় আলো জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু কারও ছায়া ঘুরে বেড়ায় না। কারও পায়ের শব্দও শোনা যায় না।

যেন স্বপ্নে পাওয়া একটা সন্দেহেরই আবেশে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে জয়দেবের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় এণা, ঘরের দরজা বন্ধ।

সত্যিই বন্ধ কি? আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে যায় ভেজানো দরজা; শুনতে পায় এণাক্ষী, কী নিবিড় ঘুমের আবেশে বিভোর হয়ে রয়েছে জয়দেবের সেই

রাতজাগা অভ্যাসের ফল।

দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে এণাক্ষী।

হাজারিবাগে যাবার মাসটা দিনের পর দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু একমাস পরে বাড়িটা একা হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হবে যার, যে মানুষটা একলা পড়ে থাকবে, সেই মানুষটারই মন কত শান্ত আর কত নিশ্চিত। যেন সেই কষ্টটাকে অনায়াসে সহ্য করতে পারা যাবে, এই বিশ্বাসে উদ্বেগহীন হয়ে আছে জয়দেবের মন।

শুধু মন নয়, মানুষটা নিজেও। তা না হলে, এই পর পর সাতটা রাতের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া সন্দেহটা এত ব্যর্থ হবে কেন? একদিনও তো দেখা গেল না, এণাক্ষীর ঘরের দরজার কাছে কোন পিপাসী চোখের আশা এসে কখনও দাঁড়িয়েছে, কিংবা কোন ইচ্ছার পায়ের শব্দ ব্যাকুল হয়ে এণাক্ষীর ঘরের দিকে ছুটে এসেছে। অথচ এণাক্ষীরই ঘুমন্ত বুকের ভিতরে একটা ব্যাকুলতা ছুটোছুটি করে। মিছিমিছি ঘুম থেকে জাগিয়ে আর এদিকে ওদিকে অকারণে ছুটোছুটি করিয়ে এণাক্ষীকে যেন মিথ্যে হয়রান করে দেয় একটা নিঃশ্বাসময় ব্যস্ততা।

কিন্তু ভদ্রলোক বেশ আছেন! জেগে থাকলে যেমন, ঘুমিয়ে থাকলেও তেমন, তার নিঃশ্বাসে কোন অস্বস্তি নেই। এণাক্ষী দেখে আশ্চর্য হয়, কথায় কথায় বেশ গর্বের ভঙ্গীতে এমন কথা মাঝে মাঝে বলেও ফেলে জয়দেব — আমার মত শান্তিতে থাকতে পায় কটা মানুষের জীবন?

এণাক্ষী—এত শান্তির গর্ব কেন?

—আমার ঘরে শান্তি, বাইরেও শান্তি।

—বাইরে আবার কিসের শান্তি?

—উইলিয়মস্ কটেজ। শুধু চুপ করে এক ঘণ্টা সেখানে বসে থাকলেও প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

এণাক্ষী হাসে—ডবল শান্তি নিয়ে তাহলে বেশ ভালই আছ!

জয়দেব—আছি বৈকি?

ডবল শান্তির গর্ব নিয়ে সুখী হয়ে আছে যে মানুষ, তাকে বড় জোর হিংসে করা যায়, কিন্তু তার উপর রাগ করবার কোন মানে হয় না। কিন্তু ভাবতে গিয়ে রাগই হয় এণাক্ষীর। জয়দেবের প্রাণে কোন অভিযোগ নেই; জয়দেবের মনের এই শান্তি যেন ভালবাসার ঘরে চুপ করে বসে থাকা একটা জড়ত্বের

সুখ; এণাক্ষীর ইচ্ছার নিয়মে শান্ত করে রাখা একটা ভালবাসার রাজ্যে একেবারে বাধ্য প্রজাটির মত শান্ত হয়ে আছে জয়দেব। হ্যাঁ, গর্ব করতে পারে জয়দেব, কিন্তু এই শান্তির গর্ব যেন এণাক্ষীর সেই পুরনো গর্বের শান্তিকে মাঝে মাঝে অশান্ত করে দেয়। মানুষটা বড় বেশি শান্ত অহংকারের মানুষ।

রাগ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না এণাক্ষীর, এই রাগটা কত বড় একটা অন্ধতার রাগ।

সন্ধ্যাবেলা রোজই যেমন উইলিয়মস্ কটেজ থেকে ফিরে আসবার পর সব কাজের আগে একবার দেখা করে জয়দেব, আজও তেমনই দেখা করে যায়। নানা গল্প করে হাসে, আর হেসে হেসে গল্প করে। এণাক্ষীও মনে পড়িয়ে দেয়, হাজারিবাগে চলে যাবার দিনটা আর বেশি দূরে নেই, এসে পড়লো বলে। শুনে জয়দেব যেন আরও খুশি হয়ে হাসে—ভালই হবে।

জয়দেবের এই খুশির হাসিকে একটা নির্মম আনন্দের হাসি বলে মনে হয়। আর কোন কথা বলতে চেষ্টা না করে একেবারে নীরব হয়ে যায় এণাক্ষী। জয়দেবও চলে যায়।

জানে এণাক্ষী, এইবার বাইরের ঘরে বসে কিছুক্ষণ হিসেবের খাতা দেখা আর কয়েকটা চিঠি লেখা জয়দেবের অভ্যাস। কিন্তু যে-কথাটা বলবার জন্য ছটফট করছে এণাক্ষীর মন, সে-কথাটা এখনই জয়দেবকে বলে দেওয়া ভাল। এক মাস নয়, অন্ততঃ তিন মাস হাজারিবাগে থাকবে এণাক্ষী।

শুনে যদি আপত্তি করে জয়দেব, তবে অনায়াসে বলে দিতে পারবে এণাক্ষী, আপত্তি করছো কেন? আমি হাজারিবাগে একমাস থাকি বা তিনমাস থাকি, তোমার কাছে তো দুই-ই সমান। যদি একবছর ধরে সেখানে পড়ে থাকি··· কিংবা চিরকালই পড়ে থাকি, তবু তোমার কাছে সবই বোধ হয় সমান কষ্টের ব্যাপার। ছিঃ, মিথ্যে কথা না বলে স্বীকার করলেই তো পার, এটা তোমার কাছে কষ্টই নয়। এই বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেলে তবেই তোমার শান্তি ডবল হবে।

কিন্তু দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয় এণাক্ষী, বাইরের ঘরে নয়, বাইরের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারের উপর চুপ করে বসে আছে জয়দেব। বাইরের অন্ধকারের দিকে অমন অপলক চোখ তুলে কি যে দেখছে জয়দেব, তাও কিছু বোঝা যায় না। দেখে সন্দেহ হয়, যেন একলা পড়ে থাকা জীবনের একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বসে আছে সেই জয়দেব, যে এই কদিন আগে গর্ব করে ডবল শান্তির কথা বলেছিল। এই জয়দেবের প্রাণটা এমনই বধির যে, এণাক্ষীর পায়ের শব্দও শুনতে পেল না। এণাক্ষীর যে ছায়াটা জয়দেবের গায়েরই উপর পড়েছে, সে

ছায়াকেও দেখতে পাচ্ছে না।

এণাক্ষীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে; সেই অন্ধতার রাগটাই যেন লজ্জা পেয়ে কেঁদে ফেলতে গিয়ে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এণাক্ষী ডাকে—শুনছো?

চমকে ওঠে জয়দেব—কে?

এণাক্ষী হাসে—আমার ডাক শুনে চমকে উঠতে হয়? আবার বুঝতে না পেরে 'কে' বলে আশ্চর্য হতে হয়। বাঃ।

জয়দেব হাসে—কি করে বুঝবো, তুমি এখন এখানে এসে এভাবে দাঁড়িয়ে আছ? কখনো তো···।

এণাক্ষী—এখন হিসেব-টিসেবের কাজ না করে যদি এখানে এসেই বসলে, তবে আমাকে একবার ডাকলে কি দোষ হতো? ওরকম করে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকবার অভ্যেস আমারও আছে।

জয়দেবের চেয়ারের কাছে আর একটা চেয়ার। সেই চেয়ারের উপর বসে এণাক্ষীও বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বারান্দার আলো জ্বলে। এই পৃথিবীর আলো-জ্বালা একটি উজ্জ্বল নিভৃতের মধ্যে কাছাকাছি বসে আছে জয়দেব আর এণাক্ষী, স্বামী আর স্ত্রী; কিন্তু দু'জনে নীরব হয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের অন্ধকারের দিকে। এত কাছাকাছি দুটি ভালবাসার মন, কিন্তু মাঝখানে যেন একটা নিরেট নিষেধের প্রাচীর, যেন কারও গায়ের বাতাস কারও গায়ে না লাগতে পারে।

কিন্তু আর এভাবে বসে থাকা যে এণাক্ষীর এই মূর্তিটারই অপমান। এবাড়িতে এসে কোনদিন এমন করে সাজে নি এণাক্ষী, এমন করে সাজবার ইচ্ছেও হয় নি, আর শরীরের বিদ্রোহটা এরকম সাজ মেনে নিতেও পারে নি। কিন্তু এই জয়দেবের চোখে এণাক্ষীর এই সাজ্জত মূর্তির কোন রঙের ছায়া পড়েছে বলে মনে হয় না। তা না হলে এতক্ষণের মধ্যে একবারও কি জয়দেবের চোখে কোনও রঙীন বিস্ময় হেসে উঠতো না?

এমন সাজ যে এণাক্ষীর নিজের কল্পনার বাইরে ছিল; কোনদিন মনে হয় নি যে, নিজেকে এভাবে সাজাবার জীবন কোনদিন আবার দেখা দেবে? এই হাত দিয়ে নিজেকে এমন ক'রে আর সাজাতে পারা যাবে, তাও এণাক্ষীর পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু আজ সে অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে। এই শরীরটা যেন অন্য এক নারীর শরীর, তাকে সাজাবার ভার পড়েছিল এণাক্ষীর উপর; তাই ওরকম একটা বাতাসী বেনারসী দিয়ে আর অতবড় একটা কোয়ার গলার-ব্লাউজ দিয়ে সে নারীকে সাজানো হয়েছে।

কিন্তু না!, আর বেশিক্ষণ বসে থাকার কোন মানে হয় না। জয়দেবের দুই চোখ অদ্ভুত এক অন্ধতার শান্তির মধ্যে ডুবে আছে। এণাক্ষীর এই ফুল্ল রঙীনতার সাজ জয়দেবের চোখেই পড়ছে না। চলে যায় এণাক্ষী।

আর বুঝতে অসুবিধেও নেই এণাক্ষীর, জয়দেবের এই শান্তিটা জয়দেবের জীবনের একটা প্রচণ্ড অহংকার। মানুষটাকে এতদিন চিনতে ভুল করেছে এণাক্ষী, কারণ চিনতেই দেয় নি জয়দেব।

ভুল, এণাক্ষীর বিশ্বাসের গর্বটা কি ভয়ানক ভুল বুঝেছে! এণাক্ষীর ইচ্ছার নিয়মে শান্ত করা কোন ভালবাসার জগতে নয়, ওর নিজেরই অহংকারের গৌরবে গড়া একটা জগতে বাস করে জয়দেব। শুধু নিশি রায়ের মেয়ের জীবনটার উপকার করবার জন্য ভাল মানুষটির মত হেসে হেসে এণাক্ষীর সর্ত-করা ভালবাসার জগতে সে দেখা দেয়।

না, মোটেই ডবল শান্তির মানুষ নয়। এই বাড়িটা ওর অশান্তি; উইলিয়মস্ কটেজটাই ওর শান্তি। নিশি রায়ের মেয়ের মিথ্যে অহংকারটা যেন দুঃখিত না হয়, শুধু এই ভেবে, শুধু করুণা করে, ডবল শান্তির কথা বলে।

কিন্তু কেন? কি ভুল করেছে এণাক্ষীর ভালবাসার জীবন, যার জন্য ভাবনাগুলি এণাক্ষীর অথয়া শরীরটাকেও জড়িয়ে ধরে মাঝে মাঝে এত ভীরু হয়ে যায়? এখনও হাজারিবাগে চলে যায় নি এণাক্ষী, তবু এত ফাঁকা লাগে কেন? কোথায় যে ফাঁকিটা লুকিয়ে আছে, ভগবান জানেন।

আর তো মাত্র একটা দিন বাকি। আজ রাতটা ফুরিয়ে গেলেই আর এই বাড়ির এই ফাঁকা-ফাঁকা অদ্ভুত প্রহেলিকার গ্রাস থেকে ছাড়া পেয়ে অনেক দূরে চলে যাবার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

রাতটাই বা ফুরোবে কখন? কত রাত হলো, তাও যে বোঝা যায় না।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে আর জানালাটা খুলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছে এণাক্ষী। আকাশের তারা আর বাগানের জোনাকীর দিকে তাকিয়ে যেন রাতটাকেই চিনতে চেষ্টা করে এণাক্ষী। এ কেমন রাত? এত নীরব হয়ে গিয়েছে রাতটা, তবু এ রাতের বুকে বাতাস এত ফুরফুর করে কেমন ক'রে? আর এণাক্ষীর চোখে-মুখে এটাই বা কি-ধরনের বিদ্রোহের আকুলতা? গায়ের শাড়ীটা এত শিথিল, ভাঙ্গা খোঁপাটা এত এলোমেলো। দুরন্ত নিঃশ্বাস উথলে উঠে ব্লাউজটাকে ছিঁড়েই দিয়েছে বলে মনে হয়। নির্জলা উপোসের একটা মিথ্যে গর্বকে চরম শাস্তি দিয়ে মিথ্যে করে দেবার জন্য এণাক্ষীর ঠোঁট দুটো যেন একটা প্রতিজ্ঞার জ্বালায় লালচে হয়ে

কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু ছিঃ, সাবধান, একি কাণ্ড করছে সে? বুকের ভেতরে যেন একটা বিভীষিকার শব্দ গুমরে ওঠে। এ যে অপয়া শরীরের ছোঁয়া দিয়ে মানুষকে হত্যা করবার প্রতিজ্ঞা! আর মানুষটা যে তারই ভালবাসার মানুষ।

এণাক্ষীর ইচ্ছার প্রাণটা যেন হঠাৎ আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে মেজের উপ লুটিয়ে বসে পড়ে। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে এণাক্ষী; ইচ্ছাটা যে একটা সর্বনেশে পাগলামি। বুকটা যে ভয় পেয়ে থরথর করে উঠেছে।

কিন্তু এই ভয়টাও যে এণাক্ষীর ভা সার জীবনের সবচেয়ে বড় ফাঁ ভালবাসার ঘরটাও তাই ফাঁকা-ফাঁকা। সেই ভয়কে ভয় বলে মেনে নিতে, সেই নিয়মটাকে সহ্য করতে যে আর একটুও ইচ্ছে করে না। এভাবে থাকাই যায় না। এ ভালবাসা যে ভালবাসাই নয়। এ বিয়ে যে বিয়েই

কুসংস্কারটা যেন এখনও নিষ্ঠুর কৌতুকের সুরে এণাক্ষীর কানের বিড় বিড় করে; আবার কি বিধবা হতে চাও? দূর দূর! এক বিশ্রী মূর্খ বিশ্বাসের আবর্জনা। যেন ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এণাক্ষীর চোখের চাহনি কঠোর করে আর ঠোটের উপর শক্ত করে দাঁত চেপে ধরে এ কুসংস্কারের কৌতুকটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চায় এণাক্ষী।

কিন্তু সেই পুরনো গর্বটাও যে ফিসফিস করে, নিশি রায়ের মেয়ের শরীরে এত যত্ন করে ধরে রাখা সেই শুচিতা কি আজ···।

গর্ব না ছাই! এটাই তো একটা অভিশাপ, যে জন্যে স্বামীর কাছে স্ত্রী হতে পারে নি এণাক্ষী। সিঁথিতে এত সিঁদুর দিয়েও সধবা হতে পারে নি। এমনই ভুল যে, শরীর কাঁদানো একটা শাস্তিকেই গর্ব বলে মনে করেছিল তি বছর বয়সের একটা মিথ্যে সাহসের প্রাণ

কিন্তু কি-ভয়ানক শান্ত রক্তের মানুষ ঐ ভদ্রলোক, যিনি এখন সত্যিই থিয়েটারের স্বামীর মত সব ভুলে গিয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে ওঘরের ভিতরে এক শূন্য বিছানার উপর ঘুমিয়ে পড়ে আছেন। দেখতে তো খুবই শক্ত এবং পুরুষের শরীর, কিন্তু সত্যিই সে শরীরে সাহস বলে কোন সত্য আছে কি সন্দেহ। থাকলে এণাক্ষীর এই ঘরের বন্ধ দরজার কপাট ভেঙ্গে ফেলে নি কেন দরজা খোলা পেয়েও কোন রাতে ঘরের ভিতরে ঢুকে এণাক্ষীর প্রতিজ্ঞা গর্বটাকে জোর করে ছিন্নভিন্ন করে দেয় নি কেন?

কে জানে, কোন্ শাস্তি আর কোন্ গর্বের স্বাদ পেয়ে এণাক্ষীর তে ধরবার ইচ্ছাটাকেও এত সহজে বুকের ভেতর থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরে